স্মৃতি-মন্থন

সুধাংশু অধিকারী

॥ পরিবেশক ॥

হুগলী জেলা পরিষদ

চুঁচুড়া ❋ হুগলী

প্রকাশক :

পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়
১৫, রাজা রামমোহন রায় সরণী
শ্রীরামপুর, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ--মার্চ, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ; চিত্র মুদ্রণ :

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস
৬ এ, সুরেন ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা

পরিবেশক :

হুগলী জিলা পরিষদ
চুঁচুড়া, হুগলী

মুদ্রণ :

তপনকুমার বসু
হুগলী জিলা পরিষদ প্রেস, চুঁচুড়া

কৈফিয়ৎ

স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া ঘটনাবলীকে উদ্ধারের চেষ্টায় বসে' আজ ভাবি—কেন এই প্রয়াস! কোনদিন স্বপ্নে-ও ভাবিনি যে, আমাদের কাজের আবার একটা ইতিহাস রচিত হবে। পরাধীনতার নির্মম বেদনা শৈশবেই অন্তরে অনুভব করেছিলাম। এবং এই জাতীয় গ্লানি মোচন করবার জন্য জীবন পণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। স্বাধীন ভারতের সৌধ-ভিত্তির প্রস্তর-তলায় লোক-লোচনের অন্তরালে আমাদের দেহাস্থি, আমাদের ক্রিয়া-কলাপ চিরকাল নিহিত থাকবে—এ কথাই ত' আবাল্য মনে করে এসেছি।

কিন্তু, দিন বদলায়। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বহুমুখী কর্মধারা ও ঘটনাবলীর সামগ্রিক ফল-স্বরূপ ভারতের এই স্বাধীনতা-প্রাপ্তি। আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা এই বিভিন্ন ধারার ইতিহাস জানতে চাইবেন, ইহা স্বাভাবিক। এরই একটি ধারার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের যে ক্ষীণ সূত্র একসময় গ্রথিত ছিল, তা জানাবার জন্য বহুদিন এবং বহুদিক থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও, স্মৃতির আবরণ উন্মোচন করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে কিছু অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের আগ্রহাতিশয্যে এই লৌহ যবনিকার একপ্রান্ত সরিয়ে ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। চোখে যা' পড়লো, তাতে আমার মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল। ইতিহাস লেখার অভিপ্রায় ছেড়ে দিয়ে আমার অন্তরের আনন্দকে রূপ দেবার চেষ্টা করলাম। সফল হয়েছি বলে মনে করি না।

ইতিহাস আমি লিখিনি। তবে কেউ যদি এই লেখার ভিতর ইতিহাসের মাল মশলার সন্ধান পান, তিনি তা' স্বচ্ছন্দে আহরণ করতে পারেন। ইতি—

সুধাংশু অধিকারী

প্রাক্ কথন

লেখক কমরেড সুধাংশু অধিকারী একজন প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে দীর্ঘ ১০/১২ বছর, তাঁর অন্তরীণ অবস্থায় বা কারান্তরালে অতিবাহিত হয়েছে। বিশের দশকের এই সময়ে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলগুলিকে নানাভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদেব দিকে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। এই সময়েই অন্তরীন অবস্থায় তাঁর মার্ক্সীয় সাহিত্য পড়বার সুযোগ হয়, ১৯২৯-৩০ সালেই তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্তির চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় বোম্বাই কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শেও তিনি আসেন। ১৯৩১ সালে কারারুদ্ধ হয়ে তিনি রাজবন্দী হিসাবে বক্সা বন্দী শিবিব ও পবে দেউলি বন্দী শিবিরে প্রেরিত হন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি দেউলি বন্দীশিবিরে বন্দী ছিলেন।

১৯৩৩ সালে আমি প্রেসিডেন্সী জেল থেকে দেউলি বন্দী নিবাসে প্রেরিত হই। শিবিরে তুই নং ক্যাম্পে আমি ছিলাম। কমরেড সুধাংশু অধিকারী তখন এক নম্বর ক্যাম্পে ছিলেন; তখনই প্রথম দেউলি শিবিরে তাঁকে দেখি। বাইরে থেকেই হুগলী ও বর্দ্ধমানের জাতীয় বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হ'য়ে Prole-tarian Revolutionary Par'y of India (I.P.R·P.) গঠন করেছিলেন। এই দলের মধ্যে আমি, পাঁচু ভাদুড়ী, কালীচরণ ঘোষ এই সময়ে রাজবন্দীরূপে দেউলিতে প্রেরিত হই। আমরা বাইরে থাকাকালীন কমবেড হালিমের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ করতাম। এই সময় কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন যাঁরা দেউলী জেলে এলেন তার মধ্যে ছিলেন কমরেড কালী সেন, নীরদ চক্রবর্ত্তী, ভবানী সেন, প্রমথ ভৌমিক ও তাঁদের বহু বিপ্লবী বন্ধু; জাতীয়তাবাদী বহু বিপ্লবী দলের মধ্যে তখন চিন্তার আলোড়ন চলছে—সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের আদর্শের দিকে। মধ্য কলিকাতার প্রয়াত সন্তোষ মিত্রের দল, নদীয়া, কুমিল্লা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রামের বিপ্লবী বন্ধুরা—সকলেই মার্ক্সবাদের চিরায়ত সাহিত্য পাঠ করে বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই অবস্থায় পার্টির নির্দ্দেশে জেলের মধ্যেই কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন গঠিত হল—১৯৩৬ সালে। জেলের মধ্যেই "কমিউনিষ্ট পার্টি" গড়ার

প্রবণতার ফলে জেল কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন গড়ার পথে যে বাধা ছিল তা' এইভাবে অপসারিত হয়েছিল। দেউলি-হিজলী-বহরমপুর বন্দী শিবির ও আন্দামানে বন্দী যারা কমিউনিষ্ট কনসলিডেশনের সভ্য ছিলেন—'৩৮ সালে মুক্তি পাবার পর তাঁদের ৮০/৯০ ভাগই কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন ক'রে—একটি সুসংহত ব্যাপক রাজ্যব্যাপী কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনে সাহায্য করেন।

১৯৩৩-৩৪ সালের পর বস্তুতঃ ঐতিহাসিক কারণেই তিরিশ দশকের কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপর্যায়ের পটভূমিকায় জাতীয় মুক্তি আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ শক্তি সমাজতন্ত্রের পথে আকৃষ্ট হয়। জেলের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী বিপ্লববাদের পথ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোন সুষ্ঠু পথের সন্ধান দিতে না পারার ফলে রাজবন্দীদের এক ব্যাপক অংশ সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। জেলের মধ্যে এই আলোড়নকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে কম্ সুধাংশু অধিকারীর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জেলের মধ্যে জানলাম কম্ সুধাংশু অধিকারীর কাছে আছে—'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'—বুখারিনের 'Historical Materialism'-ল্যাপিডাসের 'মার্ক্সীয় অর্থ-নীতি'—লেডলারের-'History of socialist thought' প্রভৃতি বই। দেউলী জেলের মধ্যে কমিউনিষ্ট অনুরাগীরা এই সব বই পড়ে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং আমরাও এইসব পড়ে আমাদের কমিউনিষ্ট চিন্তাকে পরিশীলিত ক'রে নিয়েছিলাম।

বাংলাদেশে জেলের বাইরে কমিউনিষ্ট পার্টি গডার গোড়ার ইতিহাস যেমন পরবর্তীকালের পার্টি গড়ার ইতিহাসে এক অবদান রেখে গেছে—তেমনি জেলের মধ্যেও কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন গড়ার ইতিহাস বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনে ও রাজ্য-ব্যাপী বিস্তারে এক অবদান রেখে গেছে। কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন নানা সংঘাত ও মতবিরোধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। বাইরে পার্টি গডার কাজের প্রারম্ভিক বাধাগুলি যেমন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল—দেউলি জেলের মধ্যেও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। দেউলি জেলের মধ্যে এই কমিউনিষ্ট কনসলিডেশন গঠনের ইতিহাস জানে এমন মানুষ ৪/৫ জন ছাড়া আজ আর বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই।

দেউলী বন্দী নিবাসে কমিউনিষ্ট কনসোলিডেশন গড়ার সময় আমি দেউলীতে ছিলাম। কম্ সুধাংশু অধিকারীও ছিলেন—কম্ ধরণী গোস্বামীও ছিলেন। কম্ সুধাংশু অধিকারীর নিজ হাতে লেখা জেলের মধ্যে এই ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের কথা ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু বন্ধুরা নিশ্চয়ই আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করবেন।

সুধাংশুবাবু তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণা এই লেখনটার মধ্যে করেছেন—বিশেষ করে ১৯৩০-৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন—যা থেকে এই সময়ের কিছু অপ্রকাশিত রাজনৈতিক জগতের ইতিহাস জানা সম্ভব হবে। ইতিহাসের গবেষণাকারীরা নিশ্চয়ই এতে উপকৃত হবেন।

সুধাংশুবাবু সুসাহিত্যিক ও সুলেখক। সোভিয়েট লেখক এস মারশাকের লিখিত "বারো মাস" (Twelve Months) নামক পুস্তকটি কিশোর সাহিত্যে এক অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি তাঁর সুন্দর মনোজ্ঞ বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে এর অনুপম বিষয়বস্তুটি বাংলা ভাষাভাষী কিশোরদের সামনে তুলে ধরেছেন। গণশক্তির সাহিত্য সমালোচক এই অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কমরেড সুধাংশু অধিকারী এই লেখনটির মধ্যে অতীতের ঐ সময়ের রাজনীতির বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাঁর জীবনেব ঘটনা সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেছেন। দেউলি বন্দীনিবাসের ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণার মধ্যে তিনি জেলেব মধ্যের এক অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা এর মধ্যে জানবার মাল মশলার সন্ধান পাবেন।

সুধাংশুবাবু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অতীতেব কিছু তথ্য ও ঘটনা আমাদের উপহার দিয়েছেন তাব জন্য সকল ইতিহাস অনুরাগী মানুষই তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে।

সম্পাদক, হুগলী জেলা কমিটি ও
সদস্য পশ্চিমবঙ্গ কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

১৫নং রাজা রামমোহন রায় সরণী,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

স্মৃতি-মন্থন

(প্রথম পর্ব্ব)

বিগত রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা-বহুল দিনগুলির দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন স্বতঃই কিছু কিছু লোকের ছবি মানস-পটে ভেসে উঠে। তাঁদের কেউ ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ, কারো সাথে হয়েছিল দু'দিনের পরিচয়। কেউ ছিলেন একই দুর্গম পথের সহযাত্রী, কেউ বা ছিলেন বিপরীত শিবিরের শরিক। এই বিচিত্র পর্য্যায়ের লোকদের কারো কারো রূপরেখা পরের পৃষ্ঠাগুলিতে আঁকতে চেষ্টা করেছি।

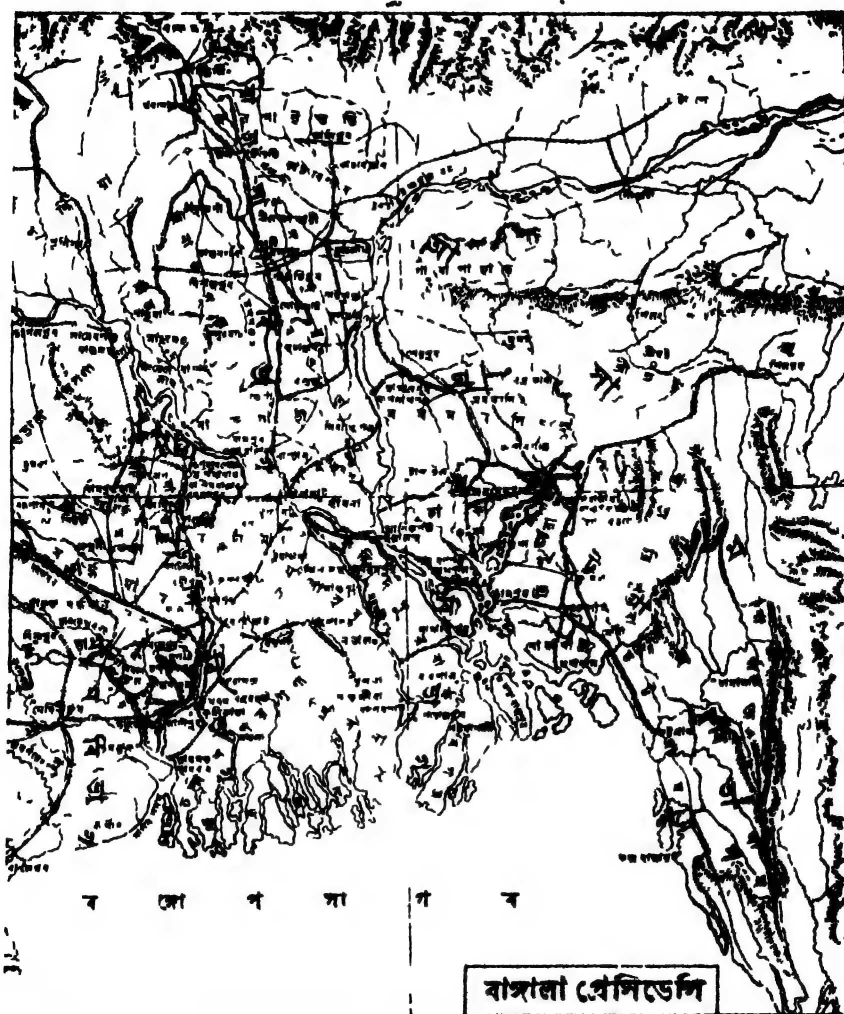
ত্রিবেণী, হুগলী

—সুধাংশু অধিকারী

সূচী-পত্র

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১	সুবশাল	সুবিশাল
১৩	৩০	কাছ	কাছে
১৫	১৫	leaving	living
২৭	৯	উদ্ভুত	উদ্ভূত
২৮	৫	চেতনায়	চেতনা
২৯	২৮	পাচ্ছিনা।	পাচ্ছিনা?
৫১	২৫	তার	তারা
৫২	১৮	বেলায়ত	বেলায় ত'
৬৩	৪	রাস্তার ধারে	রাস্তা ধবে'
৬৫	২১	corp's	corps
৬৭	২	ডকলি	তকলি
৬৯	৯	পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়
৭০	১১	শীত	শীতে
৭১	২৬	শুনলাম।	শুনলাম,
৭৫	৩	বে-আইনী	কায্যতঃ বে-আইনী
৭৫	১২	কোর্ট	ফোর্ট
৭৫	১৮	দেবীকে	দেবী কে
৭৫	২০	জিগেস	জিজ্ঞেস
৭৬	২৩	পেরেছি।	পেরেছি,
৭৭	১	সেখানটায়	যেখানটায়
৭৯	১০	কোমড়	কোমর
৭৯	২১	হয়েও	হয়ে ও
৮০	১	বলে	বললে
৮০	৪	চেহার	চেহারা
৮০	১৬	সুধাংস্তু	সুধাংশু
৮০	১৭	বলালা	বললো
৮০	২৫	যেম	যেন
৮৩	২১	বেড়িয়ে	বেরিয়ে
৮৩	২৭	লাইনটির পূর্বে একটি তারকা চিহ্ন বসবে।	
৯১	১৯	করছেন	করেছেন
৯৪	৭	ন্যাস্ত	ন্যস্ত
১০০	৮	with	under
১০৭	৬	সমান	সম্মান
১১১	১৬	'অমূল্য সেন'-এর পর যোগ হবে 'হরিপদ দে, ভানু বিশ্বাস'	
১৪	১২	পারছি; না	পারছি না;
১২৯	১৩	Mechanestic	Mechanistic
১৩০	২৭	করেছিলাম।	করেছিলাম,
১৩২	৪	অক্ষয়ের	অক্ষরের
১৩৫	২০	ছিলেন।	ছিলেন,
১৪৬	১৫	বেডার	বেড়ার
১৪৭	৫	থমবে	থামবে
১৪৭	৮	মিলিরে	মিলিয়ে
১৪৭	২৭	কাহনা	কাহিনী
১৪৮	২	বললেন,	বললেন।
১৪৯	৩	শিবিবে।	শিবিরে
১৫৪	২০	বাধতো	বাঁধতো
১৫৯	২	অস্তত	অন্ততঃ
১৬০	৯	প্রকার	প্রকার।
১৬৪	৪	বেড়ার-ও পাশে	বেড়ার ও-পাশে
১৭১	—	দেউলি বন্দীনিবাসের ছকে অনবধানতা বশতঃ কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। যথা, ১নং ও ২নং ক্যাম্প থেকে খেলার মাঠে যাবার রাস্তা দেখান হয়নি। কাঁটাতারের বেড়া সবগুলি দেখান হয়নি, ইত্যাদি।	
১৭২	২০	ছায়াছন্ন	ছায়াচ্ছন্ন।
১৭৪	৭	'crastor'-এরপর দাঁড়ি হবে।	
১৮০	১৯	গা	পা
১৮১	১০	সস্থিত	সস্মিত
১৯২	৯	tart	start
১৯৫	২	দাশগুপ্তের	দাশগুপ্তের কাছে
১৯৭	১৯	ধাঁরা	যাঁরা
১৯৮	২০	রেখেছিলেন।	রেখেছিলেন,
২১০	২১	মাক্সের	মার্ক্সের
২১০	২২	কমনকমের	কমনরুমের
২১০	২৫	ছিড়ে	ছিঁড়ে


বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি

ঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী ঃ

পরবর্তী জীবনে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিশু-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। কিশোরগঞ্জ সহরে ছিল আমাদের বাড়ী এবং কিশোরগঞ্জ হাই-স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমরা উভয়েই। স্কুলের নিম্নতম শ্রেণী থেকে শুরু করে স্কুল-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উভয়ে একই সঙ্গে পড়েছি। পরে ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ক্ষীরোদ কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলো; আমি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে জেনারেল লাইনে পড়া শুরু করলাম। সেই থেকে ভিন্ন খাতে আমাদের জীবনের ধারা বয়ে গেছে। তবু, পরবর্তী জীবনেও মাঝে মাঝে তার সংস্পর্শে এসেছি—চিকিৎসা উপলক্ষে বা অন্য ব্যাপারে এবং তখনও পরস্পরের হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করে উভয়েই আনন্দিত হয়েছি।

এখন, যার জন্য ক্ষীরোদের স্মৃতি-চারণা করতে বসেছি, সেই কথাই বলি। এক হিসাবে, ক্ষীরোদকে আমার দীক্ষা-গুরু বলা চলে। ইংরেজী ১৯১৫ সাল, ক্লাস VIII-এ পড়ি। ঐ সময় স্কুলে একদল ছাত্রকে দেখা যেত, যারা সাধারণ গড্ডালিকা-প্রবাহের চেয়ে একটু অন্য ধরণের। তাদের বিলাসিতা বর্জ্জিত পোষাক আসাক, ধীর, স্থির চাল-চলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। 'ব্রহ্মচারীর দল' বলে ওরা আখ্যাত হতো। প্রথমে হয়ত ঠাট্টা করেই অন্য ছাত্রেরা তাদের 'ব্রহ্মচারী' বলতো; পরে সাধারণ ভাবেই ওদের বুঝাতে 'ব্রহ্মচারীর দল' নামটা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ের একটা ঘটনা। উপরের ক্লাসে একটি ছাত্র ছিল—ষণ্ডা, গুণ্ডা, মস্তানমার্কা। যখন খুসী, যাকে তাকে যা' তা' বলতো, কেউ প্রতিবাদ করতে বা ঘাঁটাতে সাহস পেতো না। একদিন বোধহয়, সে 'ব্রহ্মচারীর দলের' কুৎসা কীর্ত্তন করতে গিয়ে একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

টিফিন পিরিয়ড। উমেশ রায় বলে 'ব্রহ্মচারী দলে'র একটি ছাত্র তার এক সহপাঠীর কাছে এসে বললো—'তোর পায়ের জুতো-জোড়া একবার ছেড়ে দে'ত, আমি একটু পরবো।' সে ছেলেটি তা অবাক। উমেশ ত' বরাবর খালি পায়েই চলে, তার আবার হঠাৎ আজ জুতো পরার সখ হলো কেন? যাই হোক, কোন কথা না বলে সে জুতো জোড়া পা থেকে খুলে দিল। উমেশ নিজের পায়ে জুতো পরে' বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ ছেলেদের প্রচণ্ড হৈ চৈ রবে স্কুল-কম্পাউণ্ড মুখরিত হয়ে উঠলো। উমেশ রায় সেই মস্তান ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে দমাদম জুতো পেটা করেছে। লোহার নাল লাগানো জুতোর ঘা' খেয়ে শ্রীমানের কপালে মাথায় বেশ কয়েক জায়গা কেটে গিয়েছে। কয়দিন ধরে ইস্কুলে সে কী উত্তেজনা! উমেশ রায় গুণ্ডা ছেলেটাকে জুতো পেটা করেছে!

সেই থেকে 'ব্রহ্মচারী দলে'র প্রতিপত্তি ইস্কুলে দারুণ বেড়ে গেল।

একদিন টিফিন পিরিয়ডে আমি ক্ষীরোদকে ঠাট্টা করে বললাম "কিহে, তুমিও কি ব্রহ্মচারী দলের লোক নাকি?"

ক্ষীরোদ অবস্থাপন্ন এবং আধুনিক ভাবাপন্ন পরিবারের ছেলে। তার খালি পায়ে স্কুলে আসা, ছোট করে ছাঁটা চুল এবং রাশভারি চালচলন দেখে আমি ঐ প্রশ্ন করেছিলাম। এই পরিবর্তনটা তার সম্প্রতি হয়েছিল, আগে ছিল না। আমার প্রশ্ন শুনে সে কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। শেষ ঘন্টায় আমার কাছে এসে বললো—'আজ ছুটির পর তোমার কাছে যাবো, বাড়ী থেকো।'

যথাসময়ে ক্ষীরোদ আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। শহরের উপকণ্ঠে মাঠের ধারে একটা শানবাঁধানো পুকুর ছিল। উভয়ে সেখানে বসলাম। ক্ষীরোদ শুরু করলো—"তুমি ইস্কুলে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি 'ব্রহ্মচারী দলে'র লোক কিনা। তখন, অন্য লোকের সামনে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন তোমায় বলছি—হ্যাঁ, আমি 'ব্রহ্মচারী দলে'র-ই একজন, কিন্তু এই 'ব্রহ্মচারীর দলটা' কী, তা' জান?"

তারপর সে ধীরে ধীরে ভারতের পরাধীনতার কথা, আমাদের অতীত গৌরব এবং সেই হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য স্বাধীনতা অর্জনের অপরিহার্য্যতার কথা—ইত্যাদি অনেক কথা বলে গেল। আরো বললো, 'এই স্বাধীনতা কখনো ইংরেজদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে মিলবে না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চাই সশস্ত্র বিপ্লব। এই সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে ব্রতী হয়েই আজ 'অনুশীলন সমিতি' সমস্ত দেশ জুড়ে তার সংগঠন বিস্তৃত করছে। আমি এই 'অনুশীলন সমিতি'র সভ্য।

'ব্রহ্মচারীর দলে'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে বললো—'কোন কিছুরই ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, তবে সে টিকতে পারে না। আমরা যে-দলের লোক, সেই দলের প্রত্যেকেই যদি নিজেদের চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ় না করি, তবে ইংরেজের অকথ্য অত্যাচারের মুখে টিকে থাকতে পারবো না। ব্রহ্মচর্য্য-পালন-ই এই আত্ম-সংগঠনের প্রথম সোপান। আমরা তাই, এখন থেকেই নিজেদের তৈরী করে নিচ্ছি—ভবিষ্যতের ঝড়ঝঞ্ঝা কিছুতেই যাতে আমাদের বিচলিত করতে না পারে, তারজন্য। এইসব বিপদ আপদ জেনে, এমন কি,

জীবন বিসর্জনের-ও ঝুঁকি পর্য্যন্ত নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে ইচ্ছুক আছ কি'?

দারুণ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির সামনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সুমিষ্ট পানীয় ধরে' কেউ যদি বলে, 'তুমি এটা পান করতে চাও কি?' তবে তার যা' মনোভাব হয়, আমার অবস্থা-ও তখন ঠিক তার অনুরূপ।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এই পৃথিবীর আলো দেখেছি। বাংলার আকাশ বাতাস যখন 'স্বদেশী'র উন্মাদনায়, বিপ্লবের বারুদের গন্ধে ভরপুর, সেই সময়ে কেটেছে আমার শৈশব ও বাল্য। যখন খুব ছোট, বোধহয় পাঠশালায় পড়ি, তখন গ্রামের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছি—

'বুক বেধে সকলে, জয় মা মা বলে, দাঁড়া দেখি ভারত-সন্তান,
দেখুক আঁখি মেলে, ফিরিঙ্গি সকলে; বাঙালী দিতে জানে প্রাণ।'

কোন্ গ্রাম্য কবির লেখা জানিনা, তবে এই জাতীয় স্বদেশী গানে গ্রামবাংলার আকাশ তখন মুখরিত হতো।

শ্যামা পূজা। দিন পাড়ার ছেলেরা মিলে খেলার কালী পূজার অনুষ্ঠান করতাম। তাতে একটা কিম্ভূতাকার মূর্ত্তি তৈরী করে কালীর সামনে রাখা হতো। প্রচণ্ড উল্লাসের সঙ্গে তার শিরশ্ছেদ করে ফিরিঙ্গি বলির উৎসব করা হতো। ৩০শে আশ্বিন 'রাখী-বন্ধন' অনুষ্ঠান পালন করা হতো কত উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে, রবীন্দ্র-নাথের বিখ্যাত গানটি গেয়ে গেয়ে। বাড়ীতে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর ছবির দিকে যখন দৃষ্টিপাত করেছি, প্রাণে কী এক শিহরণ অনুভব করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের হাতে ইংরেজদের নাস্তানাবুদ হওয়ার খবর, রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের অসীম বীরত্বের কাহিনী—এসব মনে এক দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি করতো।

মনে পড়ে, কোথা থেকে এক গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী আসতেন আমার মামার বাড়ীতে। সেখানে অন্দর-মহলের আঙ্গিনায় ঐ সন্ন্যাসী ও আমার এক মেশোমশায় (দেবেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য) কুস্তি, লাঠি, ছোরা খেলতেন। সন্ন্যাসী কিছু দিন থেকে আবার কোথায় চলে যেতেন। এসবই অজ্ঞাতে মনের উপর এক রহস্যের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিল সেই শৈশব কালেই।

ঐ সময়ে একবার বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও সুবোধ মল্লিক এসেছিলেন কিশোরগঞ্জ শহরে। আমাদের 'শোলাকিয়া'—পাড়ার আইনজীবি লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিল। যেসব কিশোরী মালা, চন্দন, ধূপ দীপ দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেছিল, আমার দিদি ছিল তাদের অন্যতমা। দিদির আঁচল ধরে আমিও গিয়ে একেবারে তাঁদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিছুই বুঝি না, কিছুই জানিনা কি-বার্ত্তা নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আগমন যে এক মঙ্গলময়

ভবিষ্যতের আলোক-সংকেত, তা যেন ঐ শিশু মনের অন্তঃস্থলেই অনুভব করেছিলাম।

কিছু বড হ'য়ে ইস্কুলে যখন নীচের ক্লাসে পড়ি, তখন বিপ্লবী দলের প্রকাশিত বে-আইনী 'স্বাধীন-ভারত' নামক ইস্তাহার শহরের বিভিন্ন স্থানে মারা হয়েছে দেখেছি। আর তাই নিয়ে সাধারণের ভিতর কী চাঞ্চল্য! মনে মনে অনুভব করতাম, বোমা-পিস্তল-ধারী গুপ্ত বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব তা'হলে আজ আর নাগালের বাইরে নেই, আমাদের এই ছোট্ট শহরেও তার বিস্তৃতি ঘটেছে। আর কী আকুল আকাঙ্ক্ষা মনে জাগতো—কী করে এদের সন্ধান পাই, এদের সঙ্গে নিজেকেও মিলিয়ে দিয়ে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে জীবনকে ধন্য করি।

অনুশীলন সমিতিতে ঢুকলাম। বয়স তখন বছর চৌদ্দ। শুরু হলো অতি গোপনে আত্ম-প্রস্তুতির পর্ব্ব। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠা, ব্যায়াম, ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, গীতাপাঠ। এসবই চলতো বাড়ীর অভিভাবকের আগোচরে। কারণ, অভিভাবকেরা এসব পছন্দ করতেন না, পুলিশি ঝামেলার ভয়ে। ব্যায়াম করা, গীতাপাঠ এমন কি, ভাল বই পড়া পর্য্যন্ত তখন পুলিশের নজরে অপরাধমূলক কাজ ছিল। আমার দাদা সে সময়ে পাব্লিক লাইব্রেরী থেকে র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের (পরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) লেখা "Aawkening of India" নামক একখানা বই পড়ার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক সতর্কীকৃত হয়েছিলেন।

বাড়ীর লোকেরা যখন ঘুম থেকে উঠতো, তারা দেখতো, আমরা সুবোধ বালকের মত নিজ নিজ পাঠে মন দিয়েছি।

তিনজনকে নিয়ে আমাদের এক একটি 'গ্রুপ' বা 'ব্যাচ' গঠিত হতো। এক 'ব্যাচে'র এই তিনজন একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ, স্নান ইত্যাদি করতো। বিকালেও যাতে তারা যথাসম্ভব একই সঙ্গে খেলাধূলা ইত্যাদি নিয়ে কাটাতে পারে, তার নির্দেশ দেওয়া ছিল। এইভাবে একই ব্যাচের ছেলেরা পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেত। এইরূপ অনেকগুলি 'ব্যাচে' সমিতির নবাগত সদস্যেরা বিভক্ত ছিল। গুপ্তদল, তাই এক ব্যাচের ছেলেরা, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অন্য ব্যাচের ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেত না। 'ব্যাচের' লোক মাঝে মাঝে বদলও হতো। আমি যে 'ব্যাচে' ছিলাম, ক্ষীরোদ ছিল তার 'লীডার'! আরেকটি ছেলে ছিল, যতদূর মনে হচ্ছে, ফণী। ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, উকীল গিরীশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে। অত্যন্ত ধনবান বলে, তিনি মহারাজ গিরীশ নামে পরিচিত ছিলেন। ফণী অবশ্য স্কুলের গণ্ডী পেরোবার আগেই দল ছেড়ে দিয়েছিল।

প্রথম প্রথম, ক্ষীরোদই আমাকে ভোর রাত্রে জাগিয়ে দিত। সে ই আমাকে ব্যায়াম করা শিখিয়েছিল। আজন্ম রুগ্ন আমি মাস খানেকের ভিতরই এই ব্যায়াম

এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের অদ্ভুত সু-ফল পেয়েছিলাম। আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পরে আমরা ঠিক করলাম, ফণী প্রথমে উঠে, আমার বাসায় এসে আমাকে জাগাবে; পরে দু'জনে গিয়ে ক্ষীরোদকে জাগাবো এবং তারপর তিনজনে মিলে প্রাত্যহিক নির্দ্ধারিত কাজ সম্পন্ন করবো। ক্ষীরোদ তার বাড়ীর বাইরের ঘরে ঘুমাতো। আর কেউ সে ঘরে থাকতো না। ডাকাডাকি করলে বাড়ীর অন্যেরা জানবে, তাই ঠিক হয়েছিল, তার মাথার কাছের জানালা দিয়ে ছোট একটি লাঠি জাতীয় কিছু গলিযে তার মাথায খোঁচা দিতে হবে। সে তখন জেগে উঠে বেরিয়ে আসবে। একদিন নিয়ম-মাফিক জানালা দিয়ে লাঠি গলিয়ে তার মাথায় খোঁচা দেওয়া হলো, আর অমনি "মা গো, বাবা গো, মেরে ফেল্‌লে রে—চোর, চোর" বলে ভীষণ চীৎকার। আমরা ত' ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট, একেবারে নদীব বাঁধান ঘাটে এসে বিশ্রাম আর হাসাহাসি।

পরদিন স্কুলে ক্ষীরোদেব নিকট জানলাম, রাত প্রায় আটটার সময় গ্রামের বাড়ী থেকে তাব এক আত্মীয় এসেছিলেন। রাত্রে তাঁকে ক্ষীরোদের বিছানায় শু'তে দেওয়া হয়েছিল এবং ক্ষীরোদ ভিতর-বাড়ীতে অন্যদের সঙ্গে শুয়েছিল। তখন আর এই পরিবর্ত্তন আমাদের গোচবে আনা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই বিপত্তি যা' ঘটার ঘটে গিয়েছে। তিনজনে মিলে আব একচোট হাসলাম।

মাঝে মাঝে অন্য প্রকার বিপত্তি ঘটারও সম্ভাবনা দেখা দিত। কোন কোন দিন রাত্রি কতটা হয়েছে, আন্দাজ করতে না পেরে ভোর হওয়াব অনেক আগেই আমবা বেরিয়ে পড়তাম। বাত্রে টহলবত পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেত। তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আমাদের বয়সের স্বল্পতা অনুভব করে কিছু না বলে চলে যেত'। একদিন এই প্রকার একজন পুলিশ আমাদের জিজ্ঞাসা করে বসলো, "এই খোকাবাবুবা, এত রাত্রে বাইরে বেরিয়েছ কেন? তোমরা কে?"

ফণী নিজের পরিচয় দিয়ে বাংলা হিন্দি মিশিয়ে হিন্দুস্তানী সিপাইজীকে বোঝাবার চেষ্টা করলো—'ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে নদীতে স্নান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য—আমাদের শাস্ত্রে একথা বলেছে। এই শাস্ত্র বাক্যানুযায়ী আমরা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে নদীতে স্নান করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।"

ফণীর কথা কতটা সিপাইজীর বোধগম্য হলো, জানিনা, তবে গিরীশ মহারাজের পুত্রের বাক্যকে কিছু মর্য্যাদা দিতেই হয়ত, সিপাইজী "ঠিক্‌ ঠিক্‌" বলে একটু হাসিমুখ দেখিয়ে নিজের গন্তব্য পথে রোয়ানা দিল।

আমাদের রোজ-নামচা লিখতে হতো, একটি ছক-কাটা লিপি (form) পূরণ করে'। প্রতি সপ্তাহে ব্যাচ্-লীডার (Batch leader) মারফৎ উর্দ্ধতন নেতার কাছে সেটা জমা দেওয়া হতো। রাত্রে শোবার আগে এই লিপির ঘরগুলি পূরণ করতাম। সেদিন কী কী খারাপ কাজ করা হয়েছে, তার একটা হিসাব আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন ঘরগুলিতে দিতে হতো। যেমন, মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, কয়টা ; কু-চিন্তা উদয় হয়েছে মনে কতবার···ইত্যাদি। নির্দ্দেশ ছিল, প্রতিদিন অল্প অল্প করে এই কু-বৃত্তিগুলিকে কমিয়ে আনতে হবে। এই ছক-কাটা লিপিতে দু'একটা ঘর এমন ছিল যে, আমাদের মত কিশোরদের পক্ষে তা' পূরণ করা সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ঐ ঘরগুলি আমাদের পূরণ করতে হবে না।

ক্ষীরোদের মেজদাদা নীরদ চৌধুরীর (সাহিত্য-জগতে ইনি নীরদ. সি. চৌধুরী নামে খ্যাত) একটা লেখা পড়েছিলাম কোন এক সাময়িক পত্রিকায়। বোধহয় ক্ষীরোদের মৃত্যুর কিছুদিন পর। তা'তে এক স্থানে এই মর্ম্মে লেখা ছিল—(স্মৃতি থেকে ভাবটা লিখছি)—ছোট বেলায় আমার ছোট ভাই আমরা চেয়ে বড় 'স্বদেশী' ছিল। একদিন মা তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক টুকরা কাগজ বের করলেন। ঐ কাগজটায় তাকে লিখতে হবে, রমণীর রূপের মোহ তার কতটা আছে। আমরা ত অবাক। এতটুকু ছেলের আবার রমণীর রূপের মোহ কি ?···ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, আমি উপরে যে ছক-কাটা দিন লিপির কথা বলেছি, ক্ষীরোদের টেবিলের ড্রয়ারে তাই আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলছি, নীরদবাবু যে কোনদিন 'স্বদেশী' ছিলেন, তা আমাদের জানা নেই।

কিন্তু ক্ষীরোদের কাছে আরেকটা যে-জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল, নীরদবাবু তার কোন উল্লেখ করেন নি। সেটার কথা বলছি।

স্কুল-কামাই পারত পক্ষে আমরা কেউ করতাম না। কারণ, স্কুলই ছিল আমাদের প্রধান সংযোগ-স্থল। গোপন খবর আদান প্রদান, পরদিনের বিশেষ কোন কার্য্যক্রম থাকলে তা জানান, ইত্যাদি কাজ স্কুলেই হতো। হঠাৎ ক্ষীরোদ স্কুলে অনুপস্থিত। একদিন নয়, দু'দিন নয়, উপর্য্যুপরি চারদিন। কী হ'লো ? অসুস্থ ? কিন্তু, তার বাড়ী গিয়ে খবর নেওয়া—সে আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাদের পরিবারকে একটু উন্নাসিক রাজভক্ত পরিবার বলেই আমাদের মনে হতো, ক্ষীরোদকে আমরা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মনে করতাম। অবশেষে ক্ষীরোদ স্কুলে এলো। কিন্তু, তার পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলাম, ক্ষীরোদের বাক্সে তার বাড়ীর লোকেরা একতাড়া বে-আইনী 'স্বাধীন-ভারত' ইস্তাহার পেয়েছেন। তারপর যথারীতি তার উপর উৎপীড়ন,

নির্যাতন (বেত-মারা হয়েছিল) চললো, কোথা থেকে এগুলি এলো, কে দিল—এইসব জানবার জন্য। ক্ষীরোদ অবশ্য তার মুখ খোলে নি। ফলে, চারদিন তাকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হ'লো।

ক্ষীরোদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য জানা ছিল বলেই, অতি নিরাপদ স্থান ভেবে তার কাছে এই বিপ্লবী ইস্তাহারের বাণ্ডিল রাখা হয়েছিল—সুযোগ মত নানা স্থানে দেওয়ালে মারা হবে বলে। কিন্তু, পরিবারের লোকের কাছে ক্ষীরোদ ক্রমেই সন্দেহ ভাজন হয়ে উঠছিল। তার জিনিসপত্র মাঝে মাঝে তল্লাসী করা হ'তো। ফলে, একদিন দিনলিপি আবিষ্কার, আরেকদিন 'স্বাধীন ভারত' আবিষ্কার। এ'র জের হিসাবে যে-নির্যাতন এল, তা সে মুখ বুজেই সহ্য করেছিল। তবে, এ নির্য্যাতন পুলিশের হাতে নয়, বাড়ীর লোকের হাতেই। প্রথম দিন সে আমাকে যে-নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনের কথা বলেছিল, আজ তার নিজের উপর দিয়েই সে-পরীক্ষা হয়ে গেল। আর সে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই সে উত্তীর্ণ হ'লো।

আমাকে-ও মাঝে মাঝে ঐ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে। তবে আমার উপর শারীরিক নির্যাতন হয়নি। শুধু বকুনির ঝড়ই বয়ে গিয়েছে। যতই সতর্কতার সঙ্গে এবং গোপনে আমরা আমাদের কাজকর্ম্ম চালাই না কেন, অভিভাবক কোনদিনই কিছু বুঝতে পারবেন না, তা হয় না। মাঝে মাঝে ধরা পড়তেই হয়। আমাদের উপর নির্দ্দেশ ছিল, 'ধরা পড়লে নীরবে অভিভাবকের দেওয়া সব রকমের শাস্তি সহ্য করবে, দলের কোন কথা বলবে না'।

*　　　*　　　*　　　*

কৈশোরের সেই দিনগুলি কী দিনই না গিয়েছে! খ্যাত, অখ্যাত কবিদের নিত্য নতুন স্বদেশ-প্রেরণা-মূলক গান ও কবিতা পড়তাম আর অভূতপূর্ব উত্তেজনায় ও আনন্দে হৃদয়-তন্ত্রী নেচে উঠতো। ঐ গানগুলির ভিতর দু'টিই বিশেষ করে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করতো। দুর্বল স্মৃতিতে আজও ঐ গান দু'টির যে-কয়টি চরণ জাগরূক রয়েছে, তা' নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বলা বাহুল্য, পূর্ব-পরানুক্রমে লাইনগুলি হয়ত, সাজানো হয়নি ; আর কিছু কিছু ভুল থাকাও বিচিত্র নয়। কে যে এদের রচয়িতা, তা'ও আজ ভুলে গেছি। ভাসাভাসা মনে হচ্ছে, বিজয় রত্ন মজুমদার এই গান দু'টির একটির রচয়িতা ছিলেন।

(১)

শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়া চরণে নম্র শির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
শুধু মায়ের চরণে নম্র শির,
জননী মোদের জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী,
ঈপ্সিত বর-অভয়দাত্রী, অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
সূর্য্য-খচিত অতুল আস্য, নিরাশা-ধ্বান্ত বিনাশে হাস্য,
রাতুল চরণ দেব-উপাস্য, সিংহ-পৃষ্ঠে অটল স্থির।
আবাহন মা'র যুদ্ধ ঝননে, তৃপ্তি তপ্ত রক্ত-ক্ষরণে,
পশুবল আর অসুর দলনে, মায়ের খড়্গ ব্যাগ্রাধীর।
মায়ের আরতি অরাতি-নাশন, ওপদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ,
দুখ-নিশি-হরা সোনার বরণ, উষা জাগে শিরে হোমার্চ্চির।
মায়ের করুণা বড় নির্ম্মম, আহুতি-তৃপ্ত হুতাশন-সম
হন্তে নির্ম্মম দহন প্রথম, অন্তে বিশ্বে বিজয়ী বীর।
কর পদাঘাত বিপদ-মাথায়, ভর ধরাতল বিজয়-গাথায়;
হর, হর, হর, বিঘ্ন কোথায়? শমন ভৃত্য জননীর।
করে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি, আশীষে ভরিয়া নিখিল সৃষ্টি,
সার্থক করি মানব-দৃষ্টি, রচি রোমাঞ্চ ধরিত্রীর।

(২)

আয়, আজি আয়, মরিবি কে,
মড়ার মতন না লভি মরণ,
সাধকের মত মরিবি কে?

পিষিতে অস্থি, শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর
থাকিতে তন্ত্র, সাধন-মন্ত্র
প্রেত-ভয়ে ছি, ছি, ডরিবি কে?

অসুর-নিধনে কিসের তরাস?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্?
নাগনি' বিজন, কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মত মরিবি কে?

মথিয়া সিন্ধু উঠিছে তুফান,
ছুটিছে উর্ম্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে-সাগর
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন, জলধি-মগ্ন,
তবু তরী বাহি মরিবি কে?

চরণের তলে দলি রিপুগণ
লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,
তাদেরি অংশে, তাদেরি বংশে
জনম, সে-কথা স্মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণ, ত্রিদিব পুণ্য
আর্য্যের মত মরিবি কে?
মাতি সৌরভে, যশে গৌরবে,
অমর হইয়া মরিবি কে?

চন্দন-মাখা হাতে দেব-বালা
নন্দন-ফুলে গাঁথি জয় মালা
তোদের নিরখি, রয়েছে অপেখি'
সে-বিজয় মালা পরিবি কে?
আয়, আজি আয় মরিবি কে?

একদিন স্কুলে আমাকে জানানো হলো—রাত্রে আখড়া বাজারে যাত্রা গান হবে, সেই গান শুনতে যেন আমি যাই। সেখানে পিছন থেকে একজন এসে আমার কাঁধে হাত দিবে, তখন সে আমাকে যেখানে নিয়ে যায়, যেতে হবে। রাত্রে পড়তে বসে শুধু একই চিন্তা—কতক্ষণে বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়বে। বাবা সবচেয়ে পরে ঘুমাতে যেতেন। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হয়েছে, টের পাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম। পরে আস্তে আস্তে আমার ঘরের (আমি আলাদা ঘরে থাকতাম) দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

নির্দিষ্ট সময়ে একজন এসে গানের আসর থেকে আমাকে নিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই জানিনা। জ্যোৎস্না রাত্রি; একেবারে নির্জন, ঝোপ ঝাড়ে ভরা মাঠ পেরিয়ে সেই নিস্তব্ধ রাতে যাচ্ছি দুজনে—কারো মুখে কথা নেই। আমার কল্পনা-প্রবণ কিশোর মন কত রহস্য-রোমাঞ্চের জাল বুনতে লাগলো। এ কি জীবানন্দ এসে মহেন্দ্রকে নিয়ে যাচ্ছে? না, পদচিহ্ন গ্রামের অন্দরে কোন ভূ-গর্ভস্থ অস্ত্র তৈরীর কারখানায় যাচ্ছি? তাই যদি হয়, তবে এই এক বস্ত্রেই আমি সেখানে থেকে যাবো, আর বাড়ী ফিরবো না।

পথে এক জায়গায় শ্মশান পড়লো। পথ-নির্দেশক জিজ্ঞাসা করলেন—"ভয় করছে?"

হেসে উত্তর দিলাম—'মোটেই নয়।'

বেশ কিছুক্ষণ পর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। একটি প্রায়ান্ধকার ছোট্ট কুঠরী। ভিতরে কয়েকজন বসে আছেন। ক্ষীরোদকে-ও সেখানে উপস্থিত দেখলাম, একজন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ-ই বেশীক্ষণ আলাপ করলেন। পরে জেনেছিলাম, উনি বসন্ত রক্ষিত; কিশোরগঞ্জের অনুশীলন সমিতির তখনকার নেতা। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন জায়গার ফেরারী বিপ্লবী। একজন দেখলাম, একটু আহত। বোধহয়, এখানে কিছু দিন বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য এসেছেন। কী অপূর্ব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সেদিনকার!

ক্ষীরোদ ও আমি অবশ্য রাত পোহাবার আগেই বাড়ী ফিরেছিলাম। এইখানে, যে বাড়ীটায় এসেছিলাম, তার একটু ইতিহাস লিখছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দুই ভাই বাণিজ্য করে প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন। এবং এখানে, কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাইল তিন দূরে, 'বত্রিশ' নামে তাঁদের নিজ গ্রামে প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম নিজেদের বাড়ী তৈরী করেছিলেন। একুশ

রত্ন, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি কত মন্দির, সুবিশাল দীঘি, জলটুঙ্গি প্রভৃতিতে সুশোভিত এই বাড়ীটি 'পরামাণিকের বাড়ী' নামে পরিচিত। মালিকেরা তন্তুবায় শ্রেণীর লোক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (বাংলা ১৩০৪ সন) এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে তাঁদের এই রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, এবং ক্রমে তা' জঙ্গলে আবৃত হ'য়ে বিশাল ধ্বংস-স্তূপের আকার ধারণ করে। কেবলমাত্র পঞ্চ-রত্ন মন্দির, জলটুঙ্গি ও কয়েকটি ছোট কুঠরী কোন প্রকারে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। উত্তর-পুরুষের অবস্থাও ক্রমে দৈন্য-দশা-গ্রস্ত হয়ে উঠে। এদের তদানীন্তন বংশধর রামতনু দাস নামে একটি অল্প বয়স্ক ছেলের গৃহ-শিক্ষকরূপে বসন্ত রক্ষিত এই বাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং বাড়ীটিকে অনুশীলন দলের একটি শক্ত ঘাঁটিরূপে পরিণত করেন। ভগ্নস্তূপের ভিতর দু' একটি কক্ষ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। জঙ্গলে আবৃত এবং মাটিতে অর্দ্ধ-প্রোথিত থাকায় এই কক্ষগুলি গুপ্ত কাজের আদর্শ আস্তানা স্বরূপ ছিল। অনেক ফেরারী বিপ্লবী এখানে প্রায়ই আশ্রয় নিয়েছেন এবং অস্ত্রাদির ভাণ্ডার হিসাবে-ও এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। আমার প্রথম দিনকার সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর আরো কয়েকবার "পরামাণিকের বাড়ীর" আস্তানায় গিয়েছি। বাইরের নেতা যাদের দেখেছি, তাদের নাম আজ আর মনে নেই। অবশ্য, ওঁদের প্রকৃত নাম সে সময় জানবারও উপায় ছিল না। কারণ, সবাই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

আরেক দিনের একটা ঘটনার কথা বলছি। এ'তেও খানিকটা রোমাঞ্চ আছে। সেদিন স্কুলে প্রথম পিরিয়ডেই ক্ষীরোদ আমাকে জানালো যে, টিফিনের সময় আমি যেন বাড়ী যাই। সেখানে আমার সঙ্গে একজন দেখা করবেন।

ইস্কুলের খুব কাছেই আমাদের বাড়ী। ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী চলে গেলাম। আমার ঘরের দরজা খুলে আগন্তুকের অপেক্ষায় বসে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই র্যাপার গায়ে একজন ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। আরে, ইনি যে আমার খুবই পরিচিত লোক! কিন্তু, ইনি যে আমাদের একই গুপ্ত সমিতির লোক, তা' জানতাম না। স্মিত মুখে র্যাপারের তলা থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড পিস্তল বের করলেন। রডা কোম্পানি থেকে চুরি যাওয়া সেই 'মশার' (Mauser) পিস্তলের একটি। সেই সঙ্গে দশ বারটি বুলেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলি সাবধানে রেখে দাও; যদি কেউ কোনদিন এই কথা উচ্চারণ করে তোমার কাছে এসে এটা চায়, তবে তাকে দিয়ে দিও'—এই বলে একটা সংকেত বাক্য (Watch word) জানিয়ে দিলেন। আমার ঘরে আমি একাই থাকি; নিজের আলাদা বাক্স-ও আছে। তাই জিনিসটা রাখতে অসুবিধা হ'লো না, এমন সাংঘাতিক একটা অস্ত্রের সঙ্গে আমি একই ঘরে বাস

করবো এই উপলব্ধিটা নিজের কাছে নিজেকে যেন একটা 'হিরো' বানিয়ে তুললো।

সপ্তাহ খানেক পর সেই সংকেত বাক্য বলে একজন জিনিসটা ফেরৎ নিতে এলেন। তিনি তখন আমাকে ও'টা ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। ও'তে সংলগ্ন একটি কাঠের ঢাকনাকে বন্দুকের বাঁটে রূপান্তরিত করে কীভাবে এই পিস্তলকে রাইফেলের মত ব্যবহার করা যায়, তা' দেখলাম। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি বর্তমানে দেশের বাম রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত। নাম-ধরণী গোস্বামী।

স্কুল জীবনের শেষ দিকে, অর্থাৎ ১৯১৭ সালের শেষ দিক থেকে আমাদের কর্মচাঞ্চল্য একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। বাংলার বিপ্লবী নেতারা অনেকেই তখন কারান্তরালে। 'রেগুলেশন তিন' নামক এক বিশেষ আইনের তাণ্ডব চালিয়ে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী আন্দোলনকে তৎকার মত অনেকটা দমিয়ে দিয়েছে। স্কুল জীবন শেষ করে আমরাও কলেজে পড়তে গেলাম বিভিন্ন স্থানে। পরবর্তীকালে আমার বিপ্লবী জীবনের ফেরারী অবস্থায় অসুস্থ হ'য়ে মাঝে মাঝে ক্ষীরোদের বাসায় গিয়েছি। দরদ দিয়েই সে চিকিৎসা করেছে এবং বাল্যকালের সেই প্রীতি-বন্ধনের কথা স্মরণ করেছে।

ক্ষীরোদের সঙ্গে শেষ দেখা তার ক্রীক্‌রো-'র বাড়ীতে। আমি তখন সংসার-ধর্ম্মী। আমার এক রুগ্ন শিশু পুত্রকে নিয়ে তার ওখানে গিয়েছিলাম। ক্ষীরোদের তখন ডাক্তার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। আমার ছেলেকে দেখে সে বলেছিল,— "একে আমার কাছে রেখে যাও। একমাস পরে নিয়ে যাবে। দেখবে, ও'কে কেমন সবল, সুস্থ করে তুলেছি।"

অবশ্য, সাংসারিক কারণে ছেলেকে ক্ষীরোদের নিকট রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

* * * * *

রেডিও-তে যেদিন শুনলাম, ডঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী দেরাদুনে তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন, সেদিন পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছিলাম।



ঃ মুজীবর রহমান ঃ

ইনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীব নহেন। ইনি ছিলেন ইংরেজ আমলের একজন পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর, ইং ১৯২৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুল্পী থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। আমি তখন কুল্পীতে রাজনৈতিক বন্দীরূপে অন্তরীনাবদ্ধ। থানার অফিসারের কোয়ার্টারের পিছনে একটি খালি জায়গায় একটা খড়ের ঘর আমার বাসস্থান হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। বাঁশের কঞ্চির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরী তার বেড়া, ঘুলঘুলির মত ছোট্ট একটি জানালা। ঘরের চাল এত নীচু ছিল যে, প্রায় অর্দ্ধেক খানা বারান্দাই আচ্ছাদনশূন্য ছিল, চালের খড় সব গরুর পেটে চলে গিয়েছিল, রাখালরা চরবার জন্য গরু ছেড়ে দিলেই চারধারের মাঠের উপকণ্ঠে এই ছোট্ট ঘরখানি তাদের আকর্ষণ করতো এবং উপাদেয় খাদ্য হিসাবে এই চালের খড় মুখে টেনে নিয়ে তারা নিমীলিত নেত্রে বেশ আরামের সঙ্গে চর্ব্বন করতো। কেউ কেউ আবার বিশ্রামের স্থান হিসাবে বারান্দাটা বেছে নিয়েছিল। যাবার সময় আমাকে উপহার দিয়ে যেত, পায়ু-পথে নিঃসারিত তাদের পবিত্র পদার্থ এবং কখনো কখনো তার আনুসঙ্গিক তরল পদার্থটুকু-ও। কাঁচা মেঝে তাতে সিক্ত হয়ে কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল ত হতোই, এক বিশেষ প্রকারের উগ্র গন্ধে আমার নাসারন্ধ্রকে উদ্দীপিত করতো।

এই বারান্দাটি ছিল যেমন, গো-দেবতাদের সাময়িক বিশ্রাম-স্থল, বাড়ীর ছোট্ট চৌহদ্দী টুকুও ছিল তেমনি মা-মনসার বাহনদের বিচরণ ক্ষেত্র। আমি অনেক সময় ঘরে বসে বসে সেই ছোট্ট জানালা দিয়ে তাদের লীলা খেলা দেখতাম। ঝোপে ঝাড়ে ভরতি একটু উঁচু পরিত্যক্ত স্থানে অবস্থিত বলেই বোধ হয় ঐ অঞ্চলের সমস্ত সাপ এই ভিটেটাকে তাদের যোগ্য আস্তানা বলে বেছে নিয়েছিল। একদিন দেখলাম বেশ বড়, মোটা একটি সাপ আমার ঘরের ঠিক পিছনটাতেই ধীরে ধীরে বিচরণ করছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ-বেগে সে একটি ঝোপের দিকে ছুটে গেল। পরক্ষণেই দেখি তার মুখে একটি ছোট সাপ। ধীরে ধীরে ছোট সাপটিকে সে গলাধঃকরণ করছে। সাপে যে সাপ খায় এই প্রথম দেখলাম।

পাশের রান্নাঘরটি ছিল আরো ছোট ও নীচু। অনেকটা হাঁস মুরগী পালবার ঘরের মত। এর পিছন দিকটা ছিল একেবারে নিরালা, শুধু এখানে ওখানে দু' একটা

খেজুর ও বাবলা গাছ। সেখানে যে ছোট বড় কত বিভিন্ন জাতীয় সাপ চরে বেড়াত, তার ঠিক ঠিকানা নেই। রান্না-ঘরের ফুটো মতন জানালা দিয়ে কতদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাপের জোড়-বাঁধা, অলস বিশ্রাম উপভোগ। বোধ হয় চেষ্টা করলে সেখান থেকে বিভিন্ন অবস্থায় সাপের আচরণ নিরীক্ষণ করে সর্প বিশেষজ্ঞ হয়ে যেতে পারতাম। তবে একটা উপকার আমার হয়েছিল। কুন্‌পীতে থেকে সাপ সম্বন্ধে আমার ভীতি একেবারে কমে গিয়েছিল।

আমার কুড়েঘর থেকে থানায় যাবার একটা "সর্ট-কাট' রাস্তা ছিল; একজন এ. এস. আই-এর খালি কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে। বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে না গিয়ে থানায় যাবার জন্য আমি সেই রাস্তাটাই ব্যবহার করতাম। সরু পায়ে হাঁটা পথ। দু'ধারের বনজঙ্গল রাস্তায় পড়ে রাস্তাটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। একদিন ঐ পথে থানায় যাচ্ছি, এক পা' ফেলার পর অন্য পা' ফেলতে উদ্যত হয়েছি। দেখি পাশের বন থেকে এক প্রকাণ্ড সাপের মাথা বেরিয়ে আমার পায়ের সম্মুখে। সাপটি এধারের জঙ্গল থেকে ওধারে যাচ্ছে। দ্রুত পা' সরিয়ে একটু পিছিয়ে গেলাম। সর্পমহারাজকে আগে রাস্তা পার হতে দিয়ে পরে আমি সেই রাস্তায় অগ্রসর হলাম। একাধিক দিন এইরূপ ঘটেছে।

একদিন আমি ও একজন এ. এস. আই (নগেন বসু) ঐ খালি কোয়ার্টারের কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। দেখতে পেলাম, একটি শালিক পাখি "চ্যাঁ চ্যাঁ" শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সুরুৎ করে নীচে নেমে এসে পায়ের নখ দিয়ে মাটি-সংলগ্ন কোন কিছুকে আঘাত করার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাস ও আগাছার ভিতর থেকে একটা সাপ মাথা উঁচু করে "হিসহিস" শব্দ করছে এবং পরক্ষণেই মাথা নীচু করে ছুটে পালাচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। পাখীটা যখন নীচে নেমে এসে পায়ের নখের আঘাত দিতে চায়, সাপটা তখন ফণাতুলে 'হিস্ হিস্" শব্দ করে এবং পরক্ষণেই ছুটে পালায়। সাপটা নাকি গোখ্‌রো এবং নগেনবাবু বললেন, খুব সম্ভব সাপটা পাখীর বাসায় গিয়ে তার ছানা খেয়েছে, তাই পাখীটার এতো রাগ।

আমার জন্য যে পায়খানা তৈরী হয়েছিলো, তা' ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। আমি তাই থানার পায়খানায় যেতাম। সেটা ছিল একটা খালের ধারে। মল গিয়ে খালের জলে পড়তো। একদিন পায়খানায় গিয়েছি, মাথার উপর একটা "সর্ সর্" শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি, টিনের চালের নীচে কতকগুলি বাখারি আছে, তার উপর দিয়ে একটি বেশ মোটা সাপ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি অবশ্য আতঙ্ক-গ্রস্ত হইনি, কারণ, সর্পাতঙ্ক আমার ইতিপূর্বেই দূরীভূত হয়েছিল। থানার লোকেদের কাছ জান-

লাম, সাপটির পাবখানার ছাদে বিহারের কথা সকলেই জানেন। তবে ঢোঁড়া সাপ, বিষাক্ত নয় বলে সকলে আমাকে আশ্বাস দিলেন।

সন্ধ্যার পর থানা থেকে ফিরে ঘরের দরজার তালা খোলবার সময় একদিন কী একটা জিনিস 'থপ্' করে নীচে মাটিতে পড়লো। তখনকার দিনে টর্চ বাতিব প্রচলন হয়নি। অন্ততঃ আমার তা' ছিল না। ঘরে ঢুকে, হ্যারিকেন জেলে খুঁজতে খুঁজতে চালের হাঁড়ির তলায় একটি সাপের অবস্থান আবিষ্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই লগুড়াঘাতে তার ভবলীলার সমাপন ঘটিয়ে দিলাম। ঘরের ভিতর ত বটেই, এমন কি, বিছানার তোষকের তলায় ও মাঝে মাঝে সাপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সর্পরাজ্যেব অধিকর্তারা কিন্তু আমার প্রতি বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষ করে বড় দারোগা মুজীবর রহমান সাহেব। প্রেঢ ভদ্রলোক, পবিবাব পরিজন ছেড়ে অনেকদিন ধবে একাই চাকরীস্থলে আছেন। আমার বয়স ২৩/২৪ বৎসব হবে। আমার প্রতি একটু অপত্য-স্নেহের উদ্রেক হওয়া-ও অস্বাভাবিক নয। সবাইকে বলতেন —"সুধাংশু বাবু ত' আমাব প্রতিবেশী।"

'কী রকম?"

"ওঁর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায আর আমার বাড়ী নদীর ওপাবেই পাবনা জেলাব সিরাজগঞ্জে।"

নদী যে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তার বিস্তার যে কত বিশাল, তা' দারোগা সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। আমি বলতাম—

'কিন্তু দাবোগা সাহেব, আমি যে ময়মনসিংহ জেলার অপর প্রান্তের লোক। আমার বাড়ী যে কিশোবগঞ্জে।" [ময়মনসিংহ ছিল ব্রিটিশ ভাবতের সর্ব্ববৃহৎ জেলা।]

"তা' হোক্ গে'। আমাদের জেলা দু'টি ত' পাশাপাশি।"

থানার আফিসেই দিনের অনেকটা সময় কাটাতাম। সর্প-অধ্যুষিত, গোচারণ-ভূমি সংলগ্ন আমার নিরালা কুটিরে একা একা তপস্বীর মত জীবন যাপনে তখন-ও অভ্যস্ত হইনি। থানায় বসে নানা প্রকার মামলা মোকদ্দমার বিবরণ শুনতে ভালোই লাগতো। আমি থানা অফিসে বসে থাকলে দারোগা সাহেবও বেশ খুশী হ'তেন। উপরে নানা রিপোর্ট পাঠাতে হতো। তার অনেকগুলি 'কন্‌ফিডেন্‌শিয়্যাল'। আমাকে পড়ে শুনাতেন। জিজ্ঞাসা করতেন, "ইংরেজীটা ঠিক হলো কিনা, বলুন ত"।

আমি বলতাম, "আপনি এতদিনকার পুরানো অফিসার। আপনার লেখা ঠিক

হয়েছে কিনা, সে আমি বলবো ?”

“তা’ নয়। আমাদের ইংরেজী ত। গ্রামার-ও জানিনা, ভাষা-ও জানিনা। অভ্যাসেব বশে লিখে যাই।”

বাস্তবিক পক্ষে, দারোগা সাহেব ইংরেজী ভালই লিখতেন।

আমাকে বলতেন, “আপনার উপব অনেক বিধি-নিষেধ জারি করা আছে। সে-গুলি মেনে চলছেন কি না, দেখার ভাব আমার উপর। কিন্তু, আমার সাফ কথা, কোন বিধিনিষেধ-ই আপনাকে পালন করতে হবে না। শুধু দেখবেন, যেদিন ইজ্জত ভাঙা জোনস্ আসবে, সেদিন বাড়ীতে থাকবেন। অবশ্য, কবে আসবে, তার খবর আমাদেব কাছেই পাবেন।

ইজ্জত-ভাঙা জোন্স্ মানে **E. B Jones**। ২৪-পবগণা জেলার তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট। লোকটা নিজের অধস্তন কর্মচারীদেব নিকট-ও অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল। তাই, পুলিশ মহলে তাব নাম হয়েছিল—**E. B.**’ব স্থানে ‘ইজ্জৎ-ভাঙা’।

এই ইজ্জৎ-ভাঙা জোনসের একদিন আগমন হ’লো থানা পরিদর্শনে। আমার কুটিরও দেখতে গিয়েছিল। গকতে খাওয়া নীচু চালের তলা দিয়ে বেশ উবু হয়ে ঘরে ঢুকে সব দেখে বললো—“তুমি বেশ আরামেই ত’ আছ।” “(**You are leaving comfortably**”) ঠাট্টা করে বলে নি। তাম্রতুরী জাতির বৈশিষ্ট্য যাবে কোথায় ? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে ওদেব কেউ কেউ আনন্দ পায়।

কিছুদিন ধবে ‘কনষ্টিপেশনে’ ভুগছিলাম। একদিন ‘পারগেটিভ’ নিয়ে পেটটা পরিষ্কাব কববো ভাবলাম। রাখালবাবু এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। রাখাল ঘোষ থানার ‘এল্, সি’ বা লিটারেট কন্ষ্টেবল্’। র‍্যাঙ্ক কন্ষ্টেবলের-ই, তবে লেখা-পড়া জানা বলে অফিসে কেরানীর কাজ করেন। ‘মুন্সী’ নামে তিনি অভিহিত।

যে ডাক্তাবের কাছে গেলাম, তাঁব নাম ধ্রুবচন্দ্র মণ্ডল। ওখানকার সব চেয়ে ভাল ডাক্তার। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, ইউনানী—সবরকম চিকিৎসাই করেন। আমায় একটি বড়ি দিলেন,—‘ইচ্ছাভেদী বটিকা।’ বড়িটি খেয়ে চিনির জল খেতে হবে। আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করবো, পেটটা আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার, ততক্ষণ চিনির জল খেয়ে যাবো, তাতে পায়খানা হবে। আর যখন মনে করবো, এইবার বন্ধ হওয়া দরকার, তখন মিস্ত্রি-ভিজান জল খেলেই পায়খানা বন্ধ হবে।

বড়ি খাওয়ার পর চিনির জল খেয়ে যেতে লাগলাম। বেশ পায়খানা হ'তে

লাগলো। আরেকটু পরিষ্কার হলে ভাল হয় ভেবে, চিনির জল খেয়ে চললাম। শেষে একবার পায়খানায় গিয়ে আর উঠতে পারিনে। শরীর অবশ হয়ে গেল। থানার পায়খানা দূর বলে ওখানে যাইনি। নিকটস্থ একজন এ, এস, আই-র খালি কোয়ার্টারের পায়খানায় গিয়েছিলাম। প্রায় অচেতন হয়ে পায়খানার সম্মুখস্থ একটি চাতালে শুয়ে পড়লাম।

সেদিন ছিল থানার হাতা পরিষ্কারের দিন। মাসে একদিন করে এ দিনটা আসে। চৌকিদারেরা যেদিন বেতন নিতে আসে, সেদিন থানা-কম্পাউণ্ডের সমস্ত জঙ্গল, আগাছা তারা পরিষ্কার করে দেয়। আমি যেখানটায় পড়েছিলাম, সে অঞ্চলটায় যারা কাজ করছিল, তারা আমায় দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর গেল এবং বড় দারোগাসহ থানার সকল অফিসার ও কনেষ্টবলেরা ছুটে এলেন।

আমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ডাক্তারকে ধরে আনতে সিপাই ছুটলো। ডাক্তার এলে শাসানির সুরে দারোগা সাহেব বললেন, "এখানে রোগীর পাশে আপনাকে সারা রাত বসে থাকতে হবে। যা' তা' ওযুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে ?"

ডাক্তার তাঁর নির্দ্দোষিতার কথা যতই বলতে চেষ্টা করছেন, দারোগা সাহেব তা' কানেই তুলছেন না। আর, তখনকার দিনে দারোগাদের প্রতাপ ছিল অসীম, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। যা' হোক, ডাক্তার এসে আমাকে মিশ্রির জল খাইয়ে দিলেন। ক্রমে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। বেলা প্রায় চারটে থেকে রাত দশটা এগারটা পর্য্যন্ত ডাক্তার রইলেন। পরে আমাকে বিনীতভাবে বললেন, "আপনি একটু বললে আমি এখন বাড়ী যেতে পারি। আপনি এখন বেশ সুস্থ ত' ?"

একজন এ, এস, আই আমার ঘরে ছিলেন। ডাক্তারকে ছেড়ে দিবার জন্য তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম। বললাম যে, ডাক্তারের কোন দোষ নেই। দোষ আমার-ই। ডাক্তার রেহাই পেলেন।

একবার একটা ব্যাপারে মুজীবর সাহেবের সৎ সাহসের কথা জেনে খুশী হয়েছিলাম। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে এক একটি থানায় আশেপাশের দশবারোটি থানার 'ও সি'-রা এবং তাঁদের ওপরওয়ালা সেই অঞ্চলের সার্কেল ইনসপেক্টর মিলিত হতেন। সারাদিন ব্যাপী তাঁদের কনফারেন্স চলতো। ঐ অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তা'তে আলোচনা হতো এবং নতুন কোন পন্থা অবলম্বন করলে শান্তি রক্ষা সহজতর হতে পারে কিনা, সে বিষয়ও বিবেচিত হতো। সেদিন খানাপিনারও খুব ধূম হতো।

আমি থাকাকালীন, কুল্‌পীতে এইরূপ একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাটা 'কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল' এবং তাতে গৃহীত প্রস্তাব বা নীতি অন্যদের জানা নিষেধ। সন্ধ্যা-বেলায় থানায় গিয়ে টের পেলাম, বেশ উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কনফারেন্স শেষ হয়েছে।

পরদিন দারোগা সাহেবের নিকটই জানলাম, সার্কেল ইনস্‌পেক্টর চাপ দিয়ে যে-বিষয়ে তাঁদের সম্মতি আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, তাতে সফল হননি।

বিষয়টা ছিল এইরূপ। পুলিশ অনেক সময়ই কোর্টে মোকদ্দমায় হেরে যায় আসামীর বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণাদি উপস্থাপিত করতে না পারার দরুণ। এ অবস্থায় 'সি, আই' (সার্কেল ইন্‌সপেক্টর)-এর মত হলো, আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়, সুবিধামত কিছু মিথ্যা জুড়ে দিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে তাকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

'সি, আই'-র যুক্তি হলো—"আমরা অনেক সময় জানি যে, আসামী এই অপরাধ করেছে এবং অনুভব করি তার সাজা হওয়া দরকার। কিন্তু অপরাধের অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ হয়, তা' আসামীর শাস্তি প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যদি তাকে দমন করা যায়, তাতে দোষ কি?"

প্রথম দিকে 'সি, আই'-এর এই যুক্তিকে অনেক দারোগাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, মুজীব সাহেবই প্রথম ভীষণ আপত্তি তোলেন—"এমনিতেই পুলিশের নানা বদ্‌নাম আছে, বিশেষ করে অসাধুতার। তার উপর যদি নীতি-হিসাবে এই অসাধুতাকে গ্রহণ করা হয়, তবে পরিণামে যে এর কী কুফল হবে, তা' একবার চিন্তা করা দরকার। অনেক নিরীহ মানুষ এর শিকার হবে। দুষ্টকে দমন করতে গিয়ে এই অস্ত্রে নিরাপরাধকে শাস্তি দেবার পথকেই প্রশস্ত করা হবে।"

শেষ পর্য্যন্ত, অধিকাংশের মত মুজীব সাহেবের পক্ষেই যায়। 'সি, আই' বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান।

আর দু'একটি কথা বলেই কুলপী প্রসঙ্গ শেষ করি।

একদিন বড় জমাদার (**Senior A.S I.**) অধরবাবু আমাকে বললেন, "আচ্ছা! সুধাংশু বাবু, আপনার বাড়ী ত ময়মনসিংহ জেলায় বলছেন। কিন্তু চেহারায় ত তা মনে হয় না।"

"চেহারায় আবার কোন্ জেলায় বাড়ী তা' বোঝা যায় না কি?"

"তা' যায় বৈ কি! তবে শুনুন। আমি যখন পুলিশ-ট্রেনিং-এ ছিলাম, তখন

আমাদের সঙ্গে ঢাকা জেলার একজন এ, এস্, আই ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। কোন্ জেলার কী বৈশিষ্ট্য সে সম্বন্ধে আমাদের জানতে হতো। আমার সেই ঢাকাই 'কলিগ' (Colleague) ঢাকা বিভাগের চারটি জেলা সম্বন্ধে বেশ একটি ছড়া বানালেন। তা'তে ময়মনসিংহ সম্বন্ধে আছে—'ষণ্ডা গুণ্ডা, বুদ্ধিহীন।

তার বাড়ী মৈমনসিং,

আপনি ত এর একটি-ও নন'

একটু হাসলাম। বললাম, "আর তিনটি জেলার ছড়াগুলিও একটু বলুন।"

"বরিশাল আর ফরিদপুরের সম্বন্ধে এইরূপ:

'খুন, দাঙ্গা, বালাম চাল,
এই নিয়ে বরিশাল'

আর

'খাল. বিল, খেজুর গুড়
এই নিয়ে ফরিদপুর।

তাঁর নিজের জেলা ঢাকা সম্বন্ধে ভদ্রলোকের ছড়া হলো—

বিদ্যা, বুদ্ধি, পয়সা-টাকা
এই নিয়ে আমাগো ঢাকা।

'আমাগো' কথাটা বলে ভদ্রলোক নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করতেন।" অধর বাবুর গল্পটি শুনে আমরা উপস্থিত সকলে বেশ আমোদ উপভোগ করলাম।

কুল্পী থানায় তখন কনেস্টবল যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভিতর এঁদের নাম মনে আছে—নাসের আলি, জগদেও সিং, আব্দুল সাত্তার, রমনী ঘোষ। নাসের আলি পেশোয়ারের লোক। তার নিকট আমার উর্দ্দুর হাতে খড়ি হয়। কিছু পুশ্‌তো বুলি-ও সে আমায় শিখিয়েছিল।

প্রায় বছর খানেক পর আমার অন্যত্র বদলির আদেশ এলো। উপর থেকে থানায় নির্দ্দেশ এলো—নৌকা কিম্বা পালকী করে 'ডেটিনিউ'-কে ডায়মণ্ড-হারবার থানায় পাঠিয়ে দিতে। সেখানে তার গন্তব্য-স্থানের নির্দ্দেশ পাওয়া যাবে।

নৌকা বা পাল্কি কোনটাতেই আমি যেতে রাজী হ'লাম না। কুল্পী ডায়মণ্ড-হারবার থেকে আরো দক্ষিণে। নদীর উত্তাল তরঙ্গ নৌকাকে যে-ভাবে দুলুনি দেয়, তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আসবার বেলায়। আর পাল্কি! এই সামন্ত-তান্ত্রিক বাহনে চড়ে' গরমে, ঘামে একশা' হয়ে ভ্রমণ করা—সে আমার পোষাবে না। থানা থেকে একখানা সাইকেল চাইলাম। ডায়মণ্ডহারবার থানায় 'তা' জমা দিয়ে দেব।

তাই ব্যবস্থা হলো। নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি সাইকেলে চড়ে ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে আমি রোয়ানা দিলাম। আরেকটি সাইকেলে একজন কনস্টেবল আমার অনুগমন করলো। যাবার সময়টা দারোগা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। ডায়মণ্ড-হারবাব আদালতে তাঁকে যেতে হয়েছিল মামলা উপলক্ষে। আমি যখন ডায়মণ্ড-হাববারেব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তখন দেখতে পেলাম দারোগা সাহেবও ফিরে আসছেন। উভয়েই নামলাম। সেই উঁচু বাঁধানো নদীর পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। আমার শুভ কামনা করে উনি বিদায় নিলেন। উভয়েই জানি, এই-ই শেষ দেখা। দু'দিনের জন্য এই চেনাশোনা হয়েছিল এবং দুই বিপরীত শিবিবের লোক হয়েও উভয়েব ভিতব একটা প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

—

ঃ নীলরতন মুখাজ্জী ঃ

বহরমপুর পুলিশ ক্লাবে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামে রাজবন্দীরূপে প্রেরিত হলাম। বহরমপুরে থাকার এক কারণ উপস্থিত হয়েছিল।

২৪-পরগণা জেলার কুল্পীতে বছরখানেক অন্তরীণ থাকার পর সরকারের আদেশ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুরে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে যখন আমার উপর সাগরদীঘিতে অন্তরীণের আদেশ জারি করা হলো, আমি বললাম, "শীতকাল এসে গেছে; আমার শীতবস্ত্র কিছুই নেই। ও'গুলি না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন গ্রামে গিয়ে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।"

সাহেব পুলিশ সুপারের নামটা মনে নেই। তবে তিনি ২৪-পরগণার 'ইজ্জৎ-ভাঙা' জোন্‌সের মত ছিলেন না। আমার যুক্তি মেনে নিলেন। কর্ম্মচারীদের আদেশ দিলেন আমার জন্য প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র বহরমপুর থেকে তৈরী করে দিতে। যতদিন তৈরী না হয়, ততদিন আমি বহরমপুর পুলিশ ক্লাবে থাকবো।

আই, বি'-র লোক আমাকে নিয়ে দোকানে গিয়ে র‍্যাপার ও আর দু' একটা জিনিস তখনই কিনে দিলেন এবং লেপ, গরম কোট সার্ট প্রভৃতির জন্য অর্ডার দিলেন। আমি বললাম, "অর্ডার দেওয়া জিনিসগুলি যত দেরীতে ডেলিভারী দেয়, তারই ব্যবস্থা করুন। তা'হলে সে কয়টা দিন শহরে কাটিয়ে যেতে পারি। গ্রাম্য পরিবেশ থেকে এই এলাম; একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।' ভদ্রলোক হাসলেন। তবে ব্যবস্থা তাই করলেন।

মফস্বল থেকে যে-সব পুলিশ কর্ম্মচারী সদরে কাজে এসে দু'একদিন থাকেন, তাঁদের খাওয়া থাকার স্থান এই পুলিশ ক্লাব। সদরের দু'একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে স্থায়ীভাবেও এখানে থাকতে দেখেছি। আমাকে একখানা দু'সিটের ঘর দেওয়া হলো এবং সর্ব্বক্ষণের জন্য পালাক্রমে একজন কনষ্টেবলকে গার্ড নিযুক্ত করা হলো। ঘোরা ফেরার ব্যাপারে কতকগুলি বিধি-নিষেধও আরোপিত হলো। অবশ্য, সেগুলি শুধু কাগজে পত্রেই নিবদ্ধ রইল। যে-গার্ড সঙ্গে থাকে, আমাকে অনুসরণ করাই তার কাজ, নির্দ্দেশ দেওয়া নয়। কাজেই সকাল বিকাল দু'বেলাই যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতাম।

বহরমপুরের মিষ্টি প্রসিদ্ধ। কোন মিঠাই দোকানে ঢুকে দু'জনে দু'বেলা জলখাবার সেরে নিতাম। সঙ্গী কনষ্টেবল তাতেই খুব খুশী। এইভাবে শুধু বহরমপুর শহর নয়, কাশিমবাজাব, এমন কি, লালবাগ পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমার মতন একটি 'ছোট্ট ছেলেকে' গভর্ণমেন্ট নজরবন্দী করে রেখেছে শুনে পুলিশ ক্লাবেব 'পাচক ঠাকুব ও ঝি'-ত' অবাক। বর্ষীয়সী ঝির চোখে দুঃখে জল এসে গেল। তাদেব এই স্বাভাবিক সহানুভূতির ফলে খাবারেব শ্রেষ্ঠাংশ আমার পাতে পডতো। কিন্তু, আমি ববাববই স্বল্পাহাবী। তাই, অনেক কিছুই খেতে পারতাম না।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগেকাব কথা মনে পডছে। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পডি, হোষ্টেলে থেকে। কাশীঠাকুব আমাদেব প্রধান পাচক। গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, লম্বা চেহাবা। দেখলে কেউ পাচক বলে ভাবতে পারতো না। হোষ্টেলে মাসে একদিন করে 'ফিস্ট' হতো। সেদিন সমস্ত আহার্য্য উদরস্থ করা আমাব পক্ষে সম্ভব হতো না। শেষেব দিকে পাযেস, মিষ্টি ইত্যাদি প্রায়ই ছেড়ে উঠে আসতাম। পরদিন সকালে হয়ত, ঘবে বসে পডছি, কাশী ঠাকুব এসে ডেকে নিযে যেতেন বান্না ঘবে। একবাটি পায়েস ও মিষ্টি সামনে বেখে বলতেন, বাবু, আপনি কাল খেতে পারেন নি, তাই রেখে দিয়েছি।" এমনি অপ্রত্যাশিত স্নেহ যে এ জীবনে কত কুডিযেছি, আজ তা' ভাবলে মন ভরে উঠে।

পুলিশ ক্লাবে থাকাকালীন আবেকটি ঘটনা ঘটেছিল—যার উল্লেখ না করে পাবছি না। একদিন বাত্রে এক পুলিশ কর্ম্মচাবী এলেন। অন্য সব ঘর ভর্ত্তি থাকায আমাব ঘবে খালি সিট্‌টায তাঁকে থাকতে দেওয়া হলো। পরদিন খুব সকালে উঠে, হাত-মুখ ধুয়ে তিনি বেবিযে গেলেন। কৌতুহলবশতঃ আমি তাঁব বালিশখানা তুললাম। দেখতে পেলাম একটি বিভলবার ও একখানা বেশ মোটা ডায়েরী-খাতা সেখানে বয়েছে। ডায়েরী খানা পড়ে বুঝতে পারলাম, তিনি সেন্ট্রাল আই, বি'র এক-ওয়াচাব। বাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজনের পিছনে ঘোবেন। সেদিন সকাল বেলাটা ঐ ডায়েরীখানা পডতেই কেটে গেল। তাবিখ দিয়ে তাঁর প্রতিদিনকার কার্য্যকলাপ লেখা। প্রায়ই লেখা আছে, রিপোর্ট দেবার মত কিছু নেই। চার-পাঁচদিন এমনি লেখার পর একদিন রহস্য-উপন্যাসের মত ঘটনাবলীব বিবরণ। একজনকে অনুসরণ করে হাওড়া থেকে লাহোর পর্য্যন্ত ধাওয়া; তারপর অনেক কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনা। এমনিতর উপর্য্যুপরি কয়েকদিন কোন কিছু ঘটনা না থাকার পর হঠাৎ একদিন করে ঘটনার ঔপন্যাসিক বিববণ পড়ে' স্বভাবতঃ-ই মনে হয় ঐসব বিবরণ কাল্পনিক। কারণ, যদি কোন কর্ম্মচারী শুধু 'Nothing to report' বলেই চালিয়ে যায়, তবে কর্তৃপক্ষের নিকট তার অকর্ম্মন্যতা-ই প্রমাণিত হবে। তাই সেই অকর্ম্মন্যতা ঢাকবার জন্যই নিয়মিতভাবে কিছু-

দিন পর পর অলীক কাহিনী রচনা করতে হয়।

ভদ্রলোক ফিরে এলে আমি বললাম, "মশায়, আমি কে আপনি জানেন ?"

"কোন থানার দারোগা হবেন।"

"ঠিক তার উল্টো ; আমি একজন রাজবন্দী, আপনি যাদের পিছনে ঘুরে বেড়ান। আপনার ডায়েরী এবং অস্বাদি এভাবে ফেলে যান, অপরিচিতের নিকট। আপনাকে ত বেশ বিপদে ফেলতে পারতাম।"

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন। আমার পুলিশরক্ষীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে বুঝতে পারলেন আমি সত্যি কথাই বলছি। অত্যন্ত মোলায়েমভাবে আমায় তোষামোদ করে বললেন,

'জানি, আপনাদের প্রাণ কত মহৎ। তা' না হলে এ পথে কেউ পা' দেয় ? আমার কোন অনিষ্ট আপনি করবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

মাস খানেক বহরমপুর শহরে কাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সাগরদীঘিতে আসা গেল। সময়টা বোধ হয়, ১৯২৫-এর শেষ দিক অথবা '২৬-এর প্রথম। বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল থানা থেকে একটু দূরে, রেল ষ্টেশনের কাছে একটি ভাড়া বাড়ীতে। ভাড়া বাড়ীগুলি সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের তৈরী বাড়ীর চেয়ে ভাল হয়। এ'টা ছিল মাটির দোতলা বাড়ী, টিনের ছাউনি। একতলাটাই আমার জন্য নেওয়া হয়েছিল। দোতলায় কেউ বাস করতো না ; বাড়ীর মালিকের নানা জিনিসপত্র থাকতো।

একদিন সকালবেলা দরজার কাছে চেয়ারে বসে আছি। সময়টা বর্ষাকাল। আগের রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের সামনে দিয়ে 'পো-পাড়া' গ্রামের দিকে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, এঁটেল মাটির পুরু কাদাতে তা' সমাচ্ছন্ন। এমন সময় এক বীভৎস দৃশ্য দেখে চম্‌কে উঠলাম। একটা মৃতদেহের পায়ে দড়ি বেঁধে একজন প্রায়-বৃদ্ধা, অনশন-ক্লিষ্টা মেয়ে-মানুষ সেই রাস্তা দিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় এক গভীর দাগ কেটে যাচ্ছে। আমি লাফিয়ে উঠলাম। আমার ঠিকে ঝি সুরধুনী ঘরে কাজ করছিল। সে বললো, "বাবু, ওরা একঘরে। গ্রামের কেউ ওদের মড়া ছোঁবে না। এই দু'টি প্রাণী নিয়েই এদের সংসার—ভাই আর বোন। কাল রেতে ভাই মরে গেছে। মড়া নেবার কেউ নেই, তাই বোন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রেল-লাইনের ধারে কোথাও ফেলে দেবে। শেয়ালে শকুনে খেয়ে নেবে।"

আমি শিউরে উঠলাম। এ’-ও সম্ভব? এই বিংশ শতাব্দীতে, একটা থানার যেখানে অস্তিত্ব রয়েছে, এমন অঞ্চলে? আরো জানতে পারলাম, ওরা বাউড়ী জাতীয় লোক; ভিক্ষা করে কোনরকমে দিন কাটাতো। লোকটা অনেকদিন ধরেই অসুখে ভুগছিল। চিকিৎসা ও খাদ্যের অভাবেই মরেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, “কী দোষ করেছিল ওরা, যে সমাজ ওদের একঘরে করলো?”

“সে তুমি বুঝবে না, বাবু। দোষ করেছিল বলেই ত’ জাতের লোকেরা একঘরে করেছে।”

আকাশ পাতাল মাথায় ঘুরতে লাগলো। কী করতেপারি আমি? লোকজন ডেকে জড় করে তাদের বোঝাবো, এ প্রভাব এখানে আমার নেই। একা মড়াটাকে বয়ে নিয়ে যাবার দৈহিক শক্তি-ও নেই। একমাত্র যা’ পারি, তা’ হলো, মেয়েটিকে রেহাই দিয়ে দড়ি টেনে মড়াটাকে একইভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু, তাতে আসল কাজ কিছুই হবে না, মৃতদেহ সৎকার হবে না। কেবলমাত্র আমি হয়ত কারো বাহবা কুড়াবো, কারো কাছে টিট্‌কারি খাবো। নানা কথা ভেবে ভেবে উত্তেজিত মনে অসহায়ভাবে সেখানেই বসে রইলাম। সুরধুনী এসে একবার তাগিদ দিয়ে গেল, “বাবু, তুমি গোমরা হয়ে এক ঠেইঞে বসে রইলে কেন? ওঠ, কিছু জলখাবার টাবার খাও।”

কিছু উত্তর দিলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। এইবার ভাবলাম, দেখে আসি মেয়েটা মড়া নিয়ে কোথায়, কদ্দূর গেল।

রেল-ষ্টেশনের কাছে যেতেই শুনলাম, ষ্টেশন মাষ্টার নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। সামনের রাস্তা দিয়ে এমন একটা বীভৎস দৃশ্য যেতে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। সব শুনে গায়ের জামা ও পায়ের জুতো খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। শবদেহটার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে হাতের দড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। তারপর ষ্টেশনের খালাসী নুর-মহম্মদকে ডেকে বললেন, “নুরু, তুই কোদাল নিয়ে আমার সঙ্গে আয়। হিন্দুদের সৎকার একে করা হবে না। একে কবর দেব। যদি তোদের শাস্ত্রের কিছু মন্ত্র তোর জানা থাকে, তবে মাটি দেওয়ার সময় তুই পড়বি।”

হিন্দু সমাজের প্রতি বেশ কিছু তীক্ষ্ণ ধিক্কার বাণীও তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল।

শুনলাম, তারপর ঐ মড়াটাকে তিনি কাঁধে নিয়ে সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে ডিষ্ট্যান্ট সিগ্‌নেলের দিকে এগিয়ে গেছেন। নুরু কোদাল হাতে তাঁকে সাহায্য করতে

পিছন পিছন গিয়েছে।

শুনে আমি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে এগোলাম। কিন্তু অল্পদূর যেতেই দেখি, কাদায় লিপ্ত-দেহ ষ্টেশন মাষ্টার ফিরে আসছেন। তাঁর পিছনে কোদাল কাঁধে নুরু। এগিয়ে গিয়ে মাষ্টার মশাই-র সঙ্গে দু'টো কথা বলতে-ও যেন লজ্জা লাগলো। একটু আগে যদি বাড়ী থেকে বেরোতাম, তবে মাষ্টার মশাইকে একটু সাহায্য করতে পারতাম। আজ নিজের কাছে নিজেকে সব রকমেই ধিক্কৃত মনে হচ্ছে।

নুরুর কাছে পরে শুনেছিলাম, ডিষ্ট্যান্ট সিগ্ন্যালের কাছে একটি ঝোপের ধারে মাটি খুঁড়ে মড়াটাকে কবর দেওয়া হয়েছে।

উপরে যে ষ্টেশন মাষ্টারের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরই নাম নীলরতন মুখার্জী। হাওড়াতে বাড়ী, শুনেছিলাম। প্রৌঢ়, দীর্ঘাঙ্গ, সবল দেহ। গোঁফ, নাসিকা এবং লোম-বহুল কর্ণ-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বল্প এবং স্পষ্ট ভাষী।

নীলরতন বাবু অল্পদিন পূর্ব্বে সাগরদীঘি ষ্টেশনে বদলি হয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক আমাকে দেখিয়ে নীলরতন বাবুকে বলেছিলেন—

"ইনি এখানে রাজবন্দী, খুব ভাল লোক।"

সঙ্গে সঙ্গে নীলরতন বাবু উত্তর দিলেন, "শেষের কথা কয়টি আপনাকে না বললেও চলতো। আপনি যদি কাউকে দেখিয়ে বলেন, 'ইনি একজন রায় সাহেব' তা' হলে উনি কেমন লোক, সে ধারণা আমার তখনই হয়ে যায়। আর এঁকে যখনই রাজ-বন্দী বলে পরিচয় দিয়েছেন, তখনই উনি কেমন লোক তা' বুঝতে পেরেছি।"

মহাকালের নিয়মে নীলরতন বাবু হয়ত, কবেই তাঁর পার্থিব লীলা শেষ করে চলে গেছেন, কিন্তু, আমার স্মৃতিপটে তাঁর ছবিটা আজও অটুট রয়েছে।



রেণু

তুপচাঁচিয়াতে একটি মেয়ের স্নেহ-বন্ধনে দারুণ আবদ্ধ হয়েছিলাম। মেয়েটির নাম রেণু। তবে সে-কাহিনী বলার আগে অন্য দু'একটা কথার অবতারণা করা যাক্।

তুপচাঁচিয়া বগুড়া জেলার একটি গ্রাম। সেখানে একটি থানা আছে। বগুড়া এখন 'বাংলাদেশে'র অন্তর্গত। বছর দেড়েক সাগর দীঘিতে অন্তরীণ থাকার পর, সরকার আমাকে এখানে বদলি করেন।

তুপচাঁচিয়াতে আমার জন্য যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা ছিল একটি বেশ বড় বনের ভিতর। একটা রাস্তার ধারে বিস্তৃত বাঁশ-বন। বাঁশ-বনের পরেই ঘন আম-বাগান। সবটা মিলে কয়েক একর জমি। আমবাগানের পর জমিটা হঠাৎ বেশ ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে একটা ছোট নদীতে। এ দিকটায় লোকের বসতি নেই। এই বাঁশ বনের সংলগ্ন খানিকটা জমি পরিষ্কার করে কুন্তীর ধাঁচেই একটি শোবার ঘর ও একটি রান্না ঘর তৈরী করা হয়েছিল। তফাৎ ছিল এই যে, ঘরের চাল ততটা নীচু ছিল না এবং কাদা মাটির প্রলেপ দেওয়া কঞ্চির বেড়ার ভিতর দিকটা চূণকাম করা ছিল। খড়ের চালের নীচে একটা চাটাই-এর সিলিং-ও ছিল।

এখানে আসার পর থেকেই এই স্থানটি সম্বন্ধে নানা গুজব কানে আসতে লাগলো। এই বাঁশবন নাকি ভূতের বাসস্থান। রাত্রে কেউ এ রাস্তা দিয়ে যেতে সাহস করে না। দুঃসাহস করে কেউ গেলে বাঁশগুলি নাকি মাটিতে শুয়ে পড়ে রাস্তা আটকে দেয়। আর সারারাত বাঁশবনে ভূতদের হুটোপুটি, লুটোপুটি, করুণ কান্না— এসব ত লেগেই আছে

শুনে একটু কৌতুক অনুভব করলাম। প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই এমনি কোন ভূতের বাড়ী বা ভূতুড়ে স্থান সম্বন্ধে প্রচলিত গুজব শুনেছি। কিন্তু, যাচাই করে দেখবার কোন সুযোগ এ পর্যন্ত পাইনি। এবার যখন ভূতের বনেই আমার বাস, তখন এ সুযোগটা পাবো বলে খুশী হলাম।

একটা বেশ বড় বনের ভিতর একটি ছোট্ট ঘরে একা থাকতাম। আশে পাশে লোকজনের বাস নেই। থানা-ও একটু দূরে। এ অবস্থায় ভূতে বিশ্বাস থাকলে রাত্রি

কাটান মুস্কিল হতো। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার ছিল না। বাঁশবনে রাত্রে হুটোপুটি বা অন্যান্য প্রকার আওয়াজ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের কিশোরগঞ্জের বাড়ীতে বেশ বড় বাঁশ-ঝাড ছিল। সন্ধ্যার পর থেকে সেখানে এই হুটোপুটি, মারদাঙ্গা ব্যাপার লেগে যেত। চোরে বাঁশ চুরি করছে ভেবে আমরা অনেক সময় আলো নিয়ে গিয়েছি, দেখতে। দেখা যেত, বেশ বড বেজী জাতীয় এক প্রকার জন্তু দল বেঁধে বাঁশ গাছের উপর দিয়ে ছুটোছুটি ক'চ্ছে, লাফাচ্ছে, ঝগডা, মারামারি করছে। ওখানকার স্থানীয় ভাষায় ঐ জন্তুগুলিকে 'ল্যান্দর' বলে থাকে। কোন বাঁশের আগায় ঐ প্রাণীগুলি উঠলে তাদের ভাবে বাঁশ নুইয়ে পড়ে। এমন কি, অবস্থা বিশেষে মাটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। আবার লাফিয়ে অন্য বাঁশে চলে গেলে বা নেমে গেলে সেই অবনত বাঁশটা সড়াৎ করে সোজা হয়ে উঠে যায়।

বাঁশ শুয়ে পড়ে পথ অবরোধ করার বা হুটোহুটি চেঁচামেচির ব্যাখা মিলে এখানেই। কাজেই, রাত্রে এসব শুনে আমার মোটেই ভয়ের উদ্দেক হতো না। তবে এক রাত্রের অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে বলছি।

রাত্রি বোধহয়, শেষ প্রহর। ঘুম ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়ে ঘুমাবার বৃথা চেষ্টা করছি। এমন সময় একটা মৃদু গোঙানি মতন শব্দ শুনতে পেলাম। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম। কোন জন্তুর আওয়াজ? ঠিক যেন শ্বাস নেওয়ার তালে তালে অস্ফুট কাতরানির ধ্বনি। আমার মাথায় একটা ভাবণার উদ্রেক হলো। এই বিশাল জঙ্গল। কোন লোক যদি তার শত্রুকে খুন করে থাকে, তবে ফেলে দিয়ে যাবার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাবে না। এ' নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। লোকটা মরেনি, মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এ সময় আমি যদি একটু সাহায্য করি, তবে হয়ত, বেঁচে-ও যেতে পারে। আর আমি উদাসীন থাকলে কাল সকাল পর্য্যন্ত হয়ত, বেঁচে থাকবে না। তখনই উঠে পড়লাম। হ্যারিকেন ও একখানা লাঠি নিয়ে বেরোলাম। কিন্তু, কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঘরে থেকে মনে হয়েছিল, আমার ঘরের খুবই কাছে। কিন্তু, বেরিয়ে মনে হলো, বেশ দূর থেকে আসছে। যা' হোক, বাঁশ-ঝাডগুলির তলায় হ্যারিকেন নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে, কোন কিছু আবিষ্কারে অসমর্থ হয়ে ফিরে এলাম। ঘুম আর হলো না। ভাবলাম, খুন, খারাপির কোন ঘটনা হলে কাল সকালেই তা' জানা যাবে।

পরদিন কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। আমি-ও এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিনি —না থানায়, না গ্রামবাসীদের কাছে। কারণ, একেই ত এরা ভূত সম্বন্ধে কু সংস্কারাবদ্ধ, ভূত যে নেই, তা' ভূতের আস্তানায় আমি নিরাপদে থেকে তাদের

বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতাম। এ অবস্থায়, যদি এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আমি করি, যার ব্যাখ্যা আমি দিতে অপারগ, তবে তাদের কু-সংস্কার ও ভীতিকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

তা'হলে, সে-রাত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা'তে কি ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে? মোটেই নয়। এ ঘটনাটার নিশ্চয়ই কোন হেতু আছে, যা' আমি বের করতে পারিনি বাঁশের ভিতর প্রাকৃতিক কারণে ছেঁদা হয়। সেই ছেঁদা দিয়ে বাতাস ঢুকলে নানা রকম শব্দ হ'তে পারে। সেই শব্দ কোন সময় প্রেত্নীর করুণ কান্না-রূপে কারো কানে যায়, কেউ বা তাকে বাঁশীর সুর বলে-ও মনে করতে পারে। গোঙানি-শব্দটা এইরূপ কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল কিনা কে জানে?

ডুগর্চাচিয়া থানার ভার-প্রাপ্ত দারোগা ছিলেন একজন তরুণ মুসলমান যুবক। নামটা ভুলে গেছি (আব্দুল হামিদ?)। পঞ্চ মকারের কয়েকটাতেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন। থানার অন্য কর্ম্মচারীরা বা ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে খুব সুনজরে দেখতো না। আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারেও সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করেছি।

অন্তরীনাবদ্ধ থাকাকালীন আমাদের উপর সরকার কর্তৃক কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। যেমন দু'বেলা থানায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দেওয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে না যাওয়া, কোন ছাত্র বা যুবকের সঙ্গে মেলামেশা না করা, সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বের না হওয়া বা কাউকে বাড়ীতে আসতে না দেওয়া ইত্যাদি। তবে, এসব বিধি নিষেধ সাধারণতঃ কাগজে পত্রেই নিবদ্ধ থাকে। থানার লোকেরা আমরা এসব পালন করছি কিনা, তা' নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু এখানে অন্যরূপ অভিজ্ঞতা হলো।

দক্ষিণ দিকে আমার জন্য যে সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা' থেকে সামান্য দূরে একটি ছোট নদীর উপর একটা কাঠের সেতু ছিল, রেলিং দেওয়া। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা সেই সেতুর উপর গিয়ে দাঁড়াতাম; বেশ স্নিগ্ধ হাওয়া উপভোগ করা যেত। একদিন সন্ধ্যায় ওখানে যাচ্ছি, আমার সীমানা পেরিয়ে কয়েক গজ এগিয়েছি, পিছন থেকে এসে দারোগা সাহেব বল্‌লেন, "সুধাংশুবাবু, আপনার সীমানা কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত"—বলে পিছনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

"তা' জানি", বলে আমি এগিয়ে গিয়ে অন্য দিনের মতই সাঁকোর উপর দাঁড়ালাম। তাঁকে এড় বে অগ্রাহ্য করাতে মনে মনে নিশ্চয়ই রুষ্ট হয়েছিলেন, তবে প্রকাশ্যে আর কিছু বল্‌লেন না।

যাই হোক, থানার আবহাওয়া অনুকূল নয় বুঝতে পেরে আমিও ঠিক নিয়ম-মাফিক দু'বেলা গিয়ে শুধু হাজিরা দিয়ে আসতাম, এক মিনিট-ও বেশী থাকতাম না। অথচ, অন্যান্য জায়গায় থানার অফিসে বসে কত গল্প গুজব করেছি, আড্ডা দিয়েছি। কিন্তু যত বজ্র আঁটুনি, ততই ফস্কা গেরো। দুপচাঁচিয়াতেই আমি অন্যান্য থানার চেয়ে বেশী ছাত্রদের সঙ্গে মিশেছি এবং তাদের রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

নদীর উপর যে সাঁকোটার কথা বলেছি, তার ওপারের অঞ্চলটা এপারের চেয়ে সমৃদ্ধ। সেখানে একটা বড় 'গঞ্জ' আছে এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদেরই বাস সেখানে। ওখানকার বেশ কিছু ছেলে শহরে কলেজে পড়ে। ঐ সময়টা ছিল পূজার ছুটি। কলেজের ছেলেরা ছুটিতে বাড়ী এসেছে। তারা আমাকে আবিষ্কার করে তিন চার জনের ব্যাচে থানার চোখে ফাঁকি দিয়ে আমার নিকট আসতো। আমরা আম-বাগানের চৌহদ্দী-ও ছাড়িয়ে নদীর পারে বসে দিনের পর দিন রাজনীতি আলোচনা করেছি।

এইবার রেণু-র কথায় আসি। গ্রামে একজন রাজবন্দী এসেছে কথাটা চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কৌতুহল বশে অনেকে এসেছিল আমাকে দেখতে। রাজ-বন্দীর আগমন সেখানে নাকি এই প্রথম। প্রথম দু' একদিন-ই এই কৌতুহলীদের ভিড় ছিল। পরে যখন তারা দেখলো যে, রাজবন্দী নামক জীবটা তাদের-ই মতন দু'হাত, দু'পা-ওয়ালা এবং একেবারে নিরীহাকৃতির একটি মানুষ, তখন তাদের কৌতুহল-ও নিভে গেল।

বোধ হয় দ্বিতীয় দিন। সকাল বেলা অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে এলো ছোট্ট ফুট্‌ফুটে একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে। আমি মেয়েটির দিকে দু'টো হাত বাড়ালাম আর অমনি সে ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো আমার কোলে। আমি বেশ বিস্ময় ও পুলক অনুভব করলাম। উপস্থিত অন্যান্য সকলে-ও একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

যে ছেলেটি রেণুকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল, তার নাম বাদল। বাদলকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে ওখানকার সরকারী ডাক্তারের ছেলে। রেণু তার ভাই-ঝি। রেণুর বাবা-ও ডাক্তার, তবে তিনি অন্যত্র চাকরি করেন। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে নিজের পিতার কাছে রেখে গেছেন।

প্রথম দর্শনেই আমাদের ভিতর যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল, তা' শেষ পর্য্যন্ত

অটুট-ই শুধু থাকেনি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম প্রথম বাদল রেণুকে আমার নিকট দিয়ে যেত, তার নিজের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বাড়ী থেকে রেণুকে রাখবার ভার দেওয়া হতো বাদলকে; বাদল যখন দেখল যে, রেণু 'রাজবন্দী বাবু'-র বেশ অনুরক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে রোজই সকালে এবং বিকালে তাকে আমার কাছে দিয়ে নিজে খেলাধূলা করতে চলে যেতো। বাড়ী ফিরবার সময় রেণুকে নিয়ে যেতো। দু'একদিন পরেই বাড়ীর লোকে যখন জানতে পারলো যে, রেণু রাজবন্দী-বাবু'র কাছেই থাকে, তখন শুধু সকাল বিকেল নয়, প্রায় সারাদিনের জন্যই রেণুর জিম্মাদার হয়ে গেলাম আমি। আগে, দুপুর বেলাটা রেণু তার মার কাছেই থাকতো। এখন থেকে দুপুরেও তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। সঙ্গে আসতো তার কাঁথা, বালিশ, তয়েল ক্লথ এবং দুধ-ভর্ত্তি একটি ফিডিং বোতল। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে রেণুকে পাশে নিয়ে ঘুম পাড়াতাম। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙলে বোতলের দুধ খেতে দিতাম। তারপর সে তার আধো আধো বুলিতে কত কী বলে যেত। মুখের মিষ্টি হাসিতে আমার প্রাণ কেড়ে নিত; থপ্ থপিয়ে হেঁটে আমার ঘরে ও বারান্দায় ঘুরে বেড়াত। আমিও শিশু বনে' গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। অনেক সময় তাকে কোলে করে নিয়ে আমবাগানে ঘুরতাম। সন্ধ্যাবেলা বাদল এসে তাকে নিয়ে যেত।

এই রুক্ষ জীবনে এমন একটা বাৎসল্য রসের পরিবেশ রচনা হবে, ইহা কে জানত? সহানুভূতিহীন থানার জিম্মায় থেকেও আমার দিনগুলি তাই ভালই কাটছিল।

এই সময়কার একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমার কুটিরের সামনে সামান্য একটু জায়গা ঘাসে আবৃত ছিল। বিকাল বেলা সেখানে বসে আছি। রেণু তার ছোট্ট পা' দুটি থপ্ থপ্ করে ফেলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। আর মাঝে মাঝে কলহাস্যে খুশীর বন্যা ছড়িয়ে আমার পিঠে এসে আছড়ে পড়ে সদ্য-উঠা মুক্তোর মতন গুটি কয়েক দাঁত দিয়ে বৃথা কামড়াবার চেষ্টা করছে। আমার কাছেই বসে আছেন সেখ নায়েবুল্লা। নায়েবুল্লা সাহেব আমার কুটির ও তৎসংলগ্ন বাঁশবাগানের মালিক। অর্থের বিনিময়ে গভর্ণমেন্ট তাঁর জায়গায় 'ডেটিনিউ' রাখবার ব্যবস্থা করেছে। নায়েবুল্লা মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে গল্প গুজব করেন। সেদিনও তাই হচ্ছিল। কিছুক্ষণ ধরে দূর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। প্রথম দিকে ততটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ক্রমে শব্দটা তীক্ষ্ণতর এবং অত্যন্ত করুণ মনে হলো। নায়েবুল্লা সাহেবকে বল্লাম, "একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।"

"দাঁড়ান, দেখছি—" বলে নায়েবুল্লা উঠে গেলেন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, দূরে যেখানে ঘন আমের বন, তার তলায় একদল ছোট

ছেলে কাঠি দিয়ে আমপাতাগুলি সরাচ্ছে আর কাছেই দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট মেয়ে করুণ সুরে কাঁদছে। নায়েবুল্লা সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। ওদের কাছে জানলাম। এই মেয়েটি এক ভিখারিনীর মেয়ে। মা ও মেয়ে একটি কুড়েঘরে থাকে। সারাদিন ভিক্ষা করে যা' পায়, তা'ই দিয়ে সন্ধ্যাবেলা রান্না করে কোন রকমে উদরপূর্ত্তি করে। আজ ভিক্ষা করে এসে মা মেয়েকে একটি পয়সা দিয়ে দোকান থেকে এক পয়সার সরষের তেল কিনে আনতে পাঠিয়েছে। মেয়ে পয়সাটি ও একটি ছোট্ট শিশি নিয়ে দোকানে যাচ্ছিল। রাস্তায় এই ছেলেদের আমতলায় খেলতে দেখে একটু দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে পয়সাটি পড়ে হারিয়ে যায়। সেই পয়সা খুঁজতেই ছেলের দল গাছতলার আমপাতা সরাচ্ছিল। ছেলেদের কারো মতে পয়সাটি কেউ পেয়েছে, কিন্তু বলছে না। মেয়েটি যখন বুঝলো যে, তার পয়সা আর পাওয়া যাবে না। তখনই এই করুণ কান্না।

সব শুনে আমি মেয়েটিকে বললাম, "তোর একটা পয়সা হারিয়েছে ত ? এই নে, তুই চারটে পয়সা নিয়ে যা।"

সবার নিকট-ই এটা অপ্রত্যাশিত ছিল। মেয়েটি কান্না ভুলে পয়সা নিয়ে চলে গেল। ছেলের দল-ও অবাক হয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়লো। মেয়েটিকে আমি যখন পয়সা দেই, নায়েবুল্লা তখন তাকে বলেছিলেন—"যা, পয়সা হারিয়ে তোর ত ভালই হলো। একটার বদলে চারটে পয়সা পেলি।"

পরদিন সন্ধ্যেবেলা, রেণুকে বাড়ী নিয়ে যাবার পর, আমি একটু রাস্তায় বেরিয়েছি, দূর থেকে দেখতে পেলাম, সেই মেয়েটি আসছে। তার সঙ্গে একটি দীনবসনা, কৃশকায়া বয়স্কা মহিলা। বুঝতে পারলাম, ও'র মা। আমাকে অতিক্রম করে যাবার সময়, দু'জনেই এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো, যা' আজও ভুলতে পারি না। এক অব্যক্ত প্রশান্তিতে আমার মন ভরে গেল।

ভুপচাঁচিয়ায় এসে সরকারের সঙ্গে একটা সংঘর্ষে নামতে হয়েছিল ; আর তা'তে জয়লাভও করেছিলাম। ঘটনাটা এখানে বিবৃত করছি।

জেলার 'আই, বি'-র কর্ত্তা (ডি, আই, ও) বিভূতি সাহার নিকট জানতে পারলাম, সরকার আমার মাসোহারা কমিয়ে দিয়েছে। আগে আমাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা করে দেওয়া হ'তো, এখন থেকে ত্রিশ টাকা করে দেওয়া হবে। কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "কারণ অনুমান করতে পারি, আমি-ও সঠিক জানি না। বোধ হয়, আপনি আগে যেখানে ছিলেন, সেখানে পার্টি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু টাকা

দিয়েছেন। সেণ্ট্র্যাল 'আই, বি' সেটা পরে জানতে পেরেছে।"

বললাম, "এই ত্রিশ টাকা এলাওয়েন্স আমি প্রত্যাখ্যান করবো এবং 'হাঙ্গার-স্ট্রাইক' শুরু করবো।"

বিভূতিবাবু বললেন, "যে পন্থাই অবলম্বন করুন, একটু ভেবে চিন্তে করবেন। 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' জেলের মত জায়গায়—যেখানে অনেক 'ডেটিনিউ' একসঙ্গে থাকেন, সেখানে—সফল হতে পারে। এ'র সফলতার দরুণ বাইরে আন্দোলন-ও দরকার। এই সুদূর পল্লীতে আপনি একা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবেন, বাইরের কেউ জানবে না—এ অবস্থায় গভর্ণমেন্ট নতি স্বীকার করবে বলে মনে করেন কি ?"

ভেবে দেখলাম, কথাটা নেহাৎ উড়িয়ে দেবার মত নয়। অনেক চিন্তার পর দ্বিতীয় এক পন্থা স্থির করলাম। থানা থেকে যেদিন মাসিক ভাতা ত্রিশ টাকা দেওয়া হলো, আমি গ্রহণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টকে চিঠি দিলাম যে, আমার ভাতা কমিয়ে যে টাকা আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা' দ্বারা এক মাসের খরচ চালান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায়, যে কয়দিন সম্ভব, এই টাকা দ্বারা আমি চালাবো। টাকা ফুরিয়ে গেলে নিম্নলিখিত বিকল্পের যে কোন একটিকে আমার অবলম্বন করতে হবে।

(১) স্থানীয় দোকান থেকে ধারে জিনিস-পত্র নেওয়া এবং পরে সে ধার পরিশোধের অক্ষমতা জ্ঞাপন করা।

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আমার আসবাব-পত্র ও বাসন-কোষণ বিক্রয় করা।

(৩) অনশনে থাকা।

পত্র পাওয়া মাত্র গভর্ণমেন্ট থেকে থানায় নির্দ্দেশ এলো—'ডেটিনিউ' যেন কোন দোকান থেকে ধারে জিনিস পত্র কিনতে না পারে কিংবা তার আসবাব-পত্রও যেন কোথাও বিক্রী করতে না পারে। এ বিষয়ে যেন উপযুক্ত নজর রাখা হয়।

মাসের কুড়ি দিন যাওয়ার পর একুশ দিনের দিন থেকে আমি অনশন শুরু করলাম। থানা থেকে যথারীতি সদরে খবর গেল। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটে এলেন। তিনি আমাকে অনেক বুঝালেন, 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' ভাঙ্‌তে। আমি বললাম, "আপনি ভুল করছেন। আমি ত হাঙ্গার স্ট্রাইক করিনি। আমার খাবার পয়সা নেই, তাই অনশনে আছি।"

তিনি বললেন, "আমি টাকা দিচ্ছি।"

"এ টাকা আমি নেব কেন? গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা বিচারে আটকিয়ে রেখেছে। আমার জীবন-ধারণের সমস্ত খরচ-নির্ব্বাহের দায়িত্ব তার। মাসে ত্রিশ টাকা ভাতা যে এ'র জন্য অপ্রচুর, তা' তার পূব নির্দিষ্ট ৪৫ টাকা মঞ্জুরীতেই প্রমাণিত। এ অবস্থায় আমার খরচ চালাবার উপযুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে, এ'র ও'র কাছ থেকে ভিক্ষার ধন নিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করবো কেন?"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুত্তর রইলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন।

'ডি, আই, ও' বিভূতি সাহা সদর ছেড়ে এখানকার ডাক বাংলোতে এসে বাসা নিলেন। আমার উপর সর্ব্বক্ষণ নজর রাখা, যাতে কোন বিপদ আপদ না ঘটে এবং অনবরত উপরে রিপোর্ট পাঠান তাঁর কর্তব্য। তিনি আমার অবলম্বিত পন্থাকে ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন জানালেন। বললেন, "গভর্ণমেন্ট বেশ বে-কায়দায় পড়েছে।"

বোধহয় পঞ্চম দিন। কলকাতা থেকে 'সেন্ট্র্যাল আই, বি'-র লোক এসে হাজির। একেবারে সোজা আমার কুড়ে ঘরে। সঙ্গে লটবহর সমেত দুইজন 'গার্ড'। যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম, যতদূর মনে হচ্ছে, অক্ষয় দত্ত। ইন্‌স্পেক্টর অথবা ডি, এস্, পি-র‍্যাঙ্কের। ইনি পূর্ব্বেও সাগরদীঘিতে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। খুব মোলায়েম আত্মীয়-সুলভ ব্যবহার করে আমাকে 'তুমি' বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন।

তিনি এসেই আমার প্রতি দরদে উথলে উঠে, আমার মাথায় শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন। তারপর 'আই, বি'-র বড় কর্তাদের একচোট গালমন্দ করে বললেন,—

"এই ভাতা কমানোর ব্যাপারে আমরা সবাই বিরোধী ছিলাম। নলিনী মজুমদার* ত' খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু, ব্যাটা সাহেবেরা কিছুই বোঝে না অথচ মাথার উপর বসে আছে। এই ওপরালা সাহেবদের নির্দেশেই এ'টা হয়েছে। ত্রিশ টাকায় যে একজনের চলতে পারে না, এ'ত সবাই বুঝে"—বলতে বলতেই আমার বালিশের তলায় কী গুঁজে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ কী রাখলেন?"

"টাকা।"

"টাকা? আমি এ টাকা নেব কেন? ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। আপনার টাকাই বা নেব কেন?"

"শোন ভাই, এ আমার টাকা নয়। আমি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রেরিত হয়েছি,

---

* রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার 'সেন্ট্র্যাল আই, বি'র একজন বনাম-খ্যাত বড় কর্তা।

যে-টাকা তোমাকে কম দেওয়া হয়েছে, সেটা পূরিয়ে দিয়ে তোমার অনশন ভাঙাতে। তুমি হাঙ্গার-স্ট্রাইক করনি, টাকার অভাবে খেতে পাচ্ছনা। গভর্ণমেন্টের 'ডিসিশন' তোমার 'এলাওয়েন্স' পূর্ব্ববৎ-ই পঁয়তাল্লিশ টাকা থাকবে এবং এ মাসের কম টাকা পূরিয়ে দিতে হবে। তার উপর অনশন বাবদ শরীরের ক্ষতি পূরণার্থ কিছু ভাল খাবার দাবারের জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা গভর্ণমেন্ট আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই টাকাটাই আমি দিচ্ছি।

"এবার ওঠ, বৃদ্ধের কথাটা শোন। আমি সঙ্গে করে কমলালেবু, আঙুর এসব নিয়ে এসেছি। এইবার ফলের রস খেয়ে নাও। আমার লোক বাজার করতে গিয়েছে। এখানেই রান্না হবে। দুজনে একসঙ্গে খাবো।"

আমি বললাম, "আমাকে ভাবতে দিন। আর খেতে হয়, আজ নয়, কাল থেকে খাবো।"

"আরে না, না। তোমার এতে ভাবনার কী আছে? গভর্ণমেন্ট তার ভুল বুঝতে পেরে তা' শুধরে নিচ্ছে। অতএব তোমারও আর কোন ওজর থাকছে না। শুধু অনশনের জন্যই ত আর তুমি অনশন করনি।"

ইতিমধ্যে কমলালেবুর রস তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ওঁর গার্ড যখন এনে তা' হাতে দিল, তখন প্রত্যাখান করার কোন কারণ পেলাম না।

দুপুর বেলা আমার কুটিরের বারান্দায় বসে দুজনের আহার হলো। ওঁর সঙ্গের লোকেই রান্নাবান্না করেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উনি চলে গেলেন। আধা ভর্ত্তি একঝুড়ি ফল আমার জন্য রযে গেল।

'ডি, আই, ও,' বিভূতিবাবু ও এসে আমার অনশন পর্বের সমাপ্তি ঘটায় আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আমার অনশনের কয়দিন কিছু কিছু লোক—বেশীর ভাগই মেয়ে—এসে আমার কুটিরের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতো। ওরা ওখানকারই বাসিন্দা; গরীব মুসলমান; কৃষক শ্রেণীর লোক। তাদের নীরব সহানুভূতি ও স্নেহের স্পর্শে আমি উজ্জীবিত থাকতাম।

বোধহয় অনশনের দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরে—লোকজন তখনও বড় ঘুম থেকে উঠেনি—আমার ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে উঠলাম। দেখি, সায়েবুল্লা সাহেবের বৃদ্ধা মাতা এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, "বাবা, এটা খেয়ে ফেল, কেউ জানবে না। আর এ'ত দুধ।"

অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর স্নেহের দান আমি প্রত্যাখান করলাম। এটা যে লুকোচুরির ব্যাপার নয়, একটা নীতি ও আদর্শের ব্যাপার, তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। দুঃখিত চিত্তে তিনি দুধ নিয়ে ফিরে গেলেন।

এ কয়টা দিন রেণুকে দেখিনি। প্রাণটা স্বভাবতঃই পিপাসিত ছিল। রেণু-ও বোধহয় ছট্‌ফট্‌ করছিল। 'আই, বি'-র লোকজন সব চলে গিয়েছে। সুযোগ বুঝেই সন্ধ্যের দিকে বাদল রেণুকে নিয়ে এলো। তাকে বুকে ধরে শান্তি পেলাম।

দুপচাঁচিয়ায় খুব বেশী দিন থাকিনি। বোধহয়, ছ'মাস-ও হবে না। এই সময়ের ভিতর ধনী, গরীব; ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—অনেকেরই স্নেহের স্পর্শ লাভ করেছি। এঁদের ভিতর আরেক জনের উল্লেখ না করে পারছি না।

ওখানকার জমিদার বাড়ী আমার নিষিদ্ধ এলাকায়। যে-সব কলেজের ছেলে আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসতো, জমিদারের ছেলেও ছিল তাদের অন্যতম। জমিদার বাবুর মেয়ের বিয়ে। এই উপলক্ষে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। স্থানীয় থানা থেকে শুরু করে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডি-আই-বি এবং অতঃপর উর্দ্ধতম স্থান কলকাতার সেন্ট্র্যাল আই, বি পর্য্যন্ত এই নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হলো না, অনুমতি মিললো না।

বিয়ের পরদিন সকাল বেলা দুই বামুন ঠাকুর দুইটি বেশ বড় মাটির হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে আমার কুটিরে হাজির। প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমি আর কত খাবো? যা পারি খেলাম, বাকী বিলিয়ে দিলাম।

জমিদার আমাকে চোখে-ও দেখেন নি। শুধু শুনেছেন একটি ছেলে এখানে নজরবন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাঁর মেয়ের বিয়েতে কত জাঁক-জৌলুষ হবে, কত লোক পেট পূরে চর্ব্ব্য চোষ্য খাবে—আর একটি বিদেশ বিভুঁইয়ের ছেলে কিনা একদিনের জন্য-ও একটু আনন্দ ভোগ করতে পারবে না? এই আভিজাত্য মিশ্রিত করুণার ভাব থেকেই হয়ত, তিনি আমার জন্য সরকারের দরবারে এতটা হানাহানি করেছিলেন। কিন্তু, একটু স্নেহের ছোঁয়া-ও যে আমি তাতে পেয়েছিলাম তা' অস্বীকার করি কী করে?

আমার যাবার দিন এলো। ফরিদপুর জেলায় বদলি। ডি, আই, ও বিভূতি সাহা এসেছেন নিতে। আজ দুপুরে রেণুকে আমার কাছে পাঠান হয়নি। আমার বিছানাপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। তিনটে সাড়ে তিনটের টম্‌টম্‌ গাড়ী এলো

আমাকে রেলষ্টেশনে নিয়ে যেতে। জিনিস-পত্রসহ আমি ও 'ডি-আই-ও' উঠে বসেছি। শেষ দেখার জন্য রেণুকে বাদল নিয়ে এলো। উড়ে এসে সে আমার কোলে পড়লো। কিছুক্ষণ আদর করলাম। গাড়ী এবার ছাড়বে। বাদলের নিকট তাকে দিতে গেলাম। কিন্তু, সে কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। গলা জড়িয়ে ধরলো। অবশেষে জোর করেই বাদল তাকে ছিনিয়ে নিল। আর সে কী মর্ম্মভেদী চীৎকার আর হাত-পা ছোঁড়া।

গাড়ী চললো। পিছনের করুণ কান্না শুনতে শুনতে আমার-ও চুপচাঁচিয়া পর্ব্ব শেষ হলো। "ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়, তবু যেতে হবে, হায়।"



প্রতুল গাঙ্গুলি
বা
সমাজবাদে উত্তরণ

প্রায় চার বৎসর অন্তরীণাবদ্ধ থাকার পর ইং ১৯২৮-এর শেষভাগে মুক্তি পেলাম। অন্তরীনে থাকাকালীনও বাইরের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ রক্ষিত ছিল। তাই. বাইরের খবর এবং পার্টির (অনুশীলন) আভ্যন্তরীন খবর সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল ছিলাম। শুনেছিলাম, রাশিয়া থেকে গোপেন চক্রবর্ত্তী ফিরে এসেছেন। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে যাঁরা একটা সফল বিপ্লব সাধন করেছেন, সেই বলশেভিক দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং সেই দলের বিস্তৃত কর্ম্মপদ্ধতি জেনে আসার জন্য গোপেনবাবুকে ১৯২২ সালে রাশিয়ায় পাঠান হয়।

তখনকার দিনে এইভাবে বিদেশে যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। একটি বিদেশী মালবাহী জাহাজের খালাসী হয়ে গোপেনবাবু দেশ ছেড়েছিলেন। ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন দেশের সমস্ত আগমন-নির্গমনের পথে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তাদের নজর এড়িয়ে গোপেনবাবুকে উক্ত জাহাজে খালাসীরূপে ঢুকতে হয়েছিল। তারপর পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন বন্দরে মাল উঠান-নামানর কাজ সেরে উক্ত জাহাজ যখন রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে ভিড়লো, তখন প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা—সেও কম কষ্টসাধ্য ছিল না। 'কোমারভ্' নামে একজন বলশেভিকের সহায়তায় গোপেনবাবু এই কাজে সফল হয়েছিলেন। এই কোমারভ পরে একজন ভারত-বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক বলে সুপরিচিত হন।

যাই হোক, কয়েকবছর পর সেখান থেকে বলশেভিক পার্টির কর্ম-পদ্ধতি নিয়ে গোপেনবাবু যখন দেশে ফিরে এসে নেতাদের নিকট তা' পেশ করলেন, তখন ঐ পদ্ধতি ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করা নিয়ে দলে দ্বিমত দেখা দিল। সাধারণ কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই ঐ কার্য্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু নেতারা সকলে ইহাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে সমর্থন জানাতে পারলেন না। দলের ভিতর এই নিয়ে বহু আলোচনা, বহু

বিতণ্ডা, বহুদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। বলশেভিকদের অর্থনীতি বা রাজনীতিক কর্ম্ম-ধারাতে নেতাদের আপত্তির কিছুই ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ালো তাদের দার্শনিক মতবাদ। ধর্ম্ম বা ভগবান বলে যেখানে কিছু নেই, সেখানে নৈতিক ভিত্তি-ও কিছু থাকতে পারে না। ধর্ম্ম ও নীতিহীন কোন আন্দোলনের সহিত অনুশীলন সমিতি নিজেকে কখনও জড়াতে পারে না। এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অনুশীলন পার্টির তদানীন্তন নেতা নরেন সেন। নরেন সেন ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী, ধর্ম্মগত প্রাণ। এবং প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পরই তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন।

নেতাদের এই ফতোয়ার উপর দলে ভাঙ্গন এলো। সাধারণ যুবক কর্ম্মীদের অনেকেই নেতাদের রাশ ছিন্ন করে 'রিভোল্ট গ্রুপ' গঠন করলেন ; আর কিছু কিছু কর্ম্মী সরাসরি ভারতের নবজাত কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে নিজেদের ভিড়িয়ে দিলেন।

এ সবই আমি শুনেছিলাম, আমার অন্তরীন স্থানে বসে, ধরনী গোস্বামীর মুখে। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘিতে তখন আমি আবদ্ধ। অনুশীলন সমিতির যেসব অল্প সংখ্যক কর্ম্মী সে সময় পার্টির মায়া কাটিয়ে সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিষ্ট সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন, ধরনীবাবু ও গোপেনবাবু ছিলেন তাদের পুরোধা। অন্তরীন থেকে মুক্ত হয়ে আমিও তাঁদের অনুগামী হবো, ধরনীবাবুকে একথা সেদিন বেশ জোরের সঙ্গেই আমি জানিযে দিয়েছিলাম।

তাই মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবো—এই নিয়ে একটু সমস্যার পড়লাম। কম্যুনিষ্টদের কর্ম্মকেন্দ্র ইউরোপীয়ান্ এসাইলাম লেনে। সেখানে গিয়েই আমার উঠবার কথা। কিন্তু যাদের সঙ্গে বলা চলে নাড়ীর সম্বন্ধ, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে যাদের সঙ্গে একসাথে এতদিন চলেছি, হঠাৎ তাদের কিছু না জানিয়েই ছেড়ে চলে যাবো—মন এতেও সায় দিচ্ছিল না। কী নীতির উপর দলে ভাঙ্গন এলো, সাক্ষাৎভাবে আমি তা' জ্ঞাত নই। তারপর, গোপেনবাবু-আনীত কর্ম্মধারার উপর পার্টিতে যখন বিতর্ক চলে, তখন বহু দায়িত্বশীল কর্ম্মী ও নেতা ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দী। কাজেই তাঁরা কেউ উহাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। সমস্ত ব্যাপারটা তাই পুনরায় আলোচনার যোগ্য বলে আমার মনে হলো। বিশেষ করে প্রতুলদা'র উপর আমার খুব ভরসা ছিল। কারণ, জানতাম, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রতুল গাঙ্গুলির আগ্রহাতিশয্যেই অনুশীলন সমিতি অনেকদিন থেকে প্রয়াসী ছিল। এ ব্যাপারে এম, এন, রায়ের (তখনও তৃতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন নি) দূত হিসাবে আগত নলিনী দাসগুপ্ত কিছুদিন এসে ঢাকায় অনুশীলনের

আশ্রয়ে ছিলেন। গোপেন চক্রবর্ত্তীকে রাশিয়ায় পাঠানোর মূলেও ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী। কিন্তু, গোপেনবাবু যখন ফিরে এলেন, প্রতুলদা' তখন কারাভ্যন্তরে।*

অনুশীলনের নেতাদের ভিতর প্রতুল গাঙ্গুলীকে আমরা তখন প্রগতির প্রতীক বলে মনে করতাম। মনে পড়ে ১৯২০-২১ সালের কথা। হোষ্টেলে থেকে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন-ও স্থাপিত হয়নি। জগন্নাথ কলেজ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। গোলাম তৈরীর কারখানা স্কুল, কলেজ ছেড়ে আসার জন্য তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন। **Education may wait, but Swaraj cannot**—তাঁর বাণী। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'গোলামীর ফার্মান' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মোহ ঘৃণাভরে ত্যাগ করে কলেজ ছেড়েছি। একবছরে স্বরাজ! কী উন্মাদনা তখন আমাদের! কংগ্রেসের সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে কোন একটি স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে থাকি। ঐ সময়েই দলের নেতারা, যাঁরা প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ ছিলেন, রাজকীয় ঘোষণায় মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছেন। বহুদিন দলের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার পর আবার সংযোগ লাভ করলাম।

মাঝে মাঝেই প্রতুলদার বাসায় যেতাম। রুশ দেশে যে একটা সফল বিপ্লব সাধিত হয়েছে, সেখানকার অসীম শক্তিশালী 'জার' যে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন, এবং দেশে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এ সমস্ত খবর ঐ সময়েই সর্ব্বপ্রথম প্রতুলদা'র কাছে জানতে পারি। সে সময়ে খবরের কাগজ মারফৎ ইংরেজের পদানত আমাদের দেশে ঐ সমস্ত খবর জানবার সুযোগ ছিল না। রুশ বিপ্লবের খবর শুনে নিজের অজান্তেই মনে প্রশ্ন জাগতো—আমরাও কবে অত্যাচারী বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে

---

* এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতার সন্ধানে" নামক পুস্তক থেকে একটি অর্থবহ উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"গোপেন চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিবার পর কিন্তু অনুশীলন নেতাদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর পান নাই। এবং ধীরে ধীরে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।***

দীর্ঘদিন পরে কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পর আমি প্রতুল গাঙ্গুলীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে তিনি আমাদের লক্ষ্য (আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন—লেখক) পূরণের ব্যাপারে এই সুত্রটি কাজে লাগান নাই কেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, "তাঁহার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু দলের এমন একটি নেতৃত্বের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে তাহা করা সম্ভব হয় নাই।"

পৃষ্ঠা—১৯১

দেশকে স্বাধীন করতে পারবো , এ ব্যাপারে কি আমরা রুশীয় বিপ্লবীদের সাহায্য পেতে পারি না ?

ঐ সময়েরই আরেকটা ঘটনা। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশন (১৯২১)। বিপিন পাল গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন না করায় অপদস্থ হয়েছেন। আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন—'আমি এদের শুনিয়েছিলাম, বিচার-বিবেচনাসম্মত বাক্য (logic), কিন্তু এরা চায় ম্যাজিক (অর্থাৎ এক বছরে স্বরাজ-লাভ—লেখক)। বরিশালের শরৎ ঘোষ তাঁর বাগ্মিতা-পূর্ণ অধ্যাত্মবাদ মিশ্রিত ভাষণে অপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা পেলেন। স্বয়ং সি, আর, দাশ তাঁর গলায় মাল্যদান করলেন। অধিবেশনান্তে প্রত্যহই আমাদের পার্টির নেতারা আমাদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে বসতেন। সেদিন ঐরূপ বৈঠকে আলোচনাকালে প্রতুলদা' জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিপিন পালের বক্তৃতা কেমন লাগলো ?' নিজেই উত্তর দিয়ে চললেন—"হুয়াইট বুরোক্র্যাসির স্থানে আমরা ব্রাউন বুরোক্র্যাসি চাই না ; ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশীয় বেনেদের সে আসনে বসাবো—এজন্যে আমাদের আন্দোলন নয়'—বিপিন পালের এই কথাগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য। বিপিন পাল বলেছিলেন—'ব্রিটিশ পণ্যবর্জন বাংলাকে গুজরাটের শিখাতে হবে না। বাংলা ১৯০৫ সালেই বিদেশী পণ্যবর্জন করেছিল ; আর তার সুযোগ নিয়ে বোম্বাই ও আহমদাবাদের মিল-মালিকেরা নিজেদের মোটা তহবিল আরো মোটা করেছিল। স্বদেশী শোষণ বিদেশী শোষণের চেয়ে সুখকর নয়'—এই কথাগুলি কি খাঁটি সত্য নয় ?"

একটু থেমে প্রতুলদা' বলেছিলেন, 'দেখ, দেশ স্বরাজ পেলেও আমাদের জেলখাটা কিন্তু ফুরাবে না। ইংরেজকে তাড়াতে আমরা সর্ব্বাগ্রে যাবো, কিন্তু দেশীয় ধনিকদের শোষণ-ও বরদাস্ত করবো না।' এই শেষোক্ত কথাগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

বিপ্লবের রূপ সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেছিলেন, বিপ্লবের কোন শেষ নেই। 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র বাণী নিয়ে ফরাসী বিপ্লব সাধিত হলো। কিন্তু এই মহান আদর্শ কি আজ ফরাসী দেশে ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে না ? আজকের রুশ-বিপ্লব মানব-জাতির সামনে এক উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা তুলে ধরেছে। কিন্তু কে জানে যে এই আলো একদিন ম্লান হবে না ? যদি তাই হয়, তবে আবার বিপ্লব হবে। এইভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিপ্লবের গতি বহমান থাকবে, যতদিন না মানুষ মানুষ হিসাবে তার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।' বিপ্লবের এই সুদূর-প্রসারী রূপ সম্বন্ধে তাঁর কাছেই এই প্রথম একটা ধারণা লাভ করেছিলাম।

ট্রেনে সমস্তটা রাস্তাই মনে মনে এইসব কত কথা পর্য্যালোচনা করলাম। অবশেষে শিয়ালদা' ষ্টেশনে এসে যখন নামলাম আর কোন ইতস্ততঃ না করে অনুশীলন সমিতির তদানীন্তন আস্তানা ১৬৪ নং বউবাজার ষ্ট্রীটে গিয়েই উঠলাম। 'বসুমতী' আফিস সংলগ্ন বাড়ী। দোতলায় একটি মেস। কয়েকজন চাকুরে থাকেন, আর থাকেন অনুশীলনের অন্যতম নেতা কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত। নামের সঙ্গে প্রকৃতির যথেষ্ট মিল। নিজের খাওয়া পরার কোন ঠিক নেই। অর্দ্ধ ময়লা মোটা কাপড় পরণে, সেইরূপই জীর্ণ জামা, ছেঁড়া চটি জুতা। চির রুগ্ন। কতদিন অন্তর দাড়ি কামাতেন জানি না। তবে শ্মশ্রু-বিরল রুগ্ন মুখমণ্ডলে কয়েক ইঞ্চি কেশগুচ্ছ প্রায় সর্ব্বদাই বিরাজ করতো। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর কোনদিন বড় সম্পর্ক ঘটতো না। এই আত্ম-ভোলা লোকটি তুলার ব্যবসায়ে রোজগার করতেন যথেষ্ট। কিন্তু সব ব্যয় হতো পার্টির জন্য। বেশ কয়েকজন দলীয় 'গেষ্ট' তাঁর ওখানে প্রায় সর্ব্বদাই থাকতেন। আমিও গিয়ে সেখানেই উঠলাম। বহুদিন পর সহকর্ম্মী অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে বিপুল আনন্দ পেলাম।

সেই দিনই কি তারপর দিন ১নং ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে গেলাম। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক দলের (**Workers and Peasants Party of India**) তখন অফিস ছিল ওখানে। ঐ দলের মুখপত্র 'গণবাণী'-ও ওখান থেকেই বের হতো। মুজফ্‌ফর আহম্মদ, আব্দুল হালিম, ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি ওখানেই থাকতেন। আর থাকতেন বৃটিশ শ্রমিক দলের একজন সদস্য-ফিলিপ্ স্প্র্যাট্। ঐ দলের 'লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট' থেকে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান—বাহ্যতঃ এই কাজ নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। তবে প্রকৃত পক্ষে মনে হয়, তিনি ও ব্র্যাড্‌লে ঐ সময় এদেশে এসেছিলেন ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সংগঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে। ব্র্যাড্‌লে তাঁর কর্ম্মস্থান করে নিলেন বোম্বেকে, আর স্প্র্যাট্ রইলেন কলকাতায়।

যখন আমি ওখানে পৌঁছালাম, মুজফ্‌ফর আহম্মদ তখন আফিসে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট ধরণী গোস্বামীর খোঁজ করাতে তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শুনে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করে বললেন যে, ধরণীবাবু সেখানে নেই; কার্য্যোপলক্ষে দু'তিন দিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন। তবে সেজন্য আমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি যে আসবো তাঁরা তা' জানতেন এবং ওখানে আমার থাকবার ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন।

একটু সঙ্কোচ মিশ্রিত স্বরেই আমি জানালাম যে, আপাততঃ আমি অনুশীলন সমিতির আস্তানায়ই উঠেছি, তবে ওঁদের ওখানে হামেশাই যাতায়াত করবো। মুজফ্‌ফর

সাহেব যে বেশ একটু হতাশ হলেন, তা' তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। ঐ মুহূর্ত্তে আমার সম্বন্ধে তিনি কী ধারণা করে নিলেন, তা' ও অনুমান করলাম। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়াযে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' আমার অবস্থা বাস্তবিকই তখন ঐ প্রকার। আর তা' হওয়া-ও বিচিত্র কিছু নয়। কৈশোরের রঙীন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যার আশ্রয়ে এসেছিলাম, যার কঠোর শৃঙ্খলা ও সংযমের পরিবেশের ভিতর এমন একটা আনন্দময় পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল, যে-বন্ধনের নিকট জন্মগত পারিবারের বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, তাকে এক কথায় ছিন্ন করা খুব সহজ সাধ্য নয়।

আমার কাহিনীতে আসা যাক্।

বৌবাজারের মেসে কেদারবাবুর কাছেই আছি। দোতলার উপর একখানা বেশ প্রশস্ত কক্ষ। অনুশীলনের নেতারা অনেকেই সেখানে প্রায়ই মিলিত হন। রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, জ্ঞান মজুমদার, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ), রমেশ চৌধুরী, আশু কাহিলী প্রভৃতি। নরেন সেনকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বোধহয়, তিনি ইতিমধ্যেই সন্ন্যাস নিয়েছেন। প্রতুল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি 'রিভোল্ট গ্রুপে'র দু' একজনও মাঝে মাঝে আসতেন।

নেতারা তখন দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে পুনরায় দলের ভিতর দৃঢভাবে আকৃষ্ট করার জন্য সচেষ্ট। পুরানো নেতাদের বিরুদ্ধে 'রিভোল্ট গ্রুপে'র প্রধান অভিযোগ ছিল, যে নেতারা এখন অতিরিক্ত সতর্কতা-বাদী হয়ে পড়েছেন; কোন সাহসিক কার্য্য-ক্রম গ্রহণ করা তাঁদের প্রোগ্রামে নেই। এই অভিযোগ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন তফাৎ যে এদের মত-পার্থক্যের মূলে ছিল, তা' মনে হলো না। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যে বিদ্রোহী-গোষ্ঠীর সকলে গ্রহণ করেছিলেন, তার কোন পরিচয় পাইনি। আর এই জন্যই উভয় দলের পার্থক্য মিটাতে পরবর্ত্তীকালে নেতারা মোটামুটি সফল হয়েছিলেন। *

---

* একটা কথা এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, মনে হয়। সমাজবাদী চেতনা বা Scientific Socialism সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা সে-সময় শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতাদের অনেকের ভিতর-ও যে খুব উন্মেষ লাভ করেছিল, তা' বলা চলে না। অবশ্য সে-চেতনা লাভের সুযোগ-ও সে-সময় খুবই কম ছিল। প্রথমতঃ পুস্তকের অভাব, দ্বিতীয়তঃ অবসরের অভাব। এ হিসাবে কারাগারকেই শিক্ষাগার বলা চলে। কারাভ্যন্তরে বা বন্দীশালায় অবসরের অভাব নেই। কর্ত্তৃপক্ষের 'সেন্সর-শিপ' চালু থাকা সত্ত্বে-ও বই পত্র যোগাড় করা খুব অসাধ্য ছিল না। তাই, অন্যেরা ত' বটেই, বাইরে যাঁরা কম্যুনিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন, এবং শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন তাঁদের-ও অনেকেই কম্যুনিজম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন, পরবর্ত্তীকালে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

যাইহোক, বউবাজারের সেই মেসে অনুশীলনের নেতাদের সকলের কাছেই আমি আমার কথা পাড়লাম। তাঁদের বিশেষ কিছুই বোঝাতে হয় না। শ্রমিক কৃষককে সঙ্গে না নিলে, শুধু যে মধ্যবিত্তের দ্বারা বিপ্লব সম্ভব নয়, বিপ্লবকে সফল করতে হলে আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের সহায় ও সহানুভূতি যে প্রয়োজন, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব যে সর্ব্বদেশের বিপ্লবীদের সম্মুখে এক আলোক-বর্ত্তিকা-এসব ত' প্রশ্নাতীত। কিন্তু—তবু-ও-একটা 'কিন্তু' আছে এবং এ বড় প্রকাণ্ড 'কিন্তু'। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো—এখানে কম্যুনিষ্ট নামধারী যাঁরা আছেন, তাঁদের কি সত্যই আন্তরিকতা ও সততা আছে? কোন ঐতিহ্য নেই, অতীতের কোন বৈপ্লবিক বা দেশ-প্রেমের নিদর্শন চরিত্রে নেই, বরং অনুসন্ধানে বিপরীতটা-ই প্রকাশ পাবে, তাঁরা কী করে বিপ্লবী হলেন রাতারাতি? কোট প্যাণ্ট পরে শ্রমিক দরদী হওয়া—এ' কি আন্তরিকতার লক্ষণ?

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পরের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে আমার আস্তানা করে নিয়েছি। সতীশ পাকড়াশীর সঙ্গে 'এন্‌গেজমেণ্ট' করে একদিন দেখা করলাম। সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারে (বর্ত্তমান নাম সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার) বসে কথাবার্ত্তা হলো। সতীশদা'কে বললাম। "আপনারা ত' বনেদী অনুশীলন দল ছেড়েছেন, সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই। তবে একটি ছোট্ট গ্রুপ নিয়ে আলাদা রয়েছেন কেন? এখানকার কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন না কেন?"

সতীশদা' বললেন, "দেখ, কম্যুনিজম্ ভিন্ন বিপ্লবীদের অন্য কোন আদর্শ থাকতে পারে না, সেটা আমি বুঝি। এমন কি, দেশকে স্বাধীন করতে হলেও, ঐ মতবাদে বিশ্বাস প্রয়োজন। কিন্তু, এখানকার যারা কম্যুনিষ্ট, তারা কি সখের বিপ্লবী নয়? তাদের কী ত্যাগ স্বীকারের ইতিহাস আছে, কী কষ্ট-সহিষ্ণুতার নজির আছে?"

বললাম, "আপনারা অনেক সময় বাইরের রূপ দেখে ভুল করেন। কোট প্যাণ্ট পরে বক্তৃতা দেয়, এই দেখেই মনে করেন ওরা সখের শ্রমিক দরদী। কিন্তু, ওদের-ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার, ত্যাগ-স্বীকারের যথেষ্ট নজীর আছে। বেশী কিছু বলতে চাই না; আমি এখন ওখানে থাকি। স্প্র্যাট সাহেব কীভাবে জীবন-যাপন করেন, জানেন? একজন অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক, প্রায় দিনই তাঁকে খেতে দেখি একখানা চীনা মাটির প্লেট ভর্ত্তি ভাত আর তরল ডাল। মাছ বা মাংস হয়ত কদাচিৎ মেলে। বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন ত' সবাই ওঁরা ছেড়ে এসেছেন।

কথাটা সতীশদা'র মনে লাগলো। বললেন,—"তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি একদিন প্রতুল (ভট্টাচার্য্য) ও জগদীশের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বল। আমিও থাকবো।"

আমি রাজী হলাম।

কিন্তু সেই কথা আর বলা হয়নি। কয়েকদিন পরেই জানলাম, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীতে বোমা তৈরীর ব্যাপারে ওঁদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন, কেউ বা তখন গা' ঢাকা দিয়েছেন।

আমার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্। অবশেষে অনুশীলনের নেতাদের ভিতর আলোচনা হয়ে স্থির হলো—প্রতুল গাঙ্গুলি ফিলিপ স্প্র্যাটের সঙ্গে খোলাখুলি ও বিশদ-ভাবে আলোচনা করবেন—উভয় দল একত্রে কাজ করতে পারে কি না, সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া যদি সম্ভব না-ও হয়। ধরনী গোস্বামীর মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করা হলো।

* * *

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন। পার্ক সার্কাস ময়দানে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে মনোনীত সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে হাওড়া স্টেশন থেকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অধিবেশনে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিপ্লবী দলের লোক নিয়ে গঠিত হয় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর। মিলিটারী কায়দায় এর গঠন ও শিক্ষণ হয়েছিল। সর্ব্বাধিনায়ক (G.O.C.) ছিলেন সুভাষ বসু। জি. ও, সি'-র অধীনে দুইজন কর্ণেল। একজন রবি সেন (অনুশীলন) ও অন্যজন পূর্ণ দাস (মাদারীপুর—যুগান্তর) প্রতুল ভট্টাচার্য্য, জগদীশ চ্যাটার্জি, সত্যগুপ্ত প্রভৃতি মেজর। প্রত্যহ ভলান্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ এবং মিলিটারী ব্যাণ্ডের প্রাণ-নাচানো বাদ্যে পার্কসার্কাস অঞ্চল রমরমা থাকতো। সংলগ্ন একজিবিশান গ্রাউণ্ডে প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাণ্ড সহ সুদর্শন সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ভলান্টিয়ার বাহিনীর পরিক্রমা দর্শনীয় ছিল। জে, এম্, সেনগুপ্তের পুত্র ছিলেন উক্ত অশ্বারোহীদের পুরোধা। বিভিন্ন বিপ্লবীদলের আলাদা আলাদা ক্যাম্প ছিল। 'মেডিকেল ইউনিটের'-ও একটি স্বতন্ত্র ক্যাম্প ছিল। কিছু ডাক্তার আর ডাক্তারী ছাত্রদের নিয়ে ঐ ইউনিট গঠিত হয়েছিল। একদিন কী একটা কারণে মেডিক্যাল ইউ-নিটের লোকদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে মেঃ সত্যগুপ্ত তাঁর বাহিনী নিয়ে মার্চ্চ করে এসে তাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড ও লোকদের মারধোর করলেন। মিলিটারী ট্রিবিউন্যালে সত্যগুপ্ত'র বিচার হলো। দু'দিন কি তিনদিন তাঁর নির্জন কারাবাস জাতীয় একটা দণ্ড দেওয়া হলো। এ কয়দিন একটি তাঁবুতে তিনি একাকী থাকতেন, তবে বিপ্লবী দলের নেতারা কেউ না কেউ সর্ব্বদাই তাঁকে সঙ্গ দিতেন।

কয়েকদিনের এই জমজমাট ইন্দ্রপুরীতে কিন্তু একদিন অশনিপাত হলো। প্রায়

অর্ধলক্ষ শ্রমিকের স্রোত শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের পরিচালনায় কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে হানা দিল। ধনিক-শ্রেণীভুক্ত জাতীয় নেতাদের সম্মেলনে গরীব দেশবাসীরা এলো তাদের দুর্দ্দশার কথা জানাতে এবং যাঁরা কোটি কোটি দরিদ্র দেশবাসী সহ সমস্ত ভারত-বর্ষের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন, তাঁদের জাঁক জৌলুস স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষন করতে। সারা কংগ্রেস নগরে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। লাঠি হাতে ভলান্টিয়ার বাহিনী ছুটলো— 'একবিন্দু রক্ত থাকতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না' জি, ও, সি'-র এই আদেশ বাক্য পালন করতে। প্যাণ্ডেলে ঢোকার সব গেট বন্ধ হয়ে গেল। শ্রমিকদের যে অগ্রবর্ত্তী বাহিনী মেন্ গেটের সামনে হাজির হলো দমাদম লাঠি পড়লো তাদের মাথায় মেজর প্রতুল ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে। মজুরের রক্তে কংগ্রেসের লীলাভূমি রঞ্জিত হলো। শ্রমিক নেতারা একটু রাশ টানলেন। নতুবাএই এভালান্সের (avalanche) সামনে কোথায় গুঁড়িয়ে যেত কংগ্রেস প্যাণ্ডেল, কোথায় তলিয়ে যেত ভলান্টিয়ার বাহিনী। ইতিমধ্যে ভিতর থেকে সভাপতির আদেশ এলো, 'সব গেট খুলে দাও, মজুরদের ভিতরে আসতে দাও।' সমস্যা মিটলো। প্রশস্ত প্যাণ্ডেলের ভিতর মজুরেরা ঢুকে কংগ্রেসের নেতাদের ভাষণ শুনলো। গান্ধীজির প্রতি তারা শ্রদ্ধাবান ছিল। তাঁর বাণী শুনে সুশৃঙ্খল ভাবেই প্যাণ্ডেল ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। এ সবই অতীতের ঘটনা। বিস্মৃতির তলায় নিমজ্জমান। কিন্তু সেদিনকার অপ্রতিরোধ্য জনস্রোতের তরঙ্গকে তৃণখণ্ড দিয়ে বাণের জলকে রুখবার মত হাস্যকর প্রয়াসের কথা আজও হয়ত কারো কারো মনে জেগে আছে।

* * *

এই কংগ্রেস নগরেই অনুশীলন পার্টির জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্যাম্পের একটি তাঁবুতে এক-দিন ফিলিপ্ স্প্র্যাটের সঙ্গে প্রতুল গাঙ্গুলির সাক্ষাৎ হলো। আলোচনা বিশদভাবেই হয়েছিল। কিন্তু অনেক বিষয়েই উভয়ের মতানৈক্য বহাল রইল। আমি দু'শিবির থেকেই এ খবর জানলাম। আর আমার দ্বিধা রইল না। বৌবাজার থেকে ডেরা উঠিয়ে এসাইলাম লেনে Asylum গ্রহণ করলাম। জাতীয় বিপ্লববাদের শিবির থেকে সমাজবাদের শিবিরে পূরাপূরি উত্তরণ ঘটলো।



মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কিশোরগঞ্জের "ইয়ং কমরেড্‌স্ লীগ"—(Young Comrades' League)-এর অফিস সম্পাদক ছিল মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৭/১৮ বছরের একটি ছেলে। হুসেনপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়তো। অনুশীলন সমিতির যুগ থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে আমরা যখন মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণ করে "ওয়াই, সি, এল্" (Y. C. L.) স্থাপন করি, তখন সে সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে এতে যোগ দেয়।

"ইয়ং কমরেড্‌স্ লীগের" ইতিহাস এখানে একটু বলা দরকার। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে কিংবা তার আগে থেকেই বাংলার বহু যুবক ও ছাত্র পুরাতন বিপ্লবী দলগুলির বন্ধন ছিন্ন করে নতুন সমাজবাদী ভাবধারার প্রভাবে আসতে শুরু করে দেয়। এদের অনেকেই তখনকার "শ্রমিক ও কৃষকদলের" সংশ্রবে এসে ঐ দলের নেতৃত্বাধীনে কাজ করবার আগ্রহ প্রকাশ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই যুবকদের উৎসাহ, নিষ্ঠা এবং কর্ম্মশক্তি প্রশ্নাতীত হলেও শ্রমিক আন্দোলনে এদের অনেকেরই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জন-ও রাতারাতি হওয়া সম্ভব ছিল না। এইসব কথা বিবেচনা করে এই কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন যুবকদের নিয়ে ১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে "ইয়ং কমরেড্‌স্ লীগ" নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। বলাবাহুল্য তদানীন্তন কম্যুনিষ্ট নেতাদের প্রভাবাধীনেই এই যুবসংস্থা গঠিত হয়েছিল। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন ফিলিপ্ স্প্র্যাট ও সম্পাদক ধরণী গোস্বামী। নিজ নিজ জেলায় গিয়ে কৃষকদের ভিতর শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করে তাদের সংঘবদ্ধ করার এবং ছাত্র ও যুবকদের সমাজবাদে উদ্বুদ্ধ করার কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ করার জন্য ওদের নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। এই অনুযায়ী যে যে জেলায় যাদের উপর প্রথম 'ওয়াই-সি-এল্' স্থাপিত করার ভার দেওয়া হয়, তার ভিতর এইগুলি উল্লেখযোগ্য। ঢাকায়—নলীন্দ্র সেন ; মালদহে—রামলাধব লাহিড়ী ; জ্যোতির্ম্ময় শর্মা ; খুলনা যশোহরে—বিভূতি ঘোষ ; প্রমথ ভৌমিক ; ময়মনসিংহে—সুধাংশু অধিকারী।

ময়মনসিংহের মহকুমা শহর কিশোরগঞ্জের "ইয়ং কমরেড্‌স্ লীগ" প্রথম থেকেই একটা শক্তিশালী সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রধান কারণ ওখানকার অনুশীলন পার্টির প্রায় গোটাটাই "ইয়ং কমরেড্‌স্ লীগে" যোগদান করে। কিশোরগঞ্জের "ইয়ং

কমরেড্‌স্‌ লীগ" তার বছর দুই জীবিত কালের ভিতর যা' কাজ করেছিল, তা' অন্য কোন জেলায় হতে পারেনি। তবে সে কথা এখানে বক্তব্যের বিষয় নয়। মণীন্দ্রের কথাই বলছি।

আমাদের (কিশোরগঞ্জের) ইয়ং কমরেড্‌স্‌ লীগের অফিস ঘরটি ছিল খুব বড় একটি টিনের ঘর। পূর্ব্বে এটি একটি পাটের গুদাম ছিল। নগেন সরকার বিনা ভাড়ায় এটিকে আমাদের সংস্থার দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যোগাড় করেছিলেন। প্রায় শ'খানেক লোক বসার মত জায়গা ঘরের ভিতর ছিল। এতে আমাদের ঘরোয়া মিটিং করার খুব সুবিধা হয়েছিল। চারধারের দেয়ালে মার্ক্স, লেনিন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট নেতাদের ছবি ছাড়াও ভারতের জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি টাঙ্গান' ছিল এবং নানা বিপ্লবাত্মক স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ডে দেওয়াল ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এই সুসজ্জিত ঘরে প্রায় সর্ব্বক্ষণের জন্যই থাকতো মণীন্দ্র। পার্টিশানের ওপাশে তার রান্নার ব্যবস্থা ছিল। একজন সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী থাকাতে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হয়েছিল।

স্বাভাবিক কারণেই জন্ম-লগ্ন থেকেই "ইয়ং কমরেড্‌স্‌ লীগে"র উপর আই, বি-পুলিশের শ্যেণ-দৃষ্টি ছিল। হঠাৎ এই দৃষ্টিটা যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে একসময়ে আমরা অনুভব করলাম। জেলার সদর থেকে ঘন ঘন আই, বি, অফিসাররা আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। আমাদের অফিসের উপরও ওয়াচ রাখা হচ্ছে, টের পেলাম।

এরই মধ্যে একদিন এক আশ্চর্য্য কাণ্ড! স্বয়ং জেলাশাসক এসে 'কমরেড্‌স্‌ লীগে'র অফিসে হাজির। সঙ্গে পুলিশ বা দেহরক্ষী নেই; তারা একটু দূরে রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। অফিসে তখন মণীন্দ্র আর আমাদের অন্য জনা দুই কর্ম্মী ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এসে বসলেন না; দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটি একটি করে দেশের প্রত্যেকটি নেতার ছবির নীচে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। শেষকালে এলেন, যতীন দাসের প্রতিকৃতির নিকট। মাত্র অল্পদিন আগে যতীন দাস অনশন-মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর ছবিটা একটু বিশেষ যত্ন সহকারে টাঙ্গান ছিল। জেলা কর্তা নিকটে এসে ছবির নীচে লিখিত লাইন কটা জোরে জোরে পড়লেন—

"জীবন দিয়ে জ্বাললে আগুন, পথের বাধা করলে নাশ,
আজ মরণ তোমার চরণ চুমে, ধন্য তুমি যতীন দাস।"

তারপর যেন উচ্ছসিত আবেগে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বললেন, "ধন্য, ধন্য; বাস্তবিকই তুমি ধন্য। তোমায় নমস্কার।"

অফিসে উপস্থিত যারা, তারা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ স্বয়ং জেলাশাসকের এইভাবে উপস্থিতি ; তারপর জাতীয় নেতাদের ছবির প্রতি গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধির এইভাবে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন—ব্রিটিশ রাজত্বে ইহা অকল্পনীয়।

ইতিমধ্যে অফিসের সামনের রাস্তায় লোকের ভীড় জমে গেছে। ডি: ম্যাজিস্ট্রেট্ ঘরে ঢুকছেন, নিশ্চয় একটা কিছু কাণ্ডকারখানা হবে।

যতীন দাসের ছবির কাছ থেকে সরে এসে জেলাশাসক টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। অপর পাশে মণীন্দ্র বসে ছিল। তাকে একটু সৌজন্য দেখাবারও সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলেন,

"সবই ত বুঝলাম। কিন্তু শমন যে এদিকে আপনাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কী করছেন?"

মণীন্দ্র একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বললো, "কিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না।"

"তা' বুঝবেন কেন? বড় বড় স্লোগান দিয়েই বিপ্লব করতে চাইছেন। আসল কাজের বেলায় কিছুই নয়। ঐ যে আপনাদের অফিসের ধারেই ডোবাগুলি কচুরি পানায় ভর্তি হয়ে রয়েছে, এগুলি যে, যমের বাহন তা' জানেন? ম্যালেরিয়ায় প্রতি বছর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। আর এই ম্যালেরিয়ার উৎস, কচুরী পানাকে নির্মূল করার জন্য কী করছেন? আসুন, এই গুলি তুলে উৎখাত করি।"

"আমি কেন যাবো?"—মণীন্দ্র বলে।

"ও, আপনি ভাবছেন, আমি ডি. ম্যাজিস্ট্রেট্ আপনাকে আদেশ করছি। তাই, আপনার ব্যক্তিত্বে লাগছে। আচ্ছা বেশ। আপনিই আমায় আদেশ করুন ; আপনিই নেতৃত্ব দিন। আমি নামবো. আপনি নামবেন, রাস্তার এই লোকেরা নামবে। সকলে মিলে এই শমনের দূতকে এখনই উৎখাত করবো।"

"এ আমার কাজ নয়।"

"তবে কার কাজ?"

"এ কাজ গভর্ণমেন্টের ; দেশের সুখ, স্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের। আর আপনিইত গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি।"

"আচ্ছা, বেশ! মেনে নিচ্ছি। গভর্ণমেন্ট তার কর্তব্য করছে না। তাই বলে,

আপনি [illegible] নিজের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন? মনে করুন, আপনি এক[illegible] আপনাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য একজন দেহরক্ষী আছে[illegible] একদিন রক্ষীসহ বেড়াতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় একটা সাপ আপনার সামনে এসে পড়লো। আপনাকে দেখে সে ফণা তুলেছে। রক্ষীর কর্ত্তব্য নিজের হাতের অস্ত্র দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলা। কিন্তু সে নিশ্চল হ'য়ে দাড়িয়ে রইল। আপনার হাতেও একটি লাঠি আছে; আপনার হাতের লাঠি দিয়ে সেই সাপটাকে মারবেন, না—এটা রক্ষীর কর্ত্তব্য বলে, নিষ্ক্রিয়ভাবে সাপের দংশনে প্রাণ দিবেন।"

"সাপটাকে মারবো ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীকেও বরখাস্ত করবো।"

"ওঃ, খুব কথা শিখেছেন।" —বলে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট একটু রাগতঃ ভাবেই বেরিয়ে গেলেন

দু' একদিন পরই কিশোরগঞ্জ শহরে ব্যাপক পুলিশী তল্লাসী চললো। আমরা অবশ্য প্রস্তুত ই ছিলাম। তাই, এই পুলিশী অভিযান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল।

উপরে যে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা বলা হলো, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, ইনি স্বনাম-খ্যাত গুরুসদয় দত্ত। আমার ভয় হচ্ছে, কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন, শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয়কে ব্যঙ্গ ও হেয় করার উদ্দেশ্যেই উপরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।' কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে মোটেই তা' নয়। বরং এটাই আমার লেখা থেকে প্রকাশ পাবে যে, ব্রিটিশ আমলেও এমন দু'একজন উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজপুরুষ ছিলেন, যাঁরা গুপ্ত পুলিশের উস্কানীতে অহেতুক কাউকে উত্যক্ত করতে চাইতেন না। ব্রিটিশ আমলের একজন 'আই, সি, এস, এবং ভারতের সর্ব্ববৃহৎ জেলার অধিকর্ত্তা—তাঁর পদমর্য্যাদা এবং ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কিন্তু সেই ক্ষমতা ও মর্য্যাদার মোহ তাঁর ছিল না বলেই, একাকী একটি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসের ভিতরে ঢুকে, তাঁর চেয়ে অনেক বয়ঃ কনিষ্ঠকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন এবং পাছে সেই ছেলেটির আত্মাভিমানে আঘাত লাগে, এই ভেবে নিজে তার আজ্ঞাধীনে কাজ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন।

শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের দুর্দশা দূর করার ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠার ফলে তাঁর প্রবর্ত্তিত 'ব্রতচারী' আন্দোলন আজ স্বাধীন ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে।

* * * * *

গুরুসদয় দত্ত সম্বন্ধে আরেকটি কাহিনী আমার সহকর্মী নগেন সরকারের নিকট শুনেছিলাম।

জেলা মেজিস্ট্রেট্‌ কিশোরগঞ্জে সফরে এলে রেল-ষ্টেশন সন্নিহিত ডাক-বাংলোতে অবস্থান করতেন। এই স্থানটি শহরের একটু বাইরে। সন্নিকটেই বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ। একদিন দত্ত সাহেব একাকী ঐ মাঠের ধারের রাস্তা দিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। দেখতে পেলেন, কয়েকজন কৃষক পাট-ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছে। একজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কি ভাই, তোমরা জারি গান গাইতে জান?"

"জানতাম্ না ক্যারে, কর্ত্তা?" (জানবো না কেন মশায়?)

"একটা গাও না, শুনি।"

"বেডা শখে আর আছে না। আমরা নাইল্লা ক্ষেত' বাছ দিয়াম, না-অখন তারে গান হুনাও" (লোকটার শখ ত কম নয়। আমরা পাট-ক্ষেতে নিড়ানি দিব, না-এখন তাকে গান শুনাতে হবে।)

মুচকি হেসে দত্ত সাহেব চলে গেলেন। এরপর কয়েকদিন ধরেই অনেক রাত পর্য্যন্ত ডাকবাংলার চত্বরে জারি গানের আসর বসেছিল এবং ভাল ভাল কৃষক গাইয়েরা এখানে জমায়েত হয়েছিল।

এবার 'প্রপার চ্যানেলে' (proper channel) যাওয়ার দরুণ দত্ত সাহেবের সফলতা। অর্থাৎ তিনি পুলিশকে এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছিলেন এবং পুলিশ বাছা বাছা সব কৃষক গায়ককে তাঁর কাছে এনে হাজির করেছিল।

ব্রিটিশ আমলের এই নিরভিমান আই, সি, এস্‌ রাজ পুরুষটির পাশাপাশি আমি আরেকজন জাঁদরেল আই, সি, এস্‌-এর চিত্র অঙ্কন করছি। গুরুসদয় দত্ত ও মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাক্যালাপের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমার সহকর্ম্মীদের নিকট পরে এ কাহিনী শুনেছি। কিন্তু দ্বিতীয় যে চিত্রটি অঙ্কন করছি, তা' আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত।

কিশোরগঞ্জে হাই স্কুলে তখন ক্লাস 'সেভেন' কি 'এইটে' পড়ি। ঐ সময় মহকুমা-শাসক ছিলেন এস্‌ এন্‌ রায়, আই, সি, এস্‌। সিভিল সার্ভিসে একজন নামকরা লোক। অন্যদিক দিয়েও তাঁর একটি পরিচয় ছিল। স্বনাম খ্যাতা মহিলা কবি কামিনী রায় ছিলেন তাঁর বিমাতা।

সিভিলিয়ান রায় পুরা-দস্তুর সাহেব, যদিও কৃষ্ণাঙ্গ। মুখের বুলি ইংরেজী, চালচলন, আদব কায়দা সব সাহেবী। বিকালে মাঠে টেনিসলনে খেলতে আসতেন,

সঙ্গে আরদালীর হাতে চেন-বাঁধা দুটি কুকুর থাকতো। একটি গ্রে-হাউণ্ড, একটি বুল-ডগ। একদিন কিভাবে জানি গ্রে-হাউণ্ড কুকুরটি শিকলমুক্ত হয়ে বিচরণরত একটি বাছুরের পিছন ধাওয়া করলো। দেখেত সাহেব "রাজাঃ, রাজাঃ" বলে কুকুরের নাম ধরে চেঁচিয়ে পিছনে ছুটলেন। আর ইংরেজী বুকনিতে কুকুরটাকে উদ্দেশ্য করে কী সব বলতে লাগলেন। কোন অনিষ্ট করার পূর্ব্বেই অবশ্য কুকুরটাকে ধরা হলো। আমরা বালক ছাত্রের দল, যারা প্রায় প্রত্যহই বিকালে মাঠে খেলা দেখতে যাই, বাছুরের ছোটা, পিছনে কৃশকায় লম্বা ধরণের কুকুরের দৌড, তস্য পিছনে ধাবমান কালো সাহেবের ইংরেজী বাক্য বর্ষণ—সবটাই বেশ উপভোগ করেছিলাম।

এই এস্ এন্. রায় সাহেব পদাধিকার বলে আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন! তিনি মহকুমার সমস্ত হাইস্কুলগুলির ভিতর প্রতিযোগিতামূলক একটি ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তন করেন এবং ঐ কম্পিটিশনে 'ট্রফি' হিসাবে দেয় 'শিল্ড'-টি নিজেই প্রদান করেন! কিশোরগঞ্জের 'টাউন ক্লাব' এই খেলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

এই সময়ে আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম খুব শক্তিশালী ছিল। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একসময়কার নামজাদা হাফ্ ব্যাক্ মণিভূষণ দত্তরায় (ভানু দত্ত) ঐ সময়ে আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। যে কোন কম্পিটিশনে স্কুল থেকে তিনটি টিম গঠিত হতো। 'এ' টিম ও 'বি' টিম শক্তিতে প্রায় সমান সমান ছিল। 'সি' টিম ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল।

টাউনক্লাবের ম্যানেজিং কমিটি শহরের বড বড় খেলাগুলি পরিচালনা করতো। স্কুলের ছেলেদের ধারণা ছিল, যেহেতু টাউন ক্লাব কোনদিন স্কুল-টিমের সঙ্গে খেলায় জিততে পারতো না, সেই জন্য এই কমিটি, বিশেষ করে এ'র সেক্রেটারী স্কুল টিমের প্রতি বিরূপভাব পোষণ করতেন এবং যে-কোন ছুতায় স্কুলকে হারাতে চেষ্টা করতেন। সে-বছর 'এস্, এন্, রায় শিল্ড্ কম্পিটিশনে'র খেলায় আমাদের 'এ' টিমকে প্রথমেই বিদায় নিতে হলো, এই মনোভাবের শিকার হয়ে। 'বি'-টিম এবং মফস্বলের একটি স্কুলের (বনগ্রাম হাইস্কুল) টিম ফাইন্যালে উঠেছে। প্রথম দিনের খেলা 'ড্র' হলো। দ্বিতীয় দিনের 'রি-প্লে'তে আমাদের 'বি'-টিম তিন গোলে এগিয়ে যাচ্ছিল। খেলা শেষ হওয়ার দুই তিন মিনিট আগে হঠাৎ রেফারী হুইসেল বাজিয়ে খেলা বন্ধ করে দিলেন—আলোকের স্বল্পতার অজুহাতে।

স্কুলের ছেলেরা রাগে ফেটে পডলো। কিন্তু তখনকার দিনে প্রতিবাদ-আন্দোলন বা কোন প্রকার 'ডিরেক্ট একশান্'-এর রেওয়াজ গড়ে উঠেনি। তাই নিজেদের ভিতর গুঞ্জনেই এই অসন্তোষের পরিসমাপ্তি ঘটলো। পরের নির্দ্ধারিত খেলার দিনে

(রি-প্লে) হাফ টাইমের বিরতিতে বেশ কতগুলি হাতে লেখা 'কার্টুন' বিলি হতে দেখা গেল। তার একটি গিয়ে পড়লো আমাদের বিরোধী দল বনগ্রাম হাইস্কুল টিমের ক্যাপ্টেনের হাতে। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলেরই শিক্ষক এবং গেম সেক্রেটারী।

কার্টুনটিতে দেখান হয়েছিল—একটি মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা' ছড়ি হাতে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কিন্তু শেষ রশ্মিটুকু তখনও মিলিয়ে যায়নি। একটা ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিট। আর মাঝখানে একটি 'বক্সে' এই কয়েক লাইন ছড়া—

লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে 'লেড্ডু' ভাবছে মনে মনে
একটি দিনের তরে খেলা 'ড্র' রাখি কেমনে।
এ কি জ্বালা, জিতে খেলা 'বি'-টিম বুঝি আজ,
ডো'বে না কেন সূর্য্যি বেটা, হলো এ কি কাজ ?
You referee, forget করছ **again and again,**
Stop কর না খেলাটি ভাই, **any how you can.**
বল ভাইটি, বল শুধু, **"insufficient light"**
সমস্বরে বলবো মোরা **"Yes, you are right."**

কাগজখানি পড়ে' শিক্ষক মশায় ক্ষেপে গেলেন। তাঁর ধারণা হলো এই কার্টুনে তাঁদের অপমান করা হয়েছে। ঐ ফুটবল মাঠের অনতিদূরে টেনিস্-লনে এস্, ডি, ও-সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বনগ্রাম টিমের ক্যাপ্টেন (তথা সেই স্কুলের শিক্ষক) কার্টুনখানি নিয়ে সোজা এস্ ডি, ও'-র হাতে দিলেন। বললেন, এইভাবে তাঁদের অপমান করা হয়েছে। এর প্রতিকার না হলে এই কম্পিটিশনে তাঁরা আর খেলবেন না।

কার্টুন-টি দেখে এস্, ডি, ও গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঘোষণা করে দিলেন, সেদিন আর খেলা হবে না। আর বনগ্রামের টিমকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এর প্রতিকার হবে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিল। পরদিন স্কুলে গিয়ে হেডমাষ্টার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মশায়কে তার সব ঘটনা জানালো। একখানা কার্টুন-ও তাঁর হাতে দেওয়া হলো। তিনি পড়ে হেসে বললেন, "কী হয়েছে ? এ'তে তোরা ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? এরূপ লেখা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস।"

টাউন ক্লাবের সেক্রেটারী, যাঁকে আমরা স্কুল টিমের প্রতি বিরূপ-ভাবাপন্ন বলে ভাবতাম, এবং যিনি স্কুলের ছেলেদের নিকট "লেড্ডু"—এই ব্যাঙ্গাত্মক আখ্যা

পেয়েছিলেন, তিনিও এটাকে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেবার জিনিস মনে করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ আই, সি, এস্-সাহেবের নিকট ব্যাপারটা অন্যরূপ প্রতিভাত হলো।

পরদিনই হেড্-মাষ্টারের নিকট চিঠি এলো, স্কুল ছুটির পর ছেলেদিগকে যেন বাড়ী যেতে না দেওয়া হয়। চারটের পর এস, ডি, ও, সাহেব স্কুলে আসবেন এবং ছাত্রদের নিকট তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

যথা সময়ে সকল ছাত্র স্কুল কম্পাউণ্ডে জড় হলাম। বিল্ডিং-এর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে এস্-ডি-ও প্রায় আধঘন্টা তাঁর সাহেবী ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। একটা কথাই শুধু বুঝেছিলাম—"আই শ্যাল থ্রো দ্য শিল্ড্ ইনটু দ্য রিভার" (I shall throw the Shield into the river)

হেড-মাষ্টার পরে ছাত্র নেতাদের ডাকিয়ে বললেন, এস্-ডি-ও শাসিয়ে গেছেন, সাত দিনের ভিতর যদি অপরাধীকে বের করে সাজা না দেওয়া হয়, তবে তিনি এই কম্পিটিশন বন্ধ করে দিবেন। অতএব, ছেলেরা যেন এ ব্যাপারে অপরাধ কবুল করে প্রদেয় শাস্তি গ্রহণ করতে একজনকে রাজী করায়। শাস্তি অবশ্য তিনিই দিবেন, সেটা খুব কঠিন হবে না।

আসল অপরাধীকে এ ব্যাপারে মোটেই জড়ান হবে না বলে ঠিক হলো। অন্যতম ছাত্রনেতা আমার প্রতিবেশী 'হীরুদা' (হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গাঙ্গাটিয়া) বললেন, "যে কোন অভিভাবকই যখন জানবেন যে, তাঁর ছেলে এইরূপ কাণ্ড করে ইস্কুলে সাজা পেয়েছে, তখন স্বভাবত:ই ছেলের উপর রুষ্ট হবেন। আর সুধাংশুর বেলায়ত কথাই নাই। অতএব এমন কাউকে দেখা হোক, বাড়ী থেকে যার উপর কোন নির্যাতন আসার ভয় নাই।

মমতাজ-উদ্দীন নামে আমাদের এক সহপাঠী মুস্লিম বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করতো। বাড়ী সুদূর গ্রামে ; অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। আমার বালক-সুলভ চপলতার ভার সে-ই, ঘাড় পেতে নিল। হেড্-মাষ্টারের কাছে গিয়ে সে জানালো যে. এই ছড়া সে লিখেছে এবং এই ঘটনার জন্য সমস্ত দায়িত্বই তার। হেড্-মাষ্টার তাকে কোন কিছু না বলে শুধু জানালেন যে. তাকে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হলো। মমতাজ তখনই তা' দিয়ে দিল। তখনকার দিনে পাঁচ টাকা জরিমানা লঘু শাস্তি নয়, তবে সে সময়ে প্রচলিত বেত-মারা প্রভৃতি দৈহিক শাস্তির চেয়ে সম্মানজনক।

'আই-সি-এস্' ও আই-সি-এস্'-এর পার্থক্য দেখাতে গিয়ে এই ঘটনার উল্লেখ করলাম। কিন্তু, আমার আসল কাহিনী থেকে কতদূরে সরে এসেছি ! স্মৃতি-চারনার মুস্কিল-ই এই। এক কথা বলতে গিয়ে হাজার স্মৃতি এসে মনে ভীড় করে।

মণীন্দ্রের কথা বলছিলাম। কিন্তু তার কাহিনীও শেষ হয়ে এসেছে। বহুদিন

বাড়ীঘর ছেড়ে কিশোর মণীন্দ্র আমাদের সঙ্গে কাজ করে আসছে। একদিন ছুটি চাইল, বাড়ী যাবার জন্য। বাড়ীর খবর বহুদিন জানে না ; মনটা একটু উতলা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার এক বিরাট এলাকা জুড়ে একটি প্রাকৃতিক বনভূমি আছে। "মধুপুরের জঙ্গল" নামে ইহা খ্যাত। এই বিশাল বনভূমির মাঝে মাঝে লোকবসতিও আছে। এমনি একটি গ্রামে মণীন্দ্রের বাড়ী। ওখানে যেতে হলে অধিকাংশ রাস্তাই পায়ে হেঁটে যেতে হয় (আমি প্রায় ষাট বছর পূর্ব্বেকার কথা বলছি)। মাস খানেকের ভিতরই মণীন্দ্র ফিরে আসবে বলে আশ্বাস দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু, আর সে ফিরে নাই। রাস্তায় বাঘ-ভাল্লুকের পেটে গেল, অথবা বাড়ীতে গিয়ে বিয়ে থা' করে সংসারী হলো, বা অন্য কিছু ঘটলো—কিছুই আমরা জানতে পারিনি।

এই কর্ম্মক্ষেত্রের আবর্ত্তে কত সাথীই যে এমনি করে হারিয়ে যায়, তার হিসেব কে রাখে ? শুধু মাঝে মাঝে তাদের মলিন স্মৃতি-টুকু মনের মাঝে উঁকি দিয়ে ক্ষণেকের জন্য এক উদাস বিষন্নতার সৃষ্টি করে।



পণ্ডিত জয়চাঁদ বিদ্যালঙ্কার

আমার পলাতক জীবনে হরিদ্বার এবং তৎ সংলগ্ন অঞ্চলে কিছুদিন ছিলাম। ঐ সময়ে আমার প্রধান অবলম্বন ছিল, একটি সত্যাগ্রহ-শিবির ও তার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত একটি আশ্রম। কী করে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং কীভাবে এই অজ্ঞাত-বাসের জীবনটা কেটেছিল, সেই কাহিনী লিখছি।

১৯৩০ সালের প্রথম ভাগ। সঠিক সময় বলা এখন মুস্কিল; তবে এপ্রিলের মাঝামাঝি বলে অনুমান হয়। বাংলার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেশ আলোড়িত। পুলিশি সন্ত্রাসে সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের বহ্নি ধূমায়িত।

নীরদ চক্রবর্ত্তী ও আমি তখন কলকাতায় আছি। কলকাতা 'ইয়ং কম্‌রেড্‌স্ লীগের' সম্পাদক তখন নলীন্দ্র সেন। আইনের ছাত্র। হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে থাকে। পাঁচতলায় তার ঘর। সেখানেই আমরা ও তার 'গেষ্ট' হিসাবে আশ্রয় নিয়েছি। আমার পক্ষে ওটাই বেশ নিরাপদ স্থান মনে করেছিলাম—পুলিশের দৃষ্টির বাইরে।

ঐ সময়ে বাংলার বাইরের সমাজবাদী ভাবাপন্ন বিপ্লবী যুব-সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে নীরদবাবু পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডেরা-গাজী-খান অঞ্চল পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন। সেখানে পাঠান সর্দার কয়েকজনের সঙ্গে সংযোগ সাধিত হয়েছে। তারপর নলীন্দ্র সেন যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব ঐ উদ্দেশ্যে সফর করে এসেছে। দিন কয়েক আগে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতা পরমানন্দ তেওয়ারী হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। আমাদের কেউ যেন শীঘ্রই ওদের কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার জন্য কাশীতে যাই, তার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে।

ঠাট্টাচ্ছলে বিরক্ত করবার জন্য নলীন্দ্র সেন মাঝে মাঝে রাত্রে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে কপট ভীতি-জড়িত স্বরে বলতো—"পুলিশ, পুলিশ! পুলিশে হোষ্টেল ঘেরাও করেছে।" আমরা সন্ত্রস্তভাবে উঠে ছুটে বারান্দায় গিয়ে নীচে দৃষ্টিপাত করতাম। কই-কোথাও কিছু নেই। নিশীথের কলুটোলা ষ্ট্রিট নির্জন, ঘুমন্ত। উল্টো দিকে

মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের দেওয়াল সংলগ্ন ফুটপাতে কয়েকজন ভিখারী নিদ্রা যাচ্ছে। আমাদের অবস্থা দেখে নলীন্দ্র হাসতো।

একাধিক দিন এইরূপ হাস্য-পরিহাসের পর একদিন সত্যি-সত্যিই পালে বাঘ পড়লো। সেদিন আমরা নলীন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করতে অনিচ্ছুক। আমি ত ধমক দিয়ে বল্লাম, "আসুক গে পুলিশ। আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছিনা।"

সে সনির্বন্ধভাবে বললো—"আমি ঠাট্টা করছি না। শীগ্‌গীর উঠুন। উঠে নীচে একবার তাকিয়ে দেখুন।"

উঠতেই হলো। তাকিয়ে দেখি, মোটর-সাইকেল-আরোহী বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সার্জেন্ট হোস্টেলের সামনে 'প্রস্তুত' অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে কলুটোলা ষ্ট্রিট জুড়ে পুলিশের সারি ও একাধিক পুলিশ ভ্যান। রাত তখন চারটে।

উঠেই, প্রথম কাজ হলো আপত্তিকর কাগজপত্রগুলি নষ্ট করা। সেগুলি ছিঁড়ে পায়খানায় ফেলে 'ফ্লাশ' টেনে দেওয়া হলো। তেওয়ারীর সদ্য-দেওয়া কয়েকটি চিঠি ও ঠিকানা-ও এই সঙ্গে ছিল। তারপর ঠিক হলো, তিনজনই পালাবার চেষ্টা করবো। নলীন্দ্র সেখানকার বোর্ডার এবং ইউনিভারসিটির ছাত্র হলেও পুলিশের কবল থেকে রেহাই পাবে বলে মনে হলো না।

আমি ও নীরদবাবু ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলাম। নলীন্দ্র সেন একটু পিছনে আসছিল। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটা বিল্ডিং-এর ছাদের সঙ্গে সংলগ্ন। কিন্তু উভয়ের মাঝে একটা কলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট। সেটা তালাবন্ধ। দু'হাতে টেনে গেটের পাল্লা দু'টো একটু ফাঁক করা গেল। আমি কোন প্রকারে তার ভিতর দিয়ে গলে গেলাম। কিন্তু, নীরদবাবু মোটা মানুষ; এই ফাঁক দিয়ে তাঁর গলে আসা সম্ভব হলো না। কাজেই আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো। যা' করবার তিনজন এক সঙ্গেই করবো। এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেলাম। ভাবলাম, আমরা পালাচ্ছি টের পেয়ে পুলিশ উপরে আসছে। কিন্তু না—সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার আওয়াজ, 'নেমে আসুন, নেমে আসুন।' নলীন্দ্র সেন ডাকছে। আবার পাচতলায় নামলাম। নলীন্দ্র সেনের সঙ্গে একজন হৃষ্টপুষ্ট জমকালো গোঁফওয়ালা হিন্দুস্তানী। সে বললো, "বাবু, আমার সঙ্গে আসুন। আমি বের করে দিচ্ছি।"

পরে নলীন্দ্র সেনের নিকট জেনেছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দারোয়ান সে। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট খুলিয়ে পুলিশ হার্ডিঞ্জ

হোস্টেলের পিছনের দিকেও পাহারা মোতায়েন করেছে। এই পুলিশ-প্রহরীদের সঙ্গেই সে-ও পিছন দিককার সিঁড়িতে বসে ছিল। আমাদের জেগে উঠা ও ছুটাছুটি টের পেয়ে, বোধহয় তার দেশোয়ালী পুলিশ ভাইদের সঙ্গে কথা বলেই, আমাদের খোঁজে এসেছে।

দারোয়ানের সঙ্গে দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দ পদে তিনজন নেমে চললাম। পাহারা-রত লালপাগড়ী-ধারী পুলিশদের সামনে দিয়েই সে আমাদের নিয়ে গেল। প্রহরীরা যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, এমনি ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। দারোয়ান আমাদের নিয়ে গিয়ে ইডেন হোস্টেল-সংলগ্ন একটি গেট খুলে দিল। আমরা প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রিটে পড়ে' সেন্ট্র্যাল এভিনিউ-র দিকে দ্রুতপদে হন্টন দিলাম। দারোয়ানকে একটা ধন্যবাদের কথাও জানান হলো না।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। রাস্তায় চলতে চলতে ঠিক করা হলো—গোয়া-বাগানে আমাদের এক সহকর্ম্মী ত্রিপুরা সেন একটি ঘর ভাড়া করে থাকেন। ল'কলেজের ছাত্র। তার কাছে গিয়েই প্রথম উঠা যাবে। ওখানে গিয়ে পরবর্ত্তী কর্ম্মধারা ঠিক করা হবে।

সে-দিনটা তিনজনেই ত্রিপুরা সেনের ওখানে কাটালাম। পরামর্শ করে ঠিক হলো। আমি পশ্চিমে পাঞ্জাবে চলে যাবো, নীরদবাবু কিশোরগঞ্জে এবং নলীন্দ্র সেন ঢাকা যাবে। আমি অবশ্য নীরদবাবু ও নলীন্দ্র সেনের ঐ দু'টি প্রস্তাবিত স্থানে প্রকাশ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু, তাঁদের ধারণা, তাঁদের উপর এখনও পুলিশের নজর তেমন পড়েনি। কিন্তু, আমার আশঙ্কাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। কিশোরগঞ্জে গিয়েই নীরদবাবু অ্যারেষ্ট হলেন। আর নলীন্দ্র সেন ঢাকার অবস্থা সুবিধার নয় দেখে কলকাতা ফিরে আসে এবং অল্প দিন পরেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। এসব কথা অবশ্য অনেক পরে জেনেছিলাম।

সেদিনই রাত্রে আমি কলকাতা ছাড়লাম। প্রথমে অমৃতসর, পরে লাহোর এবং পেশোয়ার প্রভৃতি দু'একটি স্থান গন্তব্যস্থল। যাত্রাপথে লক্ষ্ণৌয়ে কয়েক দিন ছিলাম বিনয়বিহারী মজুমদারের আবাসে। বিনয়বাবু কিশোরগঞ্জের লোক, আমার দাদার সহপাঠী। আমাদের সঙ্গে ওঁদের পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। চাকরী-উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ থাকেন। লক্ষ্ণৌ-এ সে-সময় আমার এক আত্মীয়-ও থাকতেন। বড় সরকারী চাকুরে। তাঁর সঙ্গেও দেখা করলাম। খরচ-পত্রের অভাব ছিল। তাঁর স্ত্রীর (আমার মামাত বোন) দৌলতে সেটা পূরণ হলো। আমি যে বেঁচে আছি, তাই দেখে ওরা খুব খুশী। কারণ বহুদিন আমি ঘরছাড়া ও নিরুদ্দেশ।

অমৃতসর ষ্টেশনে নেমে একজন কুলীর মাথায় আমার ছোট্ট টিনের সুট-কেস্ ও কম্বলটা চাপিয়ে শহরে ঢুকলাম। মনে পড়ে, একটি পাকা তোরণের ভিতর দিয়ে শহরে ঢুকতে হয়েছিল। আমার গন্তব্য স্থান বের করার জন্য কাকে জিজ্ঞেস করা যায়, ভেবে ভেবে রাস্তায় চলেছি। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, তিনজন যুবক, মাথায় পাগড়ী নেই, পরস্পর কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। মনে হলো, কলেজের ছাত্র। এদেরই উপযুক্ত লোক বিবেচনা করে, এগিয়ে গিয়ে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলাম, "কীর্ত্তি-আফিসটা কোথায় আমায় বলতে পার?"

প্রশ্ন শুনে, ওদের একজন বেশ একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ করে আমায় প্রশ্ন করলো, "কীর্ত্তি—আফিসে কার কাছে যাবে?

"ভাগ সিং-এর কাছে।"

"ভাগ সিং-ত এখানে নেই। সে এক জাঠা (সত্যাগ্রহীদল) নিয়ে পাতিয়ালা গেছে।" এই পর্য্যন্ত বলে সে তার সঙ্গী দু'জনকে বিদায় দিয়ে আমার দিকে মনোযোগ দিল। জিজ্ঞেস করলো—

"তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"কলকাতা থেকে"—বলেই তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

"আমার নাম ফিরোজদীন মনসুর"—সে বললো।

প্রাণে জল এলো। মনসুরের নাম এবং তার কীর্ত্তি-কাহিনী জানতাম। 'মুহাজিরিন্—দলের সঙ্গে তাঁর ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্য্যন্ত গমন এবং সেখান থেকে 'হিন্দুকুশ' পর্ব্বত ডিঙিয়ে পদব্রজে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী রোমাঞ্চকর। [কৌতূহলী পাঠক মুজফ্ফর আহম্মদ লিখিত 'প্রবাসে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন' নামক পুস্তকে ফিরোজদীন মনসুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন।]

নীরদবাবুর পূর্ব্বেকার পাঞ্জাব সফরকালে মনসুরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে আমার উপর নির্দ্দেশ ছিল ভাগ সিং-এর কাছেই যাওয়ার।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে মনসুর তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে বললেন। রাস্তায় আর বিশেষ কিছু আলাপ না করে মনসুরের সঙ্গে তাঁর আবাস-স্থলে উপস্থিত হ'লাম।

মনসুর থাকেন গুরদিৎ সিং নামক একজন শিখ ভদ্রলোকের বাড়ীতে। এই গুরদিৎ কিন্তু গদর দলের নেতা বাবা গুরদিৎ সিং নহেন। ইনি একজন ব্যবসায়ী।

'গ্রামোফন প্যালেস' নামে অমৃতসরে তাঁর একটি বড় দোকান আছে। এঁর-ই বাড়ীর একাংশে একখানা ঘরে মনসুর বাস করেন। আমি-ও এখানেই আশ্রয় পেলাম।

ঘরে এসে মনসুরের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হলো। কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মীরাট মামলায় ধর পাকড়ের পর সেখানকার পার্টির অবস্থা ইত্যাদি তিনি জানতে চাইলেন। যথাসম্ভব তাঁকে এসব বিষয়ে অবহিত করলাম। পুলিশের ব্যূহ থেকে কীভাবে পাল (নীরদবাবু সেখানে পাল নামে পরিচিত) সেন ও আমি পালিয়েছি, তা'ও বলতে হলো এবং ওখানকার কমরেড্‌রা যে আমাকে পাঞ্জাবে এসে ভাগ সিং-এর কাছে কিছুদিন থাকতে পাঠিয়েছেন, তা'ও জানালাম।

"কিন্তু, ভাগ সিংত এখন নেই। আর শীগ্‌গীর তাঁর ছাড়া পাবার-ও সম্ভাবনা নেই। এই 'ভাঠা' পরিচালনা করে তাঁকে হয়ত জেলেই যেতেই হবে। আর কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আছে কি?"

বল্‌লাম "লাহোর এবং পেশোয়ারে-ও যাবার কথা আছে।"

"ওসব স্থানে যাওয়া এখন অসম্ভব। কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলন এখন ওদিকে চরম সীমায় উঠেছে। অমৃতসর ও লাহোরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আজকের খবর, সীমান্তে পাঠানদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যের তুমুল লড়াই হচ্ছে। আফ্রিদি অঞ্চলের খানিকটা ইংরেজের হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

আমি চুপ করে অবস্থাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করতে লাগলাম। একটু পরে মনসুর আবার বললেন, "এখানে ত' কয়েকদিন থাক ; দেখি কী করা যায়।"

মনসুরের ওখানেই আছি। পাইস্ হোটেলে খাই ; সন্ধ্যের দিকে একটু বেড়াতে বেরোই। বেশীর ভাগ দিনই জালিয়ান-ওয়ালা বাগে গিয়ে বসে থাকি। মনসুরের দেখা পাওয়া ভার। সারা দিনই তিনি বাইরে কর্ম্মব্যস্ত থাকেন। গভীর রাতে ফিরে আমায় জিজ্ঞেস করেন, "কী, ঘুমাচ্ছ?"

"ঘুমবার কি উপায় আছে? মশক-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই ব্যস্ত আছি।" তিনি হাসেন। আমাদের কারোই মশারী নেই।

মনসুরের মাধ্যমে পাঞ্জাবের "হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক্যান আর্ম্মি"-র সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। ভগৎ সিং তখন জেলে। যশোদাপাল ঐ দলের নেতা। তার সঙ্গে মনসুরের ঘরেই অনেক আলাপসালাপ হলো। নীরদবাবু ও নলীন্দ্র সেনকে সে জানে। আলাপ আলোচনার পর সে বললো, "দেখ, সবই ঠিক। কিন্তু, আমাদের

দলের একটা নিয়ম আছে। তুমি কলকাতা থেকে 'পাল' বা সেনের কাছ থেকে এমন একটা চিঠি বা সংকেত-বাক্য আনাও, যার ভিত্তি-তে আমরা তোমাকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিতে পারি। যদ্দিন ঐ চিঠি না আসবে, তোমার নিরাপদ অবস্থানের ভার আমরা নিলাম।"

বললাম, "সে কী করে সম্ভব হবে? কী অবস্থায় আমি এসেছি, সবই শুনেছ। পাল বা সেন এখন কোথায় আছে, তারা বাইরে আছে, কি জেলে, তা'ও জানিনা। জানার উপায়ও নেই।"

আমি যে 'ওয়াচ্-ওয়ার্ড' নিয়ে এসেছিলাম, তা' শুধু ভাগ সিং-এর কাছেই প্রকাশনীয় ছিল। মনসুর বা অন্য কারো নিকট নয়। লাহোর ও পেশোয়ারের জন্য ভিন্ন 'ওয়াচ্-ওয়ার্ড' ছিল। ভাগ সিং-এর সঙ্গে যে দেখা না-ও হতে পারে এই সম্ভাব্য ব্যাপারটি কলকাতায় আমাদের বিবেচনার গণ্ডী এড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর আমিও স্থায়ীভাবে পাঞ্জাবে থাকতে আসিনি; কলকাতার আকাশের উত্তাপ একটু মন্দীভূত হলেই সেখানে চলে যাবো।

যাক্—এরপর যে কয়দিন অমৃতসরে ছিলাম, পাঞ্জাবের বিপ্লবীদলের এই নওজোয়ানদের সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হতো। ধনোয়াস্ত্রী একদিন পরিচয় করিয়ে দিল কয়েকজন যুবকের সঙ্গে যারা পূর্ব্ব-সূরী বিপ্লবীদের (যেমন, ধিংড়া ইং) কোন না কোন আত্মীয়। আরেকদিন বহু যুবক মনসুরের ঘরের সমবেত হলো—সঙ্গে এক প্রকাণ্ড ডেকৃচি ভরতি গরম মাংস ও কতকগুলি পাউরুটির রোল। সেখানে ওদের ভোজ হবে। আমাকে অনেক অনুরোধ করলো ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু, আমাকে কিসে যে পেয়ে বসলো—বিনীতভাবে ওদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললাম, "দেখ, এখানে এসে অবধি দু'বেলা হোটেলে মাংস খাচ্ছি; মাংসের প্রতি আমার একটা অরুচি জন্মে গেছে।"

ধনোয়াস্ত্রী বললে "আরে, এযে ঘরের রান্না: খুবই সুস্বাদু হবে। তুমি খেয়ে দেখ।"

তবু রাজী হইনি। আমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়াতে গেলাম। বন্ধুরা নিশ্চয়ই খুব ক্ষুন্ন হলো।

যাক্-এই বাহ্য ব্যাপার ছেড়ে আসল কাহিনীতে আসি।

একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে বসে আছি। ধনোয়াস্ত্রী এবং আরো দু'একটি ছেলেও সেখানে আছে। এমন সময় ধুতি, কোর্তা পরিহিত একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে

ঢুকলেন। ধনোয়ান্ত্রী "আইয়ে মাস্টার-জী" বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনি সোজা আমার কাছে এসে আমাকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বললেন, "দেখ, তোমাকে একখানা চিঠি দিচ্ছি। এইটি নিয়ে তুমি হরিদ্বার চলে যাও। রাত দশ টার ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে করে লাক্সার ষ্টেশনে নামবে। লাক্সার থেকে ট্রেন বদল করে হরিদ্বার যাবে। চিঠি দিচ্ছি জয়দেব বিদ্যালংকারের নামে। কিন্তু ওখানে জয়দেবকে না পেলে, দেবশর্ম্মা বিদ্যালংকার বা পূরণচাঁদ বিদ্যালংকার—এদের যে-কোন একজনের হাতে চিঠি দিতে পার। এরা তোমার থাকার ব্যবস্থা করবে।"

এই বলে তিনি হরিদ্বারের কোথায় কীভাবে তাদের দেখা পাওয়া যাবে, তা' বুঝিয়ে দিলেন।

স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি আমার সম্বন্ধে সব কিছুই জেনেছেন—হয় মনসুর না হয়, ধনোয়ান্ত্রীর কাছে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিখানি গ্রহণ করলাম।

ভদ্রলোকের পরিচয় জেনেছিলাম পরে, মনসুরেব কাছে। এঁব নাম পণ্ডিত জয়চাঁদ বিদ্যালংকার একটি কলেজেব অধ্যাপক। ভগৎ সিং-এর গুরু বলেও তিনি পরিচিত। ভগৎ সিং যখন ঐ কলেজের ছাত্র ছিল, তখন বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে জয়চাঁদ-জী তাকে দেশ-প্রেমেও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং বিপ্লব পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ আরেকটি কথার উল্লেখ করছি। পণ্ডিত জয়চাঁদের এক ভাই ইন্দ্রনারাং যাদবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে পড়তো। এত সুন্দর পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বাংলা বলতে শিখেছিল যে, সে-যে পাঞ্জাবের লোক, তা' বোঝে কার সাধ্য? পরে ১৯৩১ সালে আমি বি, সি, এল, এ র‍্যাক্টে ডেটিনিউ হবার পর প্রেসিডেন্সি জেলে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে-ও ডেটিনিউ ছিল। আমার সঙ্গে অমৃতসরে তার দাদার সাক্ষাৎকারের ঘটনা শুনে, সে পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় রসিকতা করে বললো—"আরে মশয় রে মশয়, আপনে ত কম লোক না: আমার দাদার লগেও পলিটিক্স করছেন।"

ইন্দ্রনারাং-এর কাছেই সে-সময় শুনেছিলাম, পণ্ডিত জয়চাঁদ বিয়ে করেছেন; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমান্তে। ব্রিটিশ ভারতের সহিত ঐ সীমানা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পণ্ডিত-জী শ্বশুর-বাড়ীতে অবস্থিত তাঁর পরিবার-পরিজনের সহিত আজ দীর্ঘ কয় বছর যাবৎ মিলিত হ'তে পারছেন না।



জয়দেব বিদ্যালংকার

হরিদ্বার ষ্টেশনে নামা গেল। বেলা প্রায় আট-টা। একজন কুলীর মাথায় আমার সুটকেসটি চাপিয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে রোয়ানা হ'লাম। অচেনা জায়গায় কুলীরাই বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শক। তাই, তারই পরিচালনায় কনখলের দিকে পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগলাম। কনখলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঃ দেবশর্ম্মা বিদ্যালংকারের সন্ধান নিবার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলাম। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর পথ-প্রদর্শক আমাকে রাস্তার ধারেই একটি বাড়ীতে এনে হাজির করলো। দেখলাম, ছোট্ট একটি ঘরে গুটি কয়েক ছাত্র একজন গুরুর কাছে পড়ছে। কোন স্কুল মনে হলো না। নিজের বাড়ীতে কেউ ছেলেদের প্রাইভেট পড়াচ্ছেন বলে মনে হলো। যাই হোক, গুরুমশায়কে পঃ দেবশর্ম্মার কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, "পণ্ডিতজী ত এখানে থাকেন না, তিনি এখন জালাপুরে একটি সত্যাগ্রহ শিবির পবিচালনা করছেন।" কুলীকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

আবার হন্টন। যতটা পথ এসেছিলাম, আরো প্রায় ততটা পথ অতিক্রম করে জালাপুর সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে পৌঁছালাম। জালাপুর হরিদ্বারের আগের ষ্টেশন; অর্থাৎ ট্রেনে জালাপুর অতিক্রম করে হরিদ্বার এসে পৌঁছেছি। এবার পায়ে হেঁটে সেই অতিক্রান্ত স্থানে ফিবে এলাম।

একটি ছোট উঁচু মাঠের উপর সারি সারি কয়েকটি তাঁবু। তারই একটিতে শীর্ণ দেহ, শুভ্রকায়, খদ্দরের ধুতি ও হাতকাটা জামা পরিহিত মধ্যবয়স্ক একজন সুপুরুষ কয়েকজন যুবকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। ইনিই পঃ দেবশর্ম্মা জানতে পেরে চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম। চিঠিটি পড়ে তিনি নিকটে উপবিষ্ট একজন ভলান্টিয়ারকে পাঠালেন, জয়দেবকে ডেকে আনতে। আর আমাকে বললেন, "আপনাকে এই পোষাকটি ছাড়তে হবে, বিশেষ করে ঐ টুপীটি।"

আরেকজন ছেলেকে নির্দেশ দিলেন, পাশের একটি তাঁবুতে আমাকে নিয়ে যেতে। খালি তাঁবুতে ঢুকে আমার সুটকেস্ থেকে ধুতি বের করে পরলাম। পরনের হাফ-প্যান্টটি ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম এবং শোলার টুপীটি তাঁবুর এক কোণে রেখে দিলাম।

ফেরারী জীবনে বাইরে বেরোবার সময় হাফ্ প্যান্ট, সার্ট এবং কখনো কখনো তার উপর 'ওপেন ব্রেষ্ট' কোট পড়তাম। পায়ে ফুল মোজা ও জুতা এবং মাথায় একটি শোলার টুপী থাকতো। অপরিচিত লোকের কাছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ বলে পরিচয় দিতাম ; নাম-ও রাখা হয়েছিল, তেমনি একটা। কিন্তু, সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে যে এই পোষাক অচল, তা' সহজেই বোধগম্য। তাই, পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করলাম।

ইতিমধ্যে জয়দেব এসে গেছে। গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট, সুন্দর চেহারা, আমারই সমবয়স্ক। দেখলেই বন্ধু বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়। সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে আহ্বান জানালো। সুটকেস্ থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তার অনুসরণ করলাম। ক্যাম্পের অনতিদূরেই রুরকি খাল। হরিদ্বারের গঙ্গা থেকে এই খাল কেটে পাঞ্জাবের রুরকি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেচের জন্য। খালের উপর দিয়ে রেল-লাইন চলে গিয়েছে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা এই রেল লাইনের উপর দিয়েই খালের এপার-ওপার যাতায়াত করে।

আমরাও ঐভাবে খাল পার হয়ে নিকটেই একটি আশ্রমে প্রবেশ করলাম। আশ্রমে একটি শিব মন্দির, গুটি কয়েক জীর্ণ টিনের ঘর। উঠানের মাঝখানে একটি সুউচ্চ আমগাছ ছায়া দিয়ে আশ্রমটিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

এই আমগাছের নীচে একটি খাটিয়ায় বসলাম। জয়দেব আমাকে স্নান করে নিতে বললো। আশ্রমের নীচেই গঙ্গার খাল। সর্ব্বদাই খরস্রোতা, জল তাই টলটলে পরিষ্কার। স্নান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সব কাজই এই খালের জলে করা হয়। বোধ হয়, পানের জন্য শুধু টিউব-ওয়েল বা কুয়োর জল সংগ্রহ হয়ে থাকে। খালের শীতল জলে অবগাহন করে শরীর স্নিগ্ধ হলো।

রান্না ঘরে বসে সদ্য উনুনে সেঁকা ধোঁয়া উঠা গরম রুটি ও ডাল বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করা গেল। ঐ মোটা রুটি একখানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আশ্রমের মাতাজী রান্না ও পরিবেশন দুই-ই করছিলেন। প্রায় বৃদ্ধা, সুস্মিত-বদনা-স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্ত্তি। একখানা রুটির পর আর নিলাম না দেখে, তিনি বললেন, "তুমি রুটি খেতে অভ্যস্ত নও ; কিন্তু বাবা, আমাদের এখানে যে রুটিই খেতে হবে।"

আমি বললাম, "রুটি খেতে আমি খুবই ভালবাসি ; বিশেষ করে এমন সদ্য ভাজা গরম রুটি। আপনি ব্যস্ত হবেন না ; আমি স্বভাবতঃই একটু অল্পাহারী।"

জয়দেব কাছেই ছিল। সে আচারের দু'টি বোয়াম এনে বললো—"এই আচার দিয়ে আরেকখানা রুটি খাও। বেশ সুস্বাদু আচার। আমাদের সব্জী ইত্যাদি বিশেষ রান্না হয় না।"

আমার পেট যে ভরে গেছে, তা' এই অতিথি-বৎসলদের বুঝাতে বেশ বেগ পেতে হলো।

* * *

এমনি করে আশ্রমে আছি। সকাল বেলা গঙ্গার খালের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে বেড়াতে যাই। সারিবদ্ধ বৃক্ষাচ্ছাদিত নির্জন রাস্তার ধারে মধুর হিমেলী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাতর্ভ্রমণ বেশ লাগতো। আশ্রমের পাশেই গুরুকুল আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়। জয়দেব একদিন সেখানে নিয়ে গেল। আচার্য্যদের সঙ্গে আলাপ হলো। ওঁদের বাগান ঘুরে দেখলাম। বহুরকম ভেষজগুল্ম ও বৃক্ষের সমাবেশ। সুন্দর লাগলো।

একদিন জয়দেবকে বললাম, "তোমাকে এবং পণ্ডিত দেবশর্ম্মাকে ত' দেখলাম। কিন্তু আরেকজনের পরিচয় পেয়ে এসেছিলাম। পঃ পূরণচাঁদের সঙ্গে ত' সাক্ষাৎ হলো না।"

"পূরণ চাঁদজী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর কাছে একদিন নিয়ে যাবো।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা গুরুকুল ইউনিভারসিটির ক্যাম্পাসে পূরণ চাঁদের নিকট যাওয়া হলো। তিনি ওখানেই হোষ্টেলে থাকেন। ইউনিভারসিটির একজন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপর সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকের কাজ পেতে বিলম্ব হয়নি। হরিদ্বারে মহাত্মা গান্ধী যেদিন এক মহতী জনসভায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন, সেদিন বহুলোক টাকা পয়সা, গহনা ইত্যাদি সত্যাগ্রহ ফাণ্ডে দান করেছিল। পূরণ চাঁদজী সেইখানে তাঁর সোনার মেডেলটি তহবিলে প্রদান করেন। জনৈক ব্যবসায়ী এক হাজার টাকা দিয়ে ঐ স্বর্ণপদকটি কিনে নিয়ে পূরণ চাঁদজীর হাতে সেটি প্রত্যর্পন করেন। পদকটি গ্রহণ করে পূরণ চাঁদ তৎক্ষণাৎ সেটিকে আবার সত্যাগ্রহ তহবিলে দান করেন। এইভাবে তিনবার দেয়া-নেওয়ার পর ফাণ্ডের কর্ত্তারা আর সেটিকে নিলামে দেন নি।

সেদিন রাত্রে পূরণ চাঁদের কাছে হোষ্টেলে রইলাম। জয়দেব ফিরে গিয়েছিল। বহুরাত পর্য্যন্ত অনেক কথাবার্ত্তা হলো। আজ আর সে-সবের খুঁটি নাটি মনে নেই। তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে রুশীয়ার সমাজবাদী বিপ্লবকে যদিও তাঁরা স্বাগত জানান, তবু মনে করেন যে, ভারতের পক্ষে একমাত্র গান্ধীজির দর্শন ও কার্য্যক্রম-ই প্রযোজ্য।

মাঝে মাঝে সত্যাগ্রহ শিবিরের তাঁবুতেও রাত কাটাতাম। বিশেষ করে যেদিন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যেত, সেদিন আশ্রমে থাকা অসুবিধে ছিল।

পঃ দেবশর্ম্মা ছিলেন একজন প্রকৃত নেতা। কোন গুরুত্ব-পূর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হলে, যে-সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া দরকার তার সবগুলিরই সমন্বয় তাঁর ভিতর দেখেছি।

কী কঠোর একনিষ্ঠতা! সকালে, দুপুরে, বিকালে যখনই গিয়েছি, তাঁকে সেই ফরাসে একাসনে বসে বিভিন্ন দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ একাগ্রমনে করে যেতে দেখেছি। খাবার জন্য পর্য্যন্ত তিনি শিবির ছেড়ে যেতেন না। ঐখানে বসেই ছোট্ট একটি টিফিন-কৌটায় আনীত একখানি রুটি ও একটু সব্জী বা শাক-ভাজা দিয়েই তাঁর দ্বিপ্রহরের আহার কার্য্য সমাধা করতেন।

আমাকে-ও দু'একদিন অন্য ভলান্টিয়ারদের সাথে পিকেটিং-এ যেতে হয়েছে। সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে থাকি, অথচ কোন কাজে যাবো না—এটা বিসদৃশ দেখায় এবং অন্য লোকের সমালোচনার বিষয় হতে পারে, এই ভেবেই হয়ত, দেবশর্ম্মাজী আমাকেও মাঝে মাঝে ডিউটিতে পাঠিয়েছেন। আর এই অহিংস পিকেটিং-এ আমি বিশ্বাসী নই জেনেই, জয়দেব এসে চুপি চুপি আমায় বলে গেছে—'তোমায় কিছুই করতে হবে না, অন্য ভলান্টিয়ারেরা যা' করবার করবে। তুমি এদিক সেদিক বসে থেকো।' আমি তাই সঙ্গে যেতাম, কিন্তু পিকেটিং না করে সমবেত অন্য দর্শকদের সঙ্গে মিশে সব দেখতাম।

জালাপুরে অনেক মুসলমানের বাস। তারা এই সত্যাগ্রহে যোগ না দিলেও সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। পিকেটিং-এর সময় দর্শকরূপে সদলবলে উপস্থিত থাকতো। একদিন মদের দোকানে পিকেটিং চলছে। আমার-ও 'ডিউটি' ছিল। আমি আমার রীতি অনুযায়ী দর্শকরূপে 'ডিউটি' দিচ্ছিলাম। দু'টি পুলিশ কন্‌ষ্টেবল সেখানে মোতায়েন ছিল। তাদের উপস্থিতিতেই বোধহয় উৎসাহিত হয়ে দোকানের মালিক একজন স্বেচ্ছাসেবককে জুতা দিয়ে বেদম প্রহার করলো। সমবেত জনতা (বেশীর ভাগই মুসলমান) উত্তেজিত হয়ে মদ ওয়ালার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য চেঁচামেচি শুরু করলো। ওদের ভিতর থেকে আমি-ও আমার উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ দমন করে রাখতে পারিনি। ফলে, ভলান্টিয়ার রূপে একমাত্র আমিই ওদের তারিফ পেলাম। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের নিজ-কর্ত্তব্য ভাল করেই জানতো। অহিংসা বজায় রেখেই তারা শেষ পর্য্যন্ত পিকেটিং চালিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর পঃ দেবশর্ম্মার নিকট মদ-ওয়ালার বিচার হলো। সে আত্মসমর্পন করেছিল। মাপ চেয়ে ও কিছু অর্থ জরিমানা দিয়ে রেহাই পেল।

আরেক দিনের ঘটনা। এক হরিজন মদের দোকানে ঢুকছিল। ভলান্টিয়ারেরা তাকে বাধা দিয়েছে। সে বললো—"দেখ জী, আমার জায়গা নেই, জমি নেই। অন্যের জায়গায় একখানি কুড়েতে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকি। সারাদিন গতর খেটে যা' রোজগার করি, তা' দিয়ে ছেলে পিলে বৌ-কে পেট ভরে খেতে দিতে পারি না। এই দুঃখ ভুলে থাকতে আমাকে মদ খেতেই হবে; নইলে পাগল হয়ে যাবো। আমায় দু'বিঘে জমি দাও দেখি, আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেব।"

ভলান্টিয়ারেরা এর কী উত্তর দেবে? ওদের উপর অর্পিত কাজ ওরা করে যাচ্ছে।

ঘটনাটা এসে জয়দেবকে বলে জিজ্ঞেস করলাম—"হরিজনের এই কথাগুলির কী উত্তর দিবে তোমরা?"

জয়দেব বললো—"দেখ, গরীবদের এই অসহনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার কথা আমরা জানি। কিন্তু, এই দুঃসহ অবস্থার বেদনা এরা ভুলে থাকুক—এটা আমরা চাই না। ব্রিটিশ শাসনে এরা যে কীরূপ নির্ম্মমভাবে শোষিত হচ্ছে, এটা মর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বদা এরা অনুভব করুক, ইহাই আমরা চাই। তবেই না এই শাসনের বিরুদ্ধে এরা গর্জে উঠবে। তবেই না বিপ্লব সম্ভব হবে।"

জয়দেবের এই কথাগুলি আমাকে শুধু স্তোক দিবার জন্যই কিনা জানি না।

মাঝে মাঝে আমাকে দু'চার দিন অন্যত্র গিয়ে থাকবার জন্য পাঠান হতো। ওখানকার পরিবেশে এক নাগাড়ে বেশী দিন থাকা যে আমার এবং তাঁদের—কারো পক্ষেই নিরাপদ নয়, এই ভেবেই হযত, দেবশর্ম্মাজী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। খাস হরিদ্বার গিয়ে কিছুদিন রইলাম। 'পাঞ্জাব সেবাদল' (**The Punjab Volunteer Corp's**) নামে ওখানে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। 'রেড্‌ক্রস্' বা 'সেন্টজেম্‌স্ এ্যাম্বুলেন্স-কোর'—এর মতই এটি একটি জনসেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান। 'হর-কী-প্যয়রী'-র নিকটেই ওদের তিনতলা অট্টালিকা। একতলায় ওদের পরিচালিত ডাক্তারখানা। ওখান থেকে রোগীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা ও ওষুধপত্র দেওয়া হয়, বিনামূল্যে। দু'তলা ও তিনতলায় স্বেচ্ছাসেবকদের বাস। ওখানেই আমারও থাকবার ব্যবস্থা হলো। এই পাঞ্জাবী স্বেচ্ছাসেবকেরা কিন্তু মাথায় পাগড়ী পরে না বা এদের লম্বা চুল-ও নেই। অর্থাৎ এরা শিখ নয়, পাঞ্জাবী হিন্দু। এতদিন ভাবতাম পাঞ্জাবী মানেই শিখ। একটা দারুণ ভ্রান্ত ধারণা দূর হলো। ওখানে থাকাকালীন একদিন এক পাঞ্জাবী হিন্দু যুবক দলের সঙ্গে হৃষীকেশ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে পদব্রজে বেড়িয়ে এলাম।

সকালবেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরছিলাম। আট-দশজন যুবকের একটি দল কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। উপযাচক হয়ে এগিয়ে গিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলাম ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই উত্তর এলো, "হৃষীকেশ দর্শন করতে।" তাদের সঙ্গী হতে পারি কিনা জানতে চাইলে, তারা সানন্দে সম্মতি জানালো। আলাপে সালাপে জানতে পারলাম, তারা জলন্ধরের অধিবাসী। সবাই ছাত্র; কলেজ এখন ছুটি, তাই একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার পরিচয় শুধু কলকাতার একজন বাঙালী—এই পর্য্যন্তই দিয়েছিলাম।

ওদের সঙ্গে হৃষীকেশ, লছমনঝুলা, স্বর্গাশ্রম ইত্যাদি দেখে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে সন্ধ্যানাগাদ আবার হরিদ্বারে ফিরে আসি। পঞ্চাশ বছরের-ও আগেকার কথা। ঐসব অঞ্চল তখন খুব জনাকীর্ণ ছিল না। লছমনঝুলা পার হয়ে স্বর্গাশ্রমে যাবার রাস্তাটি খুবই মনোরম মনে হয়েছিল। একদিকে সু-উচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে খুব নীচুতে কল্লোলিনী গঙ্গা। রাস্তার ধারে লতা-গুল্মাচ্ছাদিত স্থানের মাঝে একটু দূরে দূরে অবস্থিত এক একটি গুমটি মতন ঘর। সাধু-সন্ন্যাসীরা ইচ্ছামত থেকে এখানে ধ্যান ধারণা করতে পারেন। কালী-কমলি-ওয়ালার সত্র থেকে এঁদের আহার্য্য সরবরাহ করা হয়। অধিকাংশ ঘরই খালি মনে হলো। দু'একটিতে কোন সাধু-পুরুষ রয়েছেন।

যতক্ষণ ঐ পাঞ্জাবী যাত্রীদলের সঙ্গে ছিলাম, ওরা আমাকে একেবারে আপনার জন করে নিয়েছিল। আমি ত খালি হাত-পায়ে গিয়েছি। হৃষীকেশের গঙ্গায় স্নান করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু, ওরা আমাকে ওদের ধুতি, গামছা ইত্যাদি দিয়ে স্নান করতে বাধ্য করাল। বোধ হয় মনে করেছিল, ওসব আমি আনিনি, বলেই স্নান করতে চাইছি না।

হোটেলে একসঙ্গে সবাই খেলাম। মেঝেতে আসনে বসে, খাবার থালা জল-চৌকির উপর রেখে তন্দুরের রুটি, ডাল ও একাধিক সব্জী সহকারে বেশ ভালই খাওয়া হলো। দই-এর ব্যবস্থা-ও ছিল। খাওয়ার পর আমার আহার্য্যের মূল্য আমি হোটেল-ওয়ালাকে দিতে গেলাম। ওদের দলপতি আমাকে একটু ধমকের স্বরেই বললো, "খবরদার, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছ, পকেট থেকে একটা পয়সাও বের করবে না। চা খাওয়া, খেয়া-পারানি সব খরচ ওরাই বহন করেছে। এই সব পথের সাথীদের আন্ত-রিকতা কি ভোলা যায়?

পাঞ্জাব সেবাদলের আশ্রয়ে যখন ছিলাম, সেই সময় হরিদ্বারের রাস্তায় একদিন মহিলাদের এক প্রকাণ্ড মিছিল বের হয়। বিদেশী বর্জনের প্রচার এবং সত্যাগ্রহ ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহই ছিল উদ্দেশ্য। সে অঞ্চলে এই প্রকার মহিলা-মিছিল বোধ হয়, বড় একটা

হয় না। রাস্তার দু'ধারে লোক ভেঙে পড়েছিল। আমিও গিয়েছিলাম দেখতে। পুরোভাগে ডকলি-হাতে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আমাদের আশ্রমের মাতাজীকে দেখে আনন্দ হলো।

আবার আশ্রমে এসেছি। একদিন আশ্রম থেকে বেরিয়ে জালাপুর বাজারের দিকে যাচ্ছি। রেলপুল পার হয়ে দেখলাম, আশ্রমের পিতাজী একটু আগে আগে ঐ রাস্তায়-ই চলেছেন। এই পিতাজীকে কিন্তু আশ্রমের ভিতর কচিৎ কোনদিন দেখতে পেয়েছি। আলাপত কোনদিনই হয়নি। হয়, তিনি ঘরের ভিতর ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠেই সময় কাটান, অথবা শিব-মন্দিরের ভিতর ধ্যান ধারণা নিয়েই থাকেন। বলিষ্ঠ দেহ। অর্দ্ধ-পক্ক লম্বা চুল ও গোঁফ দাড়ি জানিয়ে দিচ্ছে যে. বৃদ্ধত্বের প্রথম সোপানে পা' দিয়েছেন। শুভ্র ধুতি ও চাদরে বেশ সৌম্য-দর্শন।

কাঠের খড়ম পায়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন দেখে আমি একটু পা' চালিয়ে তাঁর সন্নিহিত হলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি চলবার পর তিনি নিখুঁত ইংরেজীতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "বাবু, তুমি কি কোন ফেরারী বিপ্লবী ?"

শুনে আমি থ'মেরে গেলাম আমার ধারণা ছিল, আশ্রমের এই পিতাজী ও মাতাজী কোন ধর্ম্ম-পরায়ন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের লোক। বৃদ্ধ-বয়সে তীর্থবাসী হয়েছেন। কিন্তু, এই আশ্রমবাসীর মুখে এমন সুন্দর ইংরেজী শুনবো ভাবি নাই। প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, যিনি এতটা জেনেছেন. তাঁর নিকট কিছুই লুকান চলে না। অকপটে স্বীকার করলাম যে, তাঁর অনুমান ঠিক। কলকাতায় পুলিশের নজর এড়িয়ে আর থাকা যাচ্ছিল না বলে, এখানে এসেছি।

তিনি বললেন, "দেখ, আমাদের মন্দিরে যে পূজা করে, সেই পুরোহিত ছোকরার কাছে তুমি এসব সম্বন্ধে কিছু বলেছ কি ?"

আমি বললাম, "দেখুন, ঐ ছেলেটি আমার সঙ্গে খুব মেশামেশি করে। অনেক সব গল্প করে। তার দেহাতি হিন্দী ভাষা আমি কতক বুঝি. অধিকাংশই বুঝি না; আন্দাজে সায় দিয়ে যাই। এতেই হয়ত, কোন বিপত্তি ঘটেছে। না হলে, একজন অপরিচিতকে এই সব সম্বন্ধে শুধু শুধু বলতে যাবো কেন ?

"শোন, ওর সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকবে। আর পারত সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাবে। ওকে আমরা পুলিশের 'স্পাই' বলে সন্দেহ করি।"

একটু থেমে বললেন, "দেখ, তোমাকে আমি এমন জায়গায় রেখে দিতে পারি

যে, পুলিশ সারা জীবন খুঁজেও তোমায় বের করতে পারবে না। অতি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর জায়গা। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গঙ্গা কল্ কল্ করে বয়ে যাচ্ছে—কাংড়া উপত্যকার এমনি এক স্থানে। তুমি রাজী থাক'ত বল ; তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

খুব নম্র ভাবে বললাম, "একটু ভেবে দেখি। পরে আপনাকে জানাবো।"

ভাববার অবশ্য কিছু ছিল না। আমার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে নিরাপদ শান্ত জীবন যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি। এসেছি, সাময়িক একটু আশ্রয় লাভের জন্য। দু'দিন পর আমাকে ত কলকাতায় ফিরতেই হবে—তা' সে যতই বিপদ-সঙ্কুল হোক। তবে, একথা এখনই এই স্নেহ-পরায়ণ বৃদ্ধকে বলে লাভ কি ?

পরে জেনেছিলাম, এই পিতাজী একজন বড় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ; 'রইস্'-জাতীয় লোক। চাকরী থেকে অবসর নেবার পর, ছেলেদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে, সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। মাসিক পেন্সন পান ; ছেলেরাও সাহায্য করে। তাইতে, স্বচ্ছন্দে এখানকার খরচ চলে যায়। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একজন সমর্থক। জয়দেব ও দেবশর্ম্মা ছাড়া-ও সত্যাগ্রহ ক্যাম্পের প্রায় সব স্বেচ্ছাসেবকেরই খাবারের ব্যবস্থা তাঁর আশ্রমেই করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ গম ও আলু প্রভৃতি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা দেবশর্মাজী করে থাকেন।

হরিদ্বারে এমনি বাণপ্রস্থ আশ্রম আরো আছে। জালাপুরে একটি বাণপ্রস্থ আশ্রম আছে, যেখানে শুধু পুরুষেরাই থাকেন। জয়দেব একদিন সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। রেলষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। একটি দোতলা বিল্ডিং; আশ্রমবাসীরা 'মেস', 'বোর্ডিং'-এর মত ব্যবস্থা করে সেখানে থাকেন। কেউ কেউ আলাদা রান্না করেও খান। কয়েক-জনের সঙ্গে আলাপ হলো।

একদিন জয়দেব ও আমি দেবশর্মার তাঁবুতে তাঁর কাছেই বসে আছি। শর্ম্মাজী জয়দেবকে বললেন, "একবার বাবুজীকে দেরাদুন থেকে ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর না ? হরিদ্বার পর্য্যন্ত এসে দেরাদুন দেখবেন না, এটা কেমন হয় ? সম্ভব হলে মুসৌরী পর্য্যন্ত যাবেন।"

সেদিনই বিকেলের ট্রেনে দেরাদুন যাবার ব্যবস্থা হলো। পঃ দেবশর্ম্মার চিঠি নিয়ে দেরাদুনের বড়বাজারে রামলাল স্রফের সোনারূপার দোকানে যখন পৌঁছালাম, তখন প্রায় সন্ধ্যে। রামলালজী দোকানে নেই। কর্মচারীরা জানালো—সহরে আজ কংগ্রেস-কমিটির ডাকে এক জনসভার অনুষ্ঠান হচ্ছে। রামলালজী সেই সভায় গিয়েছেন। কং-গ্রেসের তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। বললাম হরিদ্বার থেকে পঃ দেবশর্ম্মার একখানা

চিঠি নিয়ে এসেছি—এই খবরটা অন্ততঃ সভাস্থলেই তাঁকে জানাবার ব্যবস্থা করতে। একজন সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। আমি দোকানে বসে রইলাম।

অল্পক্ষণ পরেই রামলাল এলেন। সভা-ও তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেবশর্মার চিঠি পড়ে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দোকান থেকে তাঁর বাড়ী খুব কাছে নয়। সেখানে যখন পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। ছোট একতলা বাড়ী। আমাকে বাইরের একটি ঘরে বসিয়ে রেখে, রামলাল ভিতরে গেলেন। একটু পরেই আমার সম-বয়সী একটি ছেলে এলো। রামলালের ছোটভাই লছ্‌মন। লছ্‌মন রুবকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে, ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল।

রাত্রে খেতে বসে জালাপুর আশ্রমের সেই প্রথম দিনের পুনরাভিনয়। উনুনের নিকট বসে সদ্য-ভাজা মোটাকুটি সুগন্ধি খাঁটি গাওয়া ঘি সহযোগে ঘন দাল ও তরকারী দিয়ে ভোজন পরম তৃপ্তিদায়ক মনে হলো। এবার রাধুনী ও পরিবেশন-কারিনী এক তন্বী, গৌরী, সপ্তদশী তরুনী। দেখতে যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রতিমা। রাম-লক্ষ্মণের ছোট বোন।

একখানা রুটি খাওয়ার পর যখন আর নিতে অনিচ্ছা জানালাম, ওরা ত অত্যন্ত ক্ষুন্ন। রামলাল বল্লেন, "আগে জানা থাকলে তোমার জন্য ভাত-ই রান্না হতো। তুমি বাঙালী, ভাতই তোমরা খেয়ে থাক, রুটিতে অভ্যস্ত নও। কাল থেকে তোমার জন্য ভাত হবে।"

আমি যে পরম তৃপ্তি সহকারে এই উপাদেয় ঘৃত-সমন্বিত রুটি খেয়েছি, তা' বললে কি হবে, ওরা ভাবলে ওদের-ই কসুর হয়েছে।

শোবার বেলায় রামলাল বললেন, "ও রা রাত্রে খাটিয়াতে বাইরে ঘুমান, কম্বল মুড়ি দিয়ে। আমার কি তা' সহ্য হবে?" আমি বললাম, "না, না; আমি ঘরেই শোব।"

উঠানে ওদের তিনজনের তিনখানা খাটিয়া পাতা ছিল, দেখলাম। আমার শোবার ব্যবস্থা ঘরেই হলো। মে মাস; গ্রীষ্মকাল। কিন্তু রাত্রে ঘরের ভিতর-ও বেশ শীত। কম্বল গায়ে দিতে হলো।

রামলালের বাড়ীতে দু'ভাই ও এক বোন ভিন্ন আর কাউকে না দেখে একটু কৌতুহল হয়েছিল। লক্ষ্মণের নিকট জানলাম, রামবাবুর স্ত্রী, শিশু-সন্তানসহ কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়েছেন। এ কয়দিন বোনই সংসার দেখছে। তার স্কুল এখন ছুটি।

বাড়ীর অদূরেই 'আর্য্য-কন্যা-পাঠশালা'। মেয়েদের হাইস্কুল। রাম-লক্ষ্মণের বোন এই স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বেশ সুন্দর নতুন বিল্ডিং, পাঁচিল-ঘেরা। স্কুলের এখন ছুটি। আমি ও লক্ষ্মণ এই স্কুলেরই স্নানাগারে স্নান সেরে নিতাম। বাড়ীতে বাথরুম বা কলের জলের ব্যবস্থা না থাকাতে, অতিথির পক্ষে একটু অসুবিধাজনক বলে তাঁরা ভেবেছিলেন। লক্ষ্মণের বোন এসে দারোয়ানকে বলে গেট খুলিয়ে দিয়ে চলে যেত। স্নানাদি সেরে আমরা চলে যাওয়ার পর দারোয়ান আবার গেট বন্ধ করে দিত। পরে জেনেছিলাম, রামলালবাবুই এই 'পাঠশালা'র-ও সেক্রেটারী।

দুপুরে সমারোহ সহকারে ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হলো। দেরাদুনের উৎকৃষ্ট সুগন্ধি চাল, খাঁটি গব্য ঘৃত, অড়হর দাল এবং একাধিক ব্যঞ্জন। দই-ও ছিল। বোধহয় অতিথির সম্মানেই এই আয়োজন।

দুপুরে বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রায় সন্ধ্যে হয়; তবু সেই মিষ্টি শীত কম্বল মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে শুয়ে থাকতেই ভাল লাগছিল। এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে কেউ ঘরে ঢুকলো বুঝতে পারলাম। লক্ষ্মণ এসেছে ভেবে চোখ খুলে চাইলাম।

"রাত্রে কী খাবে?"—দেখি লক্ষ্মণের বোন আমায় জিজ্ঞেস করছে।

"কেন, তোমরা যা' খাও, তাই খাবো"—উত্তর দিলাম।

"তুমি যে আবার রুটি খেতে ভালবাস না, 'চাওল' রান্না করবো?"

"না, না। রুটি খেতে আমি খুব ভালবাসি; বিশেষ করে তোমাদের এখানকার রান্না করা রুটি। আমাদের দেশে ত এভাবে রুটি বানাতে জানেনা।"

মেয়েটি চলে গেল। এই সহজ সরল ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগলো।

একটু পরে লক্ষ্মণ এলো। কোথাও বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার পর দুজনে বেড়াতে বেরোলাম। সাহেবপাড়ার (ইউরোপীয়ান্ কোয়ার্টারস্) দিকে গেলাম। কী সুন্দর ছবির মত জায়গা! সাপের পিঠের মত মসৃণ, কালো, পিচের রাস্তা, পাশে ইউ-কেলিপ্টাস্ ও পাইন গাছের সারি। সদ্য নির্মোক-মুক্ত ইউকেলিপ্টাস্ গাছের কাণ্ড-গুলি মনে হচ্ছিল, সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান। প্রতিটি বাংলো-বাড়ী নানারঙের ফুলে ভরা লতা-গুল্মে সুসজ্জিত। বিজলী বাতির আলোতে সব ঝলমল করছে। দেশীয় লোক-অধ্যুষিত অঞ্চলের সঙ্গে কী নিদারুণ পার্থক্য।

ব্রিটিশ আমলে প্রতিটি বড় শহরেই এমনি করে একটি 'ইউরোপীয়ান্ কোয়ার্টারস্'-এর অস্তিত্ব ছিল। শাসক ও শাসিতের পার্থক্য প্রতিনিয়ত নির্ম্মমভাবে

বুঝিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় এইসব ইন্দ্রপুরী নির্মিত হতো।

লছমন একদিন এক মনোরম স্থানে বেড়াতে নিয়ে গেল। শহরের প্রান্তে একটি পাহাড়ী নদীর বেশ প্রশস্ত খাত (বেড্)। এখন একেবারে জলশূন্য। বর্ষায় নাকি তীব্র-স্রোতা নির্ঝরিণীতে পরিণত হয়। অপর পারে সবুজ অরণ্যচ্ছাদিত শৈবালিক পর্বত শ্রেণী। নদীর শুকনো খাত দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত হেঁটে গেলাম। ভারি সুন্দর লাগলো।

মুসৌরী যাওয়ার কথা-ও একদিন হলো। কিন্তু, আমার কোন শীত বস্ত্র না থাকায় সে চিন্তা পরিত্যাগ করলাম।

ক্রমে দেরাদুন প্রবাস শেষ হলো। ঘুরে ফিরে আবার সেই জালাপুর আশ্রম। একদিন দুপুরের খাওয়া সেরে গঙ্গার খালে থালা মেজে উপরে উঠে আসছি, দেখলাম সু-উচ্চ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন গৈরিক বসন-ধারী, দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত এক সন্ন্যাসী। এ অঞ্চলে এইরূপ সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব বিরল কোন ঘটনা নয়। আমি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে পাশ কাটিয়ে আশ্রমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। সাধুর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

"কলকাতা থেকে কবে এসেছেন?"

একটু বিস্ময় জড়ানো চোখে সাধুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনি ত সুন্দর বাংলা বলতে পারেন।"

"আমি বাঙালী-ই; আমার নাম সীতানাথ দে"—সাধু উত্তর দিলেন।

অনুশীলন সমিতির সীতানাথ দের নাম জানতাম। উনি বললেন, আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়-ও নাকি পূর্ব্বে হয়েছে। ১৯২১ সালে কলেজ ছাড়ার পর আমি কিছুদিন ফরিদপুর জেলার বিলাসখান গ্রামে অনুশীলনের অন্যতম নেতা আশুকাহিলীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। তখন জীবন গুহঠাকুরতা, রাইমোহন সেন প্রমুখ অনেক বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। সীতানাথ দে তাঁদের অন্যতম।

সাধু আমায় বললেন, "থালা রেখে আসুন; অনেক কথা আছে।"

শিব-মন্দিরের পাশে, জনবিরল রাস্তার ধারে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুজনে কথা হলো। সাধু বললেন—"হরিদ্বারে একটি চায়ের দোকানে বসে শুনলাম। কয়েকজন যুবক নিজেদের ভিতর আলাপ করছে। আলাপের বিষয় কলকাতা থেকে আগত একজন ফেরারী বিপ্লবী। তিনি নাকি জালাপুরে আছেন এবং ঐ যুবকদের সঙ্গে

একদিন কথাও বলেছেন। শুনে, এখানে এসে জয়দেবের কাছে আপনার সন্ধান পেলাম। আপনার এখানে আর একদণ্ড-ও থাকা চলবে না। চায়ের দোকানে যখন কথাটা আলোচনা হচ্ছে, তখন পুলিশের কানে যেতে কতক্ষণ?"

সাধুর কথা শুনে মনে পড়লো—পাঞ্জাব সেবাদলের ওখানে থাকাকালীন ওখানকার একজন স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে একটি চায়ের দোকানে প্রায়ই চা' খেতে যেতাম। সেখানে কয়েকজন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে অহিংস আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। তাই থেকেই, মনে হয় এই বিপত্তির উদ্ভব।

জয়দেবকে বলে তখনই সীতানাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করলাম। জিনিসপত্রগুলি অবশ্য সঙ্গে নিলাম না।

হরিদ্বারে আমরা বাইরে থেকে যারা যাই, বড় রাস্তাগুলির সঙ্গেই পরিচিত হই; বড় বড় আশ্রম, মন্দির, গঙ্গারঘাট ইত্যাদি পরিদর্শন করি। কিন্তু, ভিতরে-ও যে সুন্দর ছোট ছোট বাড়ী, মন্দির, আশ্রম ইত্যাদি আছে; তার বড় খোঁজ রাখি না। এমনি একটি ছোট্ট আশ্রমে সীতানাথ ব্রহ্মচারী আমায় নিয়ে গেলেন। বাড়ীটি পাকা নয়, কিন্তু তার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নিকান' উঠান, সুন্দর ছোট ফুলের বাগান, ছায়াময় স্নিগ্ধ শীতল আঙিনা মনে একটা শান্তভাব আনয়ন করে। কোথা দিয়ে কী করে যে এত ভিতরে ঢুকলাম, বুঝতেই পারলাম না। বাইরের কোন কোলাহল এখানে প্রবেশ করে না; কোন প্রকার ভক্ত বা যাত্রী সমাগমের বালাই নেই। এবার এখানেই হলো নতুন আস্তানা। দিন দুই বোধহয়, ছিলাম। এর মধ্যেই আবার একদিন রাত্রে এক 'রহিসে'র বাড়ীতে ভোজন। সীতানাথ ব্রহ্মচারীর একজন ভক্ত।

দু'জনে মিলে পরামর্শ হয়ে ঠিক হলো—এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। সীতানাথবাবু বোধহয়, বছরখানেক এই কপট সন্ন্যাসী জীবনযাপন করে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আবার বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য হাঁসফাঁস করছিলেন। আমার ত কথাই নেই। আমাদের শিশু "ইয়ং কম্‌রেড্‌স্‌ লীগ" সংগঠনের কী যে অবস্থা—কে বাইরে আছে, কে নেই এইসব জানবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত ছিল। সীতানাথবাবু বললেন, "চলুন, এবার ফিরে যাই।"

বললাম, "ফিরে ত যাবোই; কিন্তু দু'জন ত এক হেঁসেলে উঠ্‌ছি না।"

"তা' জানি, 'রিভোল্ট'-ত? কিন্তু 'রিভোল্ট'-ই হোন, আর যা'-ই হোন, মূল সেই একই 'অনুশীলন'। এবার গিয়ে দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।"

আমি আর তাঁর ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা করলাম না।

ঠিক হলো, রাত আটটা নাগাদ জ্বালাপুর ষ্টেশনে উভয়ে ট্রেনে উঠ্‌বো। আমি আমার জিনিসপত্রসহ সন্ধ্যাবেলায়ই জ্বালাপুর ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবো। সীতানাথবাবু কিছু পরে সেখানে উপস্থিত হবেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আমি জ্বালাপুরে ফিরে এসে আমার সুটকেস্ নিয়ে ষ্টেশনে হাজির হলাম। জয়দেব ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়নি। সেটা যুক্তি-যুক্ত-ও হতো না।

রাত সাতটা নাগাদ গৈরিক বসনধারী সীতানাথ ব্রহ্মচারী এসে ওয়েটিং রুমে আমার পাশে হাজির। তাঁর ঝোলাঝুলি আমার কাছে রেখে একটি পোটলা নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, "এক্ষুনি আসছি।"

খানিক পরেই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত দীর্ঘ কেশ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-মণ্ডিত নববেশধারী সাধুর আবির্ভাব। বল্‌লেন, "পাশের ঐ জঙ্গলকে আমার গৈরিক আবাস উপহার দিয়ে এলাম।"

এলাহাবাদের টিকেট কাটা হলো। আমি সেখানে আমার আত্মীয় বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে গোপন সূত্রে কলকাতার খবর জেনে, পরে সেখানে যাবো ঠিক করলাম। সীতানাথবাবু-ও দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সযত্ন-লালিত মস্তক ও মুখমণ্ডলের দীর্ঘ কেশরাশি প্রয়াগ-সঙ্গমে উৎসর্গীকৃত করে দেশের ছেলে দেশে ফিরবেন।

*   *   *   *

ট্রেন যখন গঙ্গার খালের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলাম, সেই শিব-মন্দির, ভাঙা পাঁচিল, পাঁচিলের ধারের হলদে কলকে ফুলের গাছটির দিকে। চাঁদের আবছা আলোকে উদ্ভাসিত তাদের মায়াময় রূপ আমার অন্তর-বীণায় ঝংকৃত করে তুললো কবির চির-মনোহর রাগিনী—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই ;
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"



মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়

সরোজিনী নাইডু'র ছোট বোন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের একটি মেয়েদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তার সঙ্গে একবার একটি বাক-সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে হয়েছিল। ঘটনাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

সময়টা বোধ হয় ১৯৩০ সালের জুলাই বা আগষ্ট (সঠিক সময় নির্দ্ধারণ এখন করা আর সম্ভব নয়)। আমি তখন ওয়েলেসলি স্কোয়ারের কাছে একটি সরু গলির (ওয়েলেসলি বাই লেন নং ১) ভিতরে এক খানসামা বস্তিতে খোলার ঘরে পলাতক জীবন যাপন করছি। পার্টির লোকেরা খুব সন্তর্পনে এসে দেখা করে। আমিও যথেষ্ট সতর্কতার সহিত বাইরে যাই।

একদিন একজন কমরেড্ একটি বিদেশী ভদ্রলোককে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। তিনি (সেই বিদেশী কমরেড) প্রথমেই আমাকে 'কনগ্র্যাচুলেশন' জানালেন, কিশোরগঞ্জের কৃষক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে। সেখানকার কৃষকেরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর আমাদের 'ক্যালকাটা কমিটির' দু'জন কমরেড্ যেন অবিলম্বে বোম্বাই গিয়ে সুহাসিনী ও এস, ডি, দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা করি, এই নির্দ্দেশ দিলেন। জানালেন যে. তিনি বোম্বে থেকেই আসছেন। কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর উভয়ে বিদায় নিলেন।

পরে জেনেছিলাম, এই বিদেশী কমরেড্ 'থার্ড ইন্টার ন্যাশনেল' থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, ভারতের কম্যুনিষ্ট-পার্টি সংগঠনের ব্যাপারে। ঐ সময় মীরাট কন্‌স্পিরেসি কেস্ চলছিল। বাংলার কম্যুনিষ্ট নেতারা প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ। 'ইয়ং কম্‌রেড্‌স্ লীগে'র-ও অনেকেই বন্দী। আমরা যে কয়জন বাইরে ছিলাম, ভিটেতে কোন রকমে সল্‌তে জ্বালিয়ে রাখছিলাম।

আমি ও আরেকজন কম্‌রেড্ (পরে দলত্যাগী) যথাসময়ে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত ক্রফোর্ড মার্কেটের বিপরীত দিকে 'ওরিয়েন্ট' নামক একটি হোটেলে (**Hotel Orient**) উঠে, একখানি দু'শয্যা-বিশিষ্ট কামরা ভাড়া নিলাম। এখানেই খবরের কাগজ থেকে প্রথম জানতে পারলাম, একদিন

পূর্ব্বে বোম্বাই শহরে ব্যাপক পুলিশি তল্লাসী হয়ে গেছে, একজন বিদেশী কম্যুনিষ্ট 'চর'-কে ধরবার জন্য। [এটা মনে রাখা দরকার যে ব্রিটিশ ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন তখন বে আইনী ছিল।] আগে এ খবর জানতে পারিনি, কারণ, ট্রেনে খবরের কাগজ কিনে পড়া হয়নি।

আমাদের বোম্বে পেঁছাবার প্রাক্কালে পুলিশের এই অভিযান আমাদের পূর্ব্ব-পরিকল্পিত কর্ম্মধারাকে বানচাল করে দিল। যাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, তাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' চলে গেছেন। দিন দুই কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। একটু চিন্তান্বিত হ'লাম।

সুহাসিনীর দিদি মৃণালিনীর নাম জানতাম। তাঁর কাছ থেকে সুহাসিনীর খোঁজ পাওয়া যাবে মনে করে, পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করা সাব্যস্ত করলাম। 'টেলিফোন গাইড' থেকে তাঁর ঠিকানা বের করা হ'লো। ফোনে যোগাযোগ সঙ্গত ও নিরাপদ নয় মনে করে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তাঁর উদ্দেশে দু'জনে রওনা হ'লাম। কোর্ট এলাকায় তাঁর কলেজ। পায়ে হেঁটে-ই সেখানে গেলাম। দো-তলায় প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে গিয়ে তাঁর নামাঙ্কিত 'প্লেটে'র পাশে 'ইন্' লেখা দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বাইরে থেকে জানতে চাইলাম, ভিতরে যেতে পারি কিনা।

তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর এলো—'ইয়েস্, কাম ইন্।'

ভিতরে ঢুকে দেখলাম, গৌরাঙ্গী, কৃশকায়া এক মহিলা উচ্চাসনে বসে আছেন। তাঁর আশেপাশে আরো জনাচারি মহিলা উপবিষ্টা। মৃণালিনী দেবীকে, তা' বুঝে নিতে কষ্ট হলো না। অন্যেরা-ও যে ঐ কলেজেরই শিক্ষিকা, তা'ও অনুমান করলাম।

আমাদের বসতে বলে মৃণালিনী তীব্র কণ্ঠে জিগেস করলেন, "কী চাই?"

উত্তর দিলাম, "আমরা সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারেন কি?"

"কী! সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা। আর তার জন্যে আমার কাছে সাহায্য? মনে করেছ, আমি কিছুই বুঝি না?"

বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হলো। খুঁটি-নাটি আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে, প্রায় একতরফা ভাবেই তিনি আমাদের গালিগালাজ দিয়ে গেলেন। আমরা আত্মরক্ষাতেই সচেষ্ট।

একসময় আমার কী একটা কথার উত্তরে মৃণালিনী উচ্চ-গ্রামে স্বর তুলে বললেন—

"দেখ, আমার নাম মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়। মীরাট 'কেসে' সরকারী উকীল ল্যাংফোড জেম্‌স্ এক ঘণ্টা জেরা করেও আমাকে কাবু করতে পারেনি ; আর তুমি ত' ছেলেমানুষ।"

তারপর সুরটা আরেকটু চড়িয়ে হঠাৎ জেরা করলেন—"কোত্থেকে এসেছ তোমরা ?"

আমাদের উপর নির্দেশ ছিল। যদি কেউ এই ধরণের প্রশ্ন করেন, তবে যেন কোলকাতার কথা কখন-ও না বলি ; পুনা থেকে এসেছি, এই হবে আমাদের উত্তর। [বর্তমানের 'পুনে' শহর ব্রিটিশ আমলে 'পুনা' নামে অভিহিত হতো।]

সেই অনুযায়ী উত্তর দিলাম—"পুনা থেকে।"

"পুনা থেকে ? কোন্ ট্রেনে ?"

বিপদে পড়লাম, পুনা থেকে বোম্বেতে কখন কী ট্রেন আসে, কিছুই জানি না। গম্ভীর ভাবে বললাম—

দেখুন, আপনার এত সব জেরার উত্তর দিতে আমি রাজী নই। আমরা অতি সামান্য বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি—আপনার বোনের সঙ্গে আপনি আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন কি না। এর জন্য এত সব জেরা, কথা কাটাকাটির প্রয়োজন হয় না। আপনি এ বিষয়ে অনিচ্ছুক বা অপারগ জানালেই আমরা চলে যাই।"

আমাদের ভিতর যখন এই বাদানুবাদ চলছিল, তখনই একজন একজন করে উপস্থিত শিক্ষিকারা চলে যেতে শুরু করেছিলেন। এইবার বাক্-যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তখন অবশিষ্ট মহিলাটি-ও উঠে গেলেন। ঘরের ভিতর রইলাম, আমরা তিনজন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নাটকীয় পরিবর্ত্তন।

মৃণালিনী দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু ও মিষ্টি গলায় বললেন—"আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছি। তোমরা যথার্থ লোক। কোলকাতা থেকে এসেছ। কিন্তু—" একটু থেমে গিয়ে বললেন—"আরে যাঃ, বাংলা বলতে যে একেবারে ভুলেই গেছি—"

তারপর চেয়ারে পুনরায় বসে বাংলায় বললেন—"প্রথমতঃ তোমরা যেখানটায় বসেছ, সেখান থেকে সরে দেয়ালের পাশে ঐ সোফাটায় বসো। এখানে বসে থাকলে, ঐ দূর রাস্তা থেকে যে-কেউ ইচ্ছা করলে, তোমাদের উপর নজর রাখতে পারবে।"

আমরা সেখানটায় বসেছিলাম, তার সামনেই ছিল সুপ্রশস্ত জানালা। সেই জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যাচ্ছিল—সামনে প্রশস্ত সোজা রাস্তা। ঐ রাস্তা বা রাস্তার পাশের যে-কোন বাড়ী থেকে 'বাইনোকুলার' দিয়ে পুলিশের লোকের পক্ষে এই স্থানটির উপর নজর রাখা সহজ। তাই, তাঁর নির্দ্দেশ মত স্থান পরিবর্ত্তন করলাম। তিনি বলে চললেন—

"কিন্তু, এখানে অন্য যে শিক্ষিকারা ছিলেন, তাঁদের সামনে ত' তোমাদের 'এক্সপোজ' করতে পারি না। তাই, তাঁরা যাতে মনে করেন, তোমরা পুলিশের লোক. সেই জন্যই এই অভিনয় করেছিলাম। কিছু মনে করো না। সুহাসিনীরা সব 'অ্যারেষ্ট' এড়াতে গা' ঢাকা দিয়েছে, জান'ত ?"

"হ্যাঁ, খবরের কাগজ পড়ে' তা' অনুমান করতে পেরেছি।"

"তবে তোমাদের ভয় নেই। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দু'টার সময় সে আসবে। আমরা দু'বোন একসঙ্গেই এখানে 'লাঞ্চ' করবো। তোমরা কবে এসেছ ?"

"দু'দিন ধরে এসে এখানে হোটেলে পড়ে আছি।"

"ওঃ। খুব বিপদে এবং ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে—না ?"

কে বলবে যে এই মমতাময়ী নারীই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমাদের সামনে রন-রঙ্গিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন ?"

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কোলকাতা এবং বাংলাদেশে সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একসময় পিছনের একটি পর্দ্দার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ভিতরে যাও।"

পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই অভ্যর্থনা জানালেন এক শ্যামাঙ্গী, সু-স্বাস্থ্যবতী, প্রিয়দর্শিনী মহিলা। বুঝতে পারলাম। ইনিই সুহাসিনী।

আমাদের চেয়ারে বসিয়ে নিজে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসলেন। উদ্বেগ-মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, বিদেশী কম্‌রেড নিরাপদে আছেন ত' ?"

জানালাম, "তিনি নিরাপদেই আছেন। কলকাতা পুলিশ এখনও তাঁর আগমন টের পায়নি।"

"এখানে জানত' আমাদের গোপন আস্তানাসহ প্রায় সব ঘাঁটি পুলিশ তছনছ করেছে। ভাগ্যিস্ ফরেন কমরেড্ এখান থেকে চলে যাওয়ার পর পুলিশ তাঁকে ধরতে

অভিযান চালিয়েছিল!"

বললাম, "আমরা ত' আগে কিছুই জানতে পারিনি। রাস্তার ট্রেনে খবরের কাগজ কেনা হয়নি। তাই, এই খবর 'মিস্' করেছি। হোটেলে এসে একদিন আগেকার কাগজে এই খবর পড়লাম। তারপর দু'দিন সংযোগ-হারা হয়ে বেশ চিন্তা-গ্রস্ত ছিলাম।

'এ দু'দিন এখানকার ব্যাপার সামলাতেই ব্যস্ত ছিলাম। তাই, তোমাদের খোঁজে লোক পাঠান হয়নি। আজ-ই তোমাদের হোটেলে লোক যাবে ঠিক হয়েছিল। তোমাদের রুম-নাম্বারটা বলে যাও। সাড়ে চারটে নাগাদ একজন কমরেড্ সেখানে যাবে। সে তোমাদের যথাস্থানে নিয়ে যাবে।'

আর দু'চারটা দরকারী কথাবার্ত্তার পর আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হলো।

হোটেলে ফিরে এলাম। যথাসময়ে পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট সংকেত বাক্য উচ্চারণ করে একজন কমরেড্ আমাদের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এস্, ভি, দেশপাণ্ডের সঙ্গে একস্থানে মিলিত হ'লাম।

পার্টি অরগ্যানাইজেশন এবং কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা হলো। আমাদের কমিটি **(Calcutta Committee of the Communist Party of India)** যতদিন প্রভিশনেল থাকবে, ততদিন কেন্দ্রীয় কমিটির একজন প্রতিনিধি কলকাতায় আমাদের কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কমরেড্ সদাশিবন্ এই প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতা যাচ্ছেন। দেশপাণ্ডে আরো কিছুদিন পর কলকাতায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই সময় এ'-ও জানলাম যে আমাদের 'ক্যালকাটা কমিটি'-ও অল্ ইণ্ডিয়া পার্টির ব্রাঞ্চ হিসাবে **A Section of the Third International** রূপে স্বীকৃত।

এইসব এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সম্পন্ন হওয়ার পর হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিনই কলকাতা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন।

অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভাধর সন্তানদের দু'জনের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার মনে রাখার মত বৈ কি!

[পরিশিষ্ট (১) দ্রষ্টব্য]

●

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

১৯৩১ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে খিদিরপুরের একটি পার্কে (নামটা মনে হচ্ছে না) সাদা পোষাক পরিহিত যে পুলিশ-বাহিনীর হাতে ধৃত হই, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য। কলকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশের (এস্, বি) একজন বড কর্তা। পরে দেখেছি 'এস্-বি' অফিসের পরিচালনা-ভার তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল।

সেদিন জগজ্জিৎ সরকার ও তার ছোট ভাই সুজিতের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করেছিলাম ঐ পার্কে সন্ধ্যার পর। ওরা ছাত্রদের ভিতর আমাদের সংগঠকরূপে কাজ করতো। ঠিক সময়েই ওরা এসেছিল এবং আমাদের কথাবার্তা-ও শেষ হয়েছিল। রাত প্রায় সাড়ে আট-টা। উঠি, উঠি মনে করছি, এমন সময় দেখলাম, পার্কের চারদিক থেকে একদল লোক প্রায় বৃত্তাকারে আমাদের ঘিরে ফেলে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। একজন এসে আমাকে জাপটে ধরলো, আরেকজন কোমড হাতড়াতে লাগলো। বোধ হয় কোন আগ্নেয়াস্ত্র পাবার আশা করছিল।

সাহেব পাড়ার ভিতর ছোট্ট পার্ক! বিশেষ লোকজন তখন ছিল না। কাজেই, এক প্রকার লোক-লোচনের অগোচরেই আমরা পুলিশের হাতে বন্দী হ'লাম।

আমাকে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনীর একজন অবিরাম প্রশ্ন করতে লাগলেন, "নাম কী, বলুন, নাম কী, বলুন।"

আমি কৃত্রিম রোষভরে উত্তর দিলাম, "কেন নাম বলবো? কে আপনারা এমন অভদ্র, গুণ্ডার মত আচরণ করছেন? পার্কে বসে আছি, জুলুম করে আমার উপর চড়াও হয়েছেন? এই পার্কে কি রাত আটটার পর বসে থাকার কোন নিষেধ আছে নাকি?"

"নাম বলুন, নইলে থানায় নিয়ে যাবো।"

"থানায় যেতে হয় যাবো, কিন্তু আপনাদের নিকট নাম বলবো কেন?

একবালপুর থানা ওখান থেকে খানিকটা দূরে। রক্ষীবৃন্দ পরিবৃত হয়েও দু' দিক থেকে দুজনের শক্ত হাতে ধৃত হয়ে থানার দিকে চললাম। এই সময়টুকুর ভিতর ঠিক করতে হবে, সঠিক নাম বলবো কি না। স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, ওরা আমার

চেনে না। শুধু সন্দেহবশেই ধরেছে। মিথ্যা নাম বলে ছাড়া পাবো কি? কখনই নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কয়েকমাস আগেকার কথা।

মেটেবুরুজে থাকি। ব্রেথ্‌ওয়েট্ কোম্পানীর মেকানিক জিতেন সান্যালের আশ্রয়ে। রাতে যতদূর সম্ভব চেহারা পরিবর্তন করে কলকাতা গিয়ে নির্দ্দিস্ট কাজকর্ম্ম সেরে গভীর রাতে বাড়ী ফিরি। একদিন দুপুর বেলা জিতেনবাবুর দাদা ভোলানাথ বাবু আমার হাতে একখানি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দিয়ে একটি কলমের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "পড়ুন।"

প্রথমেই হেডিং দেখলাম, "সুধাংশু ভ্রমে সরোজ গ্রেপ্তার।" তারপর বেশ এক কলাম খবর। খবরটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের তরুণ উকীল সরোজ ঘোষ মেটেবুরুজে তাঁর শ্বশুর-বাড়ীতে এসেছিলেন। বিকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন, পুলিশ এসে তাঁকে পাকড়াও করলো। থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কিশোরগঞ্জের সুধাংশু অধিকারী, ফেরারী রাজনৈতিক আসামী।' সরোজবাবু দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে নিজের সঠিক পরিচয় দিতে লাগলেন। কিন্তু পুলিশের নিকট তাঁর বক্তব্য গ্রহণ-যোগ্য হলো না। 'আই-বি'-র লোক এলো ; কিন্তু তারাও কেউ সঠিক বলতে পারলো না, ইনি সুধাংশু অধিকারী কি, না। অবশেষে টেলিগ্রাম পেয়ে ময়মনসিংহের 'ডি, আই, বি'—থেকে লোক এসে যখন বলালা যে, ধৃত ব্যক্তি সুধাংশু অধিকারী নয়, তখন তিনি ছাড়া পেলেন। ইতিমধ্যে বেচারীর তিনদিন হাজতবাস হয়ে গেছে।

খবরটি পড়ে' বুঝলাম, আমি যে মেটেবুরুজে আছি, পুলিশ সেটা টের পেয়েছে এবং কঠোর দৃষ্টি রাখছে। কাজেই কিছুদিনের জন্য মেটেবুরুজ ত্যাগ করে অন্যত্র সরে গেলাম। তবে সে অন্য কাহিনী—এখন থাক্।

মনে মনে বুঝে নিলাম, একবার যখন ধরেছে, তখন মিথ্যে নাম ধাম যাই বলি না কেন, সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চয় না হলে, পুলিশ কখনো ছেড়ে দেবে না। ইতিমধ্যে জগজ্জিৎ, সুজিতকে বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তারা যে আমাকে চেনে, একথা কিছুতেই যেন স্বীকার না করে। পার্কের বেঞ্চে দু'ভাই বসেছিল। কতক্ষণ পর এক অচেনা ভদ্রলোক জায়গা খালি পেয়ে ওখানে এসে বসেছেন—এই হবে তাদের বক্তব্য।

থানায় আসা গেল। গোয়েন্দা-বাহিনীর কর্ত্তা জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (নামটা পরে জেনেছিলাম) ঐ এলাকার ডেপুটি কমিশনারকে ফোন করলেন। 'ডি, সি'-র নামটা মনে হচ্ছে, মিঃ দোহা। আধঘন্টার ভিতরই তিনি এলেন। আমার নাম জিজ্ঞেস

করায় বললাম, "সুধাংশু অধিকারী" গোয়েন্দাদলের ভিতর আনন্দের হৈ-চৈ পড়ে গেল। জগবন্ধুবাবু বলে উঠলেন, "মশাই, বাঁচালেন। নইলে আমাদের আবার সেই হাঙ্গামে পড়তে হতো। হয়ত, ময়মনসিংহ থেকে লোক আনাতে হতো।"

গোয়েন্দাদলের একটি লোক একটু টিপ্পনি কেটে বললো, "সেই ত' নামটা বললেন, কিন্তু আমাদের স্যার যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন কিছুতেই বলতে রাজী হলেন না।"

একটু রাগত: ভাবেই আমি উত্তর দিলাম, "দেখুন, উনি আপনার 'স্যার' হতে পারেন, কিন্তু আমার নিকট একজন সাধারণ ভদ্রলোক ভিন্ন কিছুই নন। যাকে তাকে নাম বলতে যাবো কেন?"

'ডি, সি' সেই গোয়েন্দাটিকে একটু ধমক দিয়ে কোন কথা বলতে বারণ করলেন। ওখানকার করণীয় কাজকর্ম্ম শেষ করে প্রায় সাড়ে এগারটায় গোয়েন্দা-বাহিনী আমাদের নিয়ে রোয়ানা দিল। ওদের সঙ্গে গাড়ী ছিল না। এত রাত্রে ওখানে ট্যাক্সি পাওয়াও দুষ্কর। দু'জন 'এস্-বি'-অফিসার নিজেদের ভিতর পরামর্শ করে বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দু'দিকে দু'জন আমার হাত চেপে ধরে আছে, চারধারে ওদের লোক ঘিরে রয়েছে—এমনি অবস্থায় রাস্তা দিয়ে চলেছি। আমি বললাম, "দেখুন, এ অঞ্চলটা জাহাজী শ্রমিকদের এলাকা। এত রাত্রে এখানে মদ, গাঁজা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বস্তুর আড্ডা জমে। আমাকে এভাবে কয়েকজন লোক পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছে দেখলে ভীড় জমে যাবে। আপনারা-ও মুস্কিলে পড়বেন। আপনাদের এতগুলি সশস্ত্র লোকের হাত থেকে পালাবো—এ প্রশ্নই উঠে না। কাজেই, একটু ভদ্রভাবেই চলুন না।"

কথাটায় কাজ হ'লো। দলপতির ইঙ্গিতে রক্ষীরা আমার হাত ছেড়ে দিল। একদিকে জগবন্ধুবাবু ও অন্যদিকে ফণী সেন (নাম পরে জেনেছি) নামে 'এস্-বি'-র একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর আমার পাশাপাশি চলতে লাগলেন। সামনে পিছনে রক্ষীদল ত আছেই। হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা জায়গায় এলাম, যার অলি-গলি আমার নখ-দর্পণে। রাস্তার পাশেই ডক্-শ্রমিকদের বস্তি। ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে অনেকগুলি গলি গিয়েছে। তার কতকগুলি কানা, কতকগুলি দিয়ে গেলে অন্যধারের বড় রাস্তায় পড়া যায়। আমি ঐ অঞ্চলেই থাকি, এবং দিনে বা রাত্রে যখনই বাইরে যাই, বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে প্রায়শঃই এই অলি-গলি ব্যবহার করি।

একবার ইচ্ছে হলো, একটা ঝটকা মেরে ঐ বস্তির ভিতর ঢুকে পড়ি। আমি ঠিক রাস্তা চিনে বেরিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু অনুসরণকারী গোয়েন্দার দল কানা গলিতে আটকা পড়বে। ওরা অংশ্য গুলি করবে। কিন্তু এই রাত্রে বস্তির আধো অন্ধকার সর্পাকৃতি গলিতে ওদের গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, ওরা "চোর চোর" বলে চেঁচাবে এবং বস্তিবাসীর হাতে ধৃত হয়ে আমাকে আবার এদের খপ্পরেই ফিরে আসতে হবে।

সে রাত্রে আমাকে পার্ক স্ট্রীট থানায় রাখবার ব্যবস্থা হলো। এতক্ষন জগজ্জিৎ ও সুজিত আমার সঙ্গেই ছিল। এইবার আমাদের পৃথক করা হলো। দু'ভাইকে অন্যত্র নিয়ে গেল। আমাকে উপর তলায় একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবার দাবার দেওয়া হলো। পাশেই একটি লোহার খাটিয়ায় শোবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে দেখতে পেলাম। খাওয়া শেষ হতে না হতেই এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত। বললেন, "আমার নাম মোরশেদ। নামটা হয়ত, শুনেছেন। খেয়ে নিন, একটু আলাপ সালাপ করা যাবে।"

মোরশেদের নাম জানতাম। 'এস্-বি'-র ইন্সপেক্টর। শ্রমিক বিভাগ তাঁর এক্তিয়ারে। অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনে যেসব রাজনৈতিক কর্মী যুক্ত. তাঁদের ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিশের যে বিভাগ কাজ করে, ইনি সেই বিভাগের একজন কর্তা। বন্ধু-বান্ধব অনেকের সঙ্গেই মোরশেদ সাহেবের মোলাকাত হয়েছে, ইহা জানতাম।

খাবার সেরে মুখ ধুয়ে এসে বসেছি, মোরশেদ সাহেব পাশেই একখানা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, "আচ্ছা কোথায় থাকতেন, বলুন ত।"

"সেটা ত' আপনাদের বের করার কাজ; আমি বলবো কেন?"

"দেখুন, যে 'এরিয়া' তে থাকতেন, সেটা জানি। গলিটা-ও জানি। কিন্তু নম্বরটা ঠিক জানি না। খুব ছোট্ট একটা নম্বর। বলে ফেলুন না—এক? দুই? তিন? চার?......"

"শুনুন মোরশেদ সাহেব, আমি এখন খুব ক্লান্ত—শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই। আমাকে একটু ঘুমোতে দিন; অনেক রাত হয়েছে।"

"ঠিক আছে। এখন রাত একটা একঘন্টা ঘুমিয়ে নিন। ঠিক দু'টোয় আমি আবার আসবো।"

শয্যার আশ্রয় নিলাম। আর হাজার চিন্তা এসে মস্তিষ্কে ভিড় জমালো।

কার্ত্তিকের জন্যই বেশী চিন্তা হলো। এ পথে সে নতুন, অনভিজ্ঞ। ধরা পড়লে পুলিশি নির্যাতন সহ্য করে অটল থাকা কতটা তার পক্ষে সম্ভব হবে, কে জানে? আর ভাবনা হলো সদাশিবনের জন্যে। প্রধানতঃ আমার সঙ্গেই তার সংযোগ। হঠাৎ আমি নিপাত্তা হয়ে গেলাম। বেচারা মহাবিপদে পড়বে। হয়ত, বোম্বেতেই তাকে ফিরে যেতে হবে। মাত্র কয়েকদিন আগে সদ্য জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হালিম এসে* রাত্রে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সংগঠনের পুনর্বিন্যাস নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য দিন ঠিক করেছিলাম। সব ভেস্তে গেল—

চিন্তার জাল ছিন্ন করে দিয়ে এক পুলিশ অফিসার এসে আবির্ভূত হলেন। খোরশেদ সাহেব নন, অন্য একজন। চেয়ারে বসে তিনি বললেন, "এবার ত বিশ্রাম নিয়েছেন; এখন বলুন ত' কোথায় থাকতেন।

আমি অসম্মতি জানালাম এবং শারীরিক নির্যাতনের প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু, তিনি নীতি-কথা শোনাতে লাগলেন।"

"দেখুন, একের জন্য বহুর কষ্ট ভোগ এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না। আপনাকে যখন আমরা ধরেছি, তখন আপনার বাসস্থান 'সার্চ' করবো-ই। তাই, ঠিকানাটা আপনি বলে দিলে শুধু সেই বাড়ীটাই 'সার্চ' হবে। তা' না হলে সমস্ত অঞ্চলটাই আমরা ঘিরে ফেলে প্রত্যেক বাড়ী সার্চ করবো। তা'তে আপনি যেখানে থাকতেন সে বাড়ী ত সার্চ হবেই, উপরন্তু অনেক নিরীহ লোক উত্যক্ত হবে। সেটা কি আপনি চান?"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা নীতি-গ্রন্থ থেকে অনেক সব উদাহরণ শুনিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে উনি বিদায় হলেন এবং খোরশেদ সাহেবের পুনরাবির্ভাব ঘটলো। কোন প্রকার ভনিতা না করে তিনি বললেন, "দেখুন তিনটে বেজে গেছে। চারটের সময় আমরা পুলিশ-বাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে পড়বো। আপনি বলবেন নম্বরটা? না, সমস্ত অঞ্চলটাকেই আমাদের ঘেরাও করতে হবে? বলুন না, চার নম্বর?"

"দেখুন, দয়া করে আমায় আর বিরক্ত করবেন না। আপনাদের যা খুশী, সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন।"

অবশেষে চারটে, সোয়া চারটে নাগাদ আমাকে নিয়ে একটি গাড়ীতে তোলা হলো। সঙ্গে সাদা পোষাকের একাধিক পুলিশ অফিসার। আর পিছনে লরীবোঝাই

---

*কাটারস্ স্ট্রাইকে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে হালিমের দেড় বৎসর সাজা হয়। সাজা ভোগ করে খুলনা জেল থেকে মুক্ত হয়ে হালিম ঐ সময়ে বাইরে আসে।

পুলিশ বাহিনী।

খিদিরপুরের ভূ-কৈলাশ রোড। রাস্তার পশ্চিমদিকে লোহার রেলিং। রেলিং-এর পর বিস্তীর্ণ খাল। রাজবাড়ীর প্রাচীন গড। আর পূর্ব্বদিকে একটির পর একটি কতকগুলি গলি বের হয়ে পূর্ব্বাভিমুখে চলে গিয়েছে। তারই একটির মুখে এসে পুলিশ-বাহিনী থামলো। গলিটার নাম বোধ হয় ভূ কৈলাশ লেন; আজ আর তা' ঠিক মনে করতে পারছি না। গাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারেরা নামলেন। লরী থেকে পুলিশবাহিনী নেমে, কিছু-সংখ্যক এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো এবং কিছু আমাদের সঙ্গে চললো। ভোরবেলা এই বিরাট পুলিশ-বাহিনীর আবির্ভাব দেখে প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরা কৌতুহল বশে রাস্তার পাবে এসে জমা হতে লাগলো।

গলিটার দু'ধারেই খোলার বাড়ী; বস্তি অঞ্চল। বস্তির বাসিন্দারা নানা কারখানায় ও ডকে কাজ করেন। অধিকাংশই শ্রমিক। দু'একজন মধ্যবিত্ত কেরাণীও আছেন।

আমি যে বাড়ীতে থাকতাম, তার নম্বর হ'লো দুই। বাড়ীর মালিক এক বৃদ্ধা। মুড়ি, মুড়কি, তেলেভাজা ইত্যাদি বিক্রী করেন। বাড়ীটির মাঝখানে একটি ছোট্ট উঠান। চারিদিকে চার-পাঁচখানি খোলার ঘর। পৃথক পৃথক ভাড়াটে বাস করেন।

পুলিশ বাহিনী আমাকে নিয়ে পদযাত্রা শুরু করলো। দু'ধারের সমবেত লোক-দিগকে এবং প্রত্যেক বাড়ীর লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো—"এঁকে চেন?"

চেনা লোক পেতে দেরী হলো না। দু'নম্বর বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়েছিল বাড়ীওয়ালীর নাতি, চৌদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে। জিজ্ঞাসিত হওয়া মাত্র সে উত্তর দিল, "না, তেমন আর চিনি কই?"

আর যায় কোথায়? বেচারী অমনি পুলিশের বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ। ঘরের সন্ধান পেতেও আর অসুবিধে হলো না।

বাড়ীর ছোট্ট উঠানটি পুলিশে ভরে গেল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল, ঐ ঘরে কার্ত্তিক দাস নামে ব্রেথওয়েট কোম্পানীর একজন শ্রমিক ভাড়া থাকে। আমি আত্মীয় পরিচয়ে কার্ত্তিকের ঘরে মাঝে মাঝে এসে থাকি। কার্ত্তিক ভোরে উঠে কাজে চলে গেছে। ঘর তালা বন্ধ। তালা ভেঙ্গে যথারীতি তল্লাসী শুরু হলো। আর এদিকে ব্রেথওয়েটের ম্যানেজারের নিকট গোয়েন্দা-পুলিশ অফিসারের চিঠি নিয়ে কয়েকজন সিপাই ছুটলো কার্ত্তিককে ধরে আনতে।

পূর্ণোদ্যমে তল্লাশী চলতে লাগলো। ছোট্ট ঘর ; একই ঘরে থাকা ও রান্না হয়। কালি ও ঝুলে ঘর ভরতি—বিশেষ করে চাটাইয়ের সিলিংটা। কোন অস্ত্রাদির সন্ধান পাবার আশায়-ই হয়ত, সিলিং-এর উপরটাই ভাল করে দেখা হলো। তল্লাসকারী ইউ-রোপীয় সার্জেন্টটি যখন কাজ সেরে বেরিয়ে এলো, তখন কালি ঝুলে মাখা তার চেহারাটি একটি সার্কাসের ক্লাউনের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তল্লাসীতে গুরুত্বপূর্ণ যা' বের হলো, তা' হলো এক বাণ্ডিল ছাপা ইস্তাহার। "ক্যালকাটা কমিটি অব দ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (প্রভিশন্যাল)—এ সেক্‌শান অব্ দ্য কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশনেল'—কর্তৃক প্রকাশিত। বাণ্ডিলটি মাত্র আগেরদিন পেয়ে-ছিলাম, খোলা পর্য্যন্ত হয়নি। ইংরেজী-জানা এক কেরাণী ভদ্রলোক ওখানকারই একটি ঘরে ভাড়া থাকেন। 'সার্চ-উইটনেস্' হিসাবে থাকার জন্য পুলিশ তাঁকে অফিসে যেতে দেয়নি। তিনি এই ইস্তাহার দেখে বলে উঠ্‌লেন, "আমরা ভেবেছিলাম, স্মাগলিং-এর কোন ব্যাপার। কারণ, এ অঞ্চলে এটাই সচরাচর ঘটে থাকে। চরস, ভাঙ্, গাঁজা প্রভৃতি ধরা পড়ে। এখন এ যে দেখছি, কেঁচোর বদলে একেবারে সাপের গর্ত্তে হানা।"

এতক্ষণে—প্রায় এগারটা তখন—ব্রেথওয়েট কোম্পানী থেকে পুলিশের দল ফিরে এসে জানালো কার্ত্তিককে পাওয়া গেল না। হাজিরা খাতায় তার উপস্থিতি দেখান রয়েছে, কিন্তু সমস্ত ডিপার্টমেন্ট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হদিশ মিললো না। শুনে, আমার বুকের একটা গুরুভার নেমে গেল।

এইবার 'এস-বি' অফিস। জগদ্বন্ধুবাবুর জিম্মায় আমাকে দেওয়া হলো। থানা তল্লাসীতে প্রাপ্ত জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কী, তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, 'এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? অনুসন্ধানে আপনারা জানতে পেরেছেন, এ ঘরের আসল বাসিন্দা আমি নই ; আমি মাঝে মাঝে এসে থাকতাম মাত্র।"

"ও, আপনি কার্ত্তিককে ফাঁসাতে চান, দেখছি।"

"দেখুন, কাউকে ফাঁসাবার কথা এখানে আস্‌ছে না। মনে করুন, আপনার বাড়ীতেই যদি কোনদিন কেউ অতিথি হিসাবে আসে, আর এদিকে পুলিশ আপনার বাড়ী থেকে আপত্তিকর কোন কিছু উদ্ধার করে, তবে অন্য প্রমাণাভাবে, তার দায়িত্ব কি সেই অতিথির উপর বর্ত্তাবে, না আপনার উপর?"

জগৎবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বনবিহারী মুখার্জি 'এস্-বি'-র দুই নম্বর স্পেশ্যাল সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট (S S. II)।

তাঁর উপর নামে মাত্র একজন ইউরোপীয় অফিসার (S.S.I.) থাকলে-ও 'এস্‌-বি'-র প্রকৃত কর্ত্তা উনি-ই। বনবিহারীবাবুর নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। জগদ্বন্ধু-বাবুই নিয়ে গেলেন। আমার নাম এবং আগের দিন রাত্রে ধরা পড়েছি, এই কথা জগৎ বাবু তাঁকে জানালেন। শুনে, মেদ-বহুল বিশাল-দেহ ভদ্রলোকটি রিভল্‌ভিং চেয়ারে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঘুরতে গিয়ে, দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে চেয়ার-শুদ্ধ প্রায় উল্টে যেতে যেতে কোন প্রকারে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—"আরে এযে দেখ্‌ছি ডাকাতদের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যাও, নিয়ে যাও।" আমার সঙ্গে কোন কথা বলার-ও প্রয়োজন মনে করলেন না।

তারপর গেলাম, 'এস্‌-এস-I'-এর সঙ্গে দেখা করতে। সাহেবের নামটা মনে নেই। সাহেব আমাকে বসালেন দেখে, জগৎবাবু সরে গেলেন। সাহেব অনেকক্ষণ নানা কথা বার্ত্তা বললেন। আমাকে বোঝাতে চাইলেন, রাজনীতিক ডাকাতি কত নীচু স্তরে নেমে গেছে। 'এই পলিটিক্যাল ডাকাতরা এখন নিজের স্বার্থে ডাকাতি করছে। এই ত' সেদিন কৃষ্ণনগরে অজিত মৈত্র এইভাবে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। সেত' একজন পলিটিক্যাল ম্যান ; গেলবারও ডেটিনিউ ছিল—"

কথার মাঝেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অজিত মৈত্র ধরা পড়েছে ?"

"হ্যাঁ ; পুলিশের হাতে নয়, গ্রামরক্ষীবাহিনীর হাতে। কী লজ্জার কথা।"

যাক্‌—একটা খবর জানা গেল।

সন্ধ্যাবেলা লালবাজার লক্‌-আপে।

পরদিন সকালেই আবার লর্ড সিন্‌হা রোড। সেখান থেকে দশটার ভিতরই দুই এস্‌-বি অফিসার ও একদল কনষ্টেবলসহ প্রিজন্‌ভ্যানে উঠলাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না। জানবার আগ্রহ প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ। পুলিশবাহিনীর ভিতর চুপ্‌চাপ বসে আছি। একজন অফিসারের হাতে একখানা বাংলা খবরের কাগজ ছিল। একটু পড়ার জন্য চাইলাম। বিনা আপত্তিতেই তিনি দিলেন। কাগজে চোখ বুলাচ্ছি, হঠাৎ ছোট একটি খবর নজরে পড়লো। মর্ম্মটি এইরূপ :—"গতকাল রাত্রে খিদিরপুর …পার্কে শিয়ালদহ ষ্টেশন ডাকাতিতে জড়িত সন্দেহে সুধাংশু অধিকারী নামে এক যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

এই মামলায় আমাকে জড়ান হবে, কখনো তা' ভাবিনি। বনবিহারী মুখার্জির কথার ইঙ্গিত এইবার বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কি মশাই, শেষে আমাকে শিয়ালদা' কেসে জড়ালেন ?"

"দিন্, দিন্ কাগজটা দিন্"—বলে আমার হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "এই ছোট্ট খবরটাই আপনার চোখে পড়লো? আমরা ত' এ খবরটা কাগজে এখনো দেখতে পাই নি।"

তখনই জানতে পারলাম, আমাকে ঐ মামলায় অভিযুক্ত করার জন্য কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শিয়ালদা' ডাকাতির ঘটনাটা কী, তা' এখানে বলে নেওয়া যাক্।

শিয়ালদা' সাউথ ষ্টেশনের গুড্‌স্ আফিসে সেদিন যে টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা একটি ব্যাগে করে তা' জমা দেবার জন্য ষ্টেশনের প্রধান আফিসে নিয়ে আসা হচ্ছিল, একজন কেরানী ও দু'জন রক্ষীর তত্ত্বাবধানে। মাঝপথে ষ্টেশনের হাতার ভিতরেই হকি-ষ্টিক ধারী দু'জন যুবক ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। থলেতে পঁচিশ হাজার মত টাকা ছিল। পুলিশের ধারণা এটা পলিটিক্যাল ডাকাতি।

শিয়ালদা' কোর্টে সরকারী উকীলের দফ্‌তরে নিয়ে আমাদের বসান' হলো। আমাদের মানে, আমার সঙ্গে জগজ্জিৎ এবং সুজিত ও ছিল। তবে ও'দের দুভাইকে ওখান থেকেই ছেড়ে দেওয়া হ'লো একটা 'ষ্টেট্‌ম্যান্ট্' নিয়ে। ওদের বাড়ীর লোকজন-ও বোধ হয়, কেউ এসেছিলেন। ওরা চলে যাবার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওরা ছাড়া পাওয়াতে আমার দুশ্চিন্তা আরও লাঘব হ'লো।

সরকারী উকিলের আফিসে ঐ মামলায় অভিযুক্ত আরেকজনের দেখা পেলাম। প্রফুল্ল ব্যানার্জি। মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দলের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। মোটা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। প্রফুল্লবাবুকে নাকি সে-দিনই শিয়ালদা' ষ্টেশনের কাছে রাস্তায় ধরেছে। দেশ থেকে কলকাতায় এসে মাত্র পদার্পন করেছিলেন।

সেই আফিসে আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি লিখে একটি 'ফর্ম' (**form**) পূরণ করা হলো। এই সময় একটি মজার ব্যাপার ঘটে। জাত (**caste**) কী, যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি বল্‌লাম, "আমি 'কাষ্ট' মানি না; আমার কোন 'কাষ্ট' নেই।" যিনি লিখছিলেন, মহাফ্যাসাদে পড়লেন। কলম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে উদ্ধার করলো আমার গার্ড, একজন গোরা সার্জেন্ট। সে বললো, "কিন্তু, তুমি যে পরিবারে জন্মেছ, সেই পরিবারের 'কাষ্ট' কী বল।" তখন বলতে হলো—'ব্রাহ্মণ'।

এরপর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর এলেন আমাদের 'ষ্টেট্‌মেন্ট্' নিতে। প্রথমে প্রফুল্লবাবুর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে, আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন, "বলুন, এই মামলায় আপনাকে যে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনার কী বক্তব্য আছে ?"

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লাম, "কিছু বলবার আগে আমি জানতে চাই, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।"

ততোধিক গাম্ভীর্য্য সহকারে এবং নিজের পদের গুরুত্ব জাহির করে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন (আমাদের কথাবার্ত্তা আগাগোড়াই ইংরেজীতে হচ্ছিল) "আপনি যে মামলায় অভিযুক্ত, আমি সেই মামলার ইন্‌ভেষ্টিগেটিং অফিসার।"

"ধন্যবাদ। তবে আমার যা' বলবার, আমি যথাস্থানে বলবো "

"আপনি তা' হলে কোন 'ষ্টেট্‌মেন্ট্' দিতে অস্বীকার করছেন ?"

"অর্থ বোধ হয়, তা'ই দাঁড়ায়।"

গট্ গট্ করে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমার ধারণা হয়েছিল, এ মামলায় আমাদের শুধু হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবু, একেবারে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। পুলিশ যে মিথ্যা মামলা সাজাতে কত ওস্তাদ তা' সকলেই জানে। তবে কয়েকদিন পর এ আশঙ্কা-ও দূর হয়েছিল নলিনী মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। সে-কথায় পরে আসছি।

শিয়ালদা' কোর্টে আরেকদিন আসতে হয়েছিল সনাক্ত-করণের ব্যাপারে (**identification parade**)। তারপর মামলা চলেছিল আলিপুর কোর্টে। আইডেন্টিফিকেশনে'র ব্যাপারে প্রফুল্লবাবু ও আমাকে কোর্টে নিয়ে আসা হলো। ম্যাজিস্ট্রেটের নামটা মনে হচ্ছে না। একটু শারীরিক প্রতিবন্ধী। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি আমাদের দেখেই একজন কর্ম্মচারীকে ডেকে বললেন, "এঁদের এই চেহারার যথাসম্ভব পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করুন।"

আমাদের জামা কাপড় ছিল ময়লা , ধরা পড়ার পর থেকে সেই একবস্ত্রে আছি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। তৈলাভাবে চুল উস্কো খুস্কো। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দ্দেশে নাপিত এসে আমাদের দাড়ি কামিয়ে দিল। কোর্টের কর্ম্মচারীদের একজন একশিশি তেল এনে দিলেন। তেল মেখে মাথা ধোওয়া হলো। চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ালাম। গায়ের জামা ছেড়ে অন্যের জামা পড়লাম। তারপর জনা পঞ্চাশ লোকের ভিতর আমাদের মিশিয়ে দিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করানো হলো। এইবার সনাক্তকারীদের একে একে ডাকা হলো। কয়েকজনতো কারো দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলো, "নেহি মালুম

হোতা, হুজুর।" একজন বাঙালী ভদ্রলোক প্রত্যেকের মুখের দিকে বার বার ভাল করে লক্ষ্য করলেন। শেষ পর্য্যন্ত বললেন, "না, এদের কেউ নয়।" এক হিন্দুস্তানী প্রফুল্ল বাবুকে দেখিয়ে বললো, "এইসা মালুম হোতা হ্যায়।" ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিয়ে বললেন, "ঠিক সে বলো, হ্যায় কি নেহি।" তখন বললো, "নেহি মালুম হোতা, হুজুর।"

প্যাবেড্ শেষ হলো। জামাকাপড় যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের ফেরৎ দিয়ে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন।

দিন দশেক পুলিশ হেফাজতে ছিলাম। এই কয়দিনের প্রাত্যহিক কাজ ছিল মোটামুটি এইরূপ :—

সকাল বেলা দশটাব ভিতর স্নানাহার সেবে প্রিজন্-ভ্যানে করে লালবাজার থেকে 'ইলিসিযাম রো'-তে এস্ বি অফিসে গমন। সেখানে বিভিন্ন অফিসারের জেরার সম্মুখীন হওযা। কোর্টে মামলার দিন কোর্টে যাওয়া সেই প্রিজন্-ভ্যানে করেই সাদা এবং কালো চামডার সিপাইদের রক্ষণাধীনে। সন্ধ্যায় লালবাজার লক্-আপে প্রত্যাবর্ত্তন।

পরণে যে জামা-কাপড ছিল, তার অতিরিক্ত কিছু না থাকায়, আমি কাক-স্নান করেই স্নান-কার্য্য সেরে নিতাম। কাপড ভিজাতাম না। প্রফুল্লবাবু যিনি এখন আমার সহবন্দী এবং পাশের সেলেই থাকেন, এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি আমায় শিখিয়ে দিলেন, কাপড় কেচে, কীভাবে অর্দ্ধেকখানা পড়ে বাকী অর্দ্ধেক মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। ভোর বেলা উঠেই প্রাতঃকৃত্যাদি এবং স্নান সেরে নিতে হবে। নইলে, শরীব ঠিক থাকবে কেন? তাঁর উপদেশই এরপর থেকে পালন করতাম।

রবিবার দিন কোথাও যেতে হতো না। লালবাজারেই বিশ্রাম। এক রবিবার জামাকাপড সাবান দিয়ে কেচে নিয়েছিলাম। প্রফুল্লবাবুর উদ্যোগেই পুলিশের কাছ থেকে সাবান মিলেছিল।

'এস্-বি'-অফিসে আমার জিম্মাদার ছিলেন জগবন্ধু বাবু। তিনি যে ঘরে বসতেন, সেই ঘরেই তাঁর টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে বসে থাকতাম। তিনি যেদিন যে-অফি-সারের কাছে পাঠাতেন, তার কাছে গিয়ে জেরার সম্মুখীন হতে হতো। তবে সবার কাছেই আমার উত্তর প্রায় একই ছিল—"আমায় মাপ করবেন, এসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পাবেন না।"

একদিন মোরশেদ সাহেব এইরূপ জবাব পেয়ে আমাকে শাসালেন—"এই কল-

কাতা শহরেই অন্ততঃ একটি খুনের ব্যাপারে আমি আপনার চরম শাস্তির ব্যবস্থা করবো।"
[পরিশিষ্ট—২ দ্রষ্টব্য]

বললাম, "বেশ তো, তারই চেষ্টা করুন।"

একদিন জগদ্বন্ধুবাবুকে বললাম, 'অনেকের কাছেই ত পাঠালেন, কিন্তু কই মনি দারোগাকে দেখার সৌভাগ্য ত হলোনা। বাইরে থাকতে তাঁর এত নাম শুনেছি।"

হেসে তিনি উত্তর দিলেন, 'আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তাঁর দেখাও পাবেন।"

মনি দারোগা মানে মনি বোস। 'এস্-বি'-র একজন সাব-ইনস্পেক্টর। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালানো'র জন্য তিনি সে সময় বেশ নাম করেছিলেন।

মনি দারোগার পালাও একদিন এলো। গার্ড আমাকে নিয়ে তার ঘরে গেল। তিনি একাই বসেছিলেন। আমাকে বসতে বললেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ। জানালা দিয়ে কোন এক সাহেবের বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। [ও' পাড়াটায় তখন প্রধানতঃ ইউরোপীয়ানদেরই বাস ছিল।] একরকম গুচ্ছ গুচ্ছ হলদে ফুলে ভরতি লতায় বাড়ীর পোর্টিকো-টা আবৃত ছিল। ঐদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আঃ, কী সুন্দর, দেখছেন।"

আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। আরো খানিকক্ষণ কোন কথা নেই। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, ছোট ভাই কী চাকরি করেন?"

বললাম, "ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।"

"কদ্দিন চাকরী হলো?"

বছর খানেক।"

"আহা বেচারীর চাকরীটা গেল।"

আমি চুপ করেই আছি। তারপর আবার হঠাৎ—"আচ্ছা, ঐ যে ছেলে দু'টো আপনার সঙ্গে ধরা পড়লো ওরা কে?"

আমি বললাম, 'দেখুন, এই প্রশ্ন আমাকে বহুজনে বহুবার করেছেন। আর করে লাভ আছে কি?"

মুহূর্তে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। গার্ডকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে

উঠ্‌লেন—'হ্যাই, কে একে আমার নিকট পাঠিয়েছে? এক্ষুনি নিয়ে যা'।"

গার্ড আমাকে নিয়ে এসে জগৎবাবুর ঘরে বসিয়ে দিল। তাঁকে বল্‌লাম, "কই, আমাকে ত মারধোর করা হলো না।"

জগদ্বন্ধুবাবু বললেন, 'সুধাংশুবাবু, আপনার ভাগ্যটা খুব ভাল। আপনি এমন সময়ে ধরা পড়েছেন, যখন আমাদের সন্ত্রাসের পলিসি পরিবর্তিত হয়ে বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের পলিসি প্রবর্তিত হয়েছে। এ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন কি?"

* * * *

একদিন জগদ্বন্ধুবাবুর টেবিলের সামনে চুপচাপ বসে আছি। তিনি বেরিয়ে গেছেন। টেবিলের উপর একখানা বই দেখে হাতে নিলাম। পুলিশ গেজেট। পাতা উল্টাতেই একটা ছবি নজরে পড়লো। সামনের দিক থেকে এবং পাশ থেকে তোলা এক ব্যক্তির জোড়া ফটো। কে রে বাবা! উপরে লেখা দেখছি, 'Reward Rs 50/-" তার নীচে সুধাংশু অধিকারীর নাম ধাম বিবরণ ইত্যাদি সহ যে ধরে দেবে, তাকে ঐ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা। মনে মনে হাসি পেল। ওই অদ্ভুত ফটো ওরা কোত্থেকে জোগাড় করলো? তখন খেয়াল হলো, ভাগেরবার (১৯২৫ সালে) পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর ময়মনসিংহ ডি আই বি' অফিসে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পজিশনে আমার একাধিক ফটো তুলেছিল। তারই প্রতিলিপি এতে ছাপা হয়েছে। বর্তমান চেহারার সঙ্গে এর প্রচুর পার্থক্য।

জগদ্বন্ধু বাবু ফিরে আসা মাত্র বললাম, "কি মশাই, আমাকে ধরবার জন্য আবার পুরস্কার ঘোষণা করছেন? তা'ও মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আমার ইমেজটাই নষ্ট করে দিলেন।"

'না:, আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। আমাদের টেবিলের কাগজপত্রে হাত দিতে শুরু করেছেন? কক্ষনো এ কাজ করবেন না।"

আরেকদিন ওঁর টেবিলের উপর একখানা ডাকে আসা খাম দেখলাম। বিদেশ থেকে এসেছে মনে হলো। "রামানন্দ চ্যাটার্জি, সম্পাদক—মডার্ণ রিভিয়্যু" এই নাম ও ঠিকানা লেখা। আবার জগৎবাবুকে প্রশ্ন—"আপনারা রামানন্দ চ্যাটার্জির চিঠিও সেন্সর করেন?"

জগদ্বন্ধুবাবু বোধ হয় আমার সরলতায় একটু কৌতুক-ই অনুভব করছেন।

বললেন, "সুধাংশুবাবু, এখানে যতক্ষণ থাকবেন, এইসব কৌতুহল দমন করে রাখবেন।

যেদিন মনি দারোগার কাছে আমায় নিয়ে যায়, সেদিন অন্য একটি ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভিতরে চোখ পড়াতে দেখলাম, মাদারীপুরের পূর্ণদাস একটি বেঞ্চের উপর শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। জগৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "পূর্ণদাসকে য়্যারেস্ট করেছেন?"

"পূর্ণদাসকে চেনেন নাকি?"

"চিনি বই কি?"

"হ্যাঁ, কাল রাতে তিনি গেপ্তার হয়েছেন।"

লালবাজারে গিয়ে প্রফুল্লবাবুকে জানাবার মত এই খবরটা দিলাম।

একদিন কথায় কথায় ঠাট্টাচ্ছলে জগবন্ধু বাবুকে বললাম, "দেখুন ভাগ্যদেবী আপনাদের উপর সুপ্রসন্ন ছিল বলেই সেদিন আমায় ধরতে পেরেছিলেন। ওখানে যে আপনারা 'ওয়াচ' রেখেছেন তা' অনেকদিন থেকেই টের পেয়েছিলাম। গড়িমসি করে বাড়ীটা ছাড়া হয়নি। দ্বিজেন সরকারকে ওখানে মোতায়েন করেছিলেন ত? ভু-কৈলাশ রোডে, খিদিরপুরের মোড়ে একাধিক দিন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

"দ্বিজেন সরকারকে চেনেন নাকি?"

"খুব ভাল করেই চিনি। কিশোরগঞ্জের লোক। আগেরবার ১৯২৫ সালে, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ হোষ্টেলে সে-ইত আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।"

"আচ্ছা, বসুন ; তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু আলাপ করুন"—বলে জগৎবাবু বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই দ্বিজেন সরকার এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলাম, "কি মশাই, আমাকে চেনেন?"

"না ত'।"

"কিশোরগঞ্জের সুধাংশু অধিকারীকে চেনেন? তাকে ধরবার জন্যই ভু-কৈলাস রোডে ওয়াচ দিতেন ত?"

এইবার সে বুঝতে পারলো। একটু থতমত খেয়ে বললো, "দেখুন, আমি হয়ত, দেখেও আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। হাজার হোক, দেশের লোক ত। যাক্—এই কথা

আমার-ওপর-ওয়ালাদের কাছে বলবেন না।”

মনে মনে হাসলাম।

জগৎবাবু একদিন বললেন, “মশাই, কার্ত্তিককে যে কোথায় উধাও করে দিলেন, তাকে কিছুতেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

কথাটা যেন আমার কানে অমৃত বর্ষণ করলো। কারণ, সেদিন যদিও পুলিশ কার্ত্তিককে পায়নি, তবু তাকে ধরবার জন্য যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে, তা' নিশ্চিত জানতাম। আমার বিরুদ্ধে কোন 'কেস' সাজাতে হলে, কার্ত্তিককে না হলে চলবে না। কার্ত্তিকের এই নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা মনে মনে অনুধাবণ করার চেষ্টা করলাম।

সেদিন রাত্রে আমাকে ফিরতে না দেখে কার্ত্তিক নিশ্চয়ই অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিল, কারণ, সে জানত, আমার না ফেরার অর্থ—হয়, পুলিশের হাতে ধরা পড়া, না হয়, কোন কাজে অন্যত্র আটকে পড়া। পূর্ব্বে-ও দু'একদিন এমনি হয়েছে। কোন কাজের জন্য রাত্রে ফিরতে পারিনি। পরদিন ভোরেই ফিরে এসেছি। কার্ত্তিক কাজে গিয়েও আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আমার খোঁজ নিতে একবার বাড়ী এসেছে। এবং আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

এবার-ও ঠিক সেই প্রকার সে হয়ত এসেছিল আমার খোঁজ নিতে এবং পুলিশ বাহিনী-বেষ্টিত বাড়ী দেখে, সব বুঝতে পেরে, সেখান থেকেই অন্তর্ধান করেছে।

বেশ কয়েক বছর পর, ডিটেন্‌শান থেকে মুক্ত হয়ে কার্ত্তিকের খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু, তার সাথীরা-ও কিছুই বলতে পারলো না। সেই যে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে, আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। চলার পথে কত সাথীই যে এমনি হারিয়ে যায়।

পরিশিষ্ট ৩ দ্রঃ

জগৎবাবুর মুখে কার্ত্তিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শুনে সেদিন যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম, তেমনি নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছিলাম আরেকদিন, নলিনী মজুমদারের একটি কথায়। নলিনী মজুমদারের নাম বাংলার বিপ্লবীদের নিকট পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টায় এই লোকটির অবদান অসামান্য। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ বিদেশী শাসক তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দানে পুরস্কৃত করেছিল।

নলিনী মজুমদার আই-বি র দুই নম্বর স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ([illegible])।

আই-বি-র কার্য্যকলাপ প্রকৃত পক্ষে তাঁরই পরিচালনায় চলতো। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য 'আই-বি' ও 'এস্-বি'-র পার্থক্য-টুকু এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গোয়েন্দা-পুলিশের যে বিভাগ শুধু কলকাতা শহরের চৌহদ্দীর ভিতর নিজেদের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে তার নাম হলো 'স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ অব পুলিশ' বা সংক্ষেপে 'এস-বি'। আর কলকাতা শহর বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের দায়িত্ব যার উপর ন্যাস্ত, সেই বিভাগের নাম হলো "ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ' বা সংক্ষেপে 'আই-বি'। এই শেষোক্ত বিভাগের শাখা প্রত্যেক জেলাতেই আছে। তার নাম 'ডিষ্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ" বা সংক্ষিপ্তভাবে 'ডি আই-বি'। বলাবাহুল্য, এস্-বি ও আই বি'র কাজ শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক অপরাধ' নিয়ে। সাধারণ অপরাধ নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের যে বিভাগ কাজ করে তার নাম 'ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' বা সংক্ষেপে 'সি-আই-ডি'।

আমি কলকাতা শহরে ধরা পড়েছি এবং কলকাতা আমার রাজনৈতিক কর্ম-ক্ষেত্র-ও। তাই, আমার জিম্মাদার প্রধানতঃ এস বি। কিন্তু আমার কার্য্য-কলাপ কিশোরগঞ্জে এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্যত্র-ও বিস্তৃত ছিল। তাই, আই বি'র আওতার বাইরেও আমি নই। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের এস-পি এসেছিলেন আমার জবানবন্দী নিতে। একজন আইরিশ সাহেব। নামটা মনে হচ্ছে, মিঃ রে। খুব শাসিয়ে গেছেন। আমি নাকি ময়মনসিংহ জেলায় পঁচিশটি ডাকাতি ও কয়েকটি খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটা কনস্পিরেসী কেস দাঁড় করাবার চেষ্টায় তাঁরা আছেন। কাগজপত্র সব ঠিক হয়ে গেলেই আমাকে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমি শুধু বলেছিলাম, "বেশ ত, ভালই হবে, বাড়ীর কাছে যেতে পারবো।'

পরিশিষ্ট ৪নং দ্রঃ

এরপরই নলিনী মজুমদারের সঙ্গে মোলাকাত। তিনি ত আমার চেহারা দেখেই বলে উঠলেন, 'এ' সুধাংশু অধিকারী? আমি ত মনে মনে এক ষণ্ডা, গুণ্ডা চেহারার লোক ধারণা করে নিয়েছিলাম। এ' যে নিতান্ত নিরীহ দেখতে। এর বিরুদ্ধে এত সব ভয়ঙ্কর রিপোর্ট?"

এ সময় তিনি একটু কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। একজন কর্ম্মচারী বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন আর তিনি প্রত্যেকটি পড়ে' একটি করে সই দিয়ে নীচে ফেলে দিচ্ছিলেন। একবার শুধু মুখ তুলে আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে

উপরোক্ত মন্তব্য করলেন এবং আবার নিজের কাজে মন দিলেন। আমি চুপ করে সামনে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমার এই আজন্ম রুগ্ন, ক্ষীণ দেহটার কথা। পাঁচ ছয় বছর পূর্ব্বে কুমিল্লার বড় জমাদার অধরবাবু যে ছড়াটা বলেছিলেন, সেটা মনে পড়লো—"ষণ্ডা, গুণ্ডা, বুদ্ধিহীন, তার বাড়ী ময়মনসিং।"

এইবার নলিনীবাবুর হাতের কাজ শেষ হয়েছে। কর্ম্মচারীটি ভূ-পতিত কাগজের টুকরাগুলি তুলে নিয়ে চলে গেলে তিনি আমার দিকে মুখ তুলে বললেন: "তারপর, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কেমন আছেন, বলুন।"

আমি বললাম, "বন্ধু-বান্ধব কোথায় পাবো?"

"কেন, প্রেসিডেন্সি জেলে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আছেন ত?"

"না, না, আমি ত লালবাজারে হাজতে। শিয়ালদা' ডাকাতি কেসে আসামী।"

"তাই নাকি? আপনাকে বুঝি মিছামিছি একটু হয়রানি করতে চাইছে।"

বেশ বুঝে নিলাম, আমাকে 'ডেটিনিউ' করার অর্ডার-ই আছে। বনবিহারী মুখার্জ্জীর মরজীতে শিয়ালদা' মামলায় মিছামিছি জড়ান হয়েছে। কয়েকদিন ভোগান্তি ভিন্ন এতে আর কিছু হবে না।"

নলিনী মজুমদারের নিকট যখন যাই, তখন জগৎবাবুই আমাকে 'এস-বি' থেকে 'আই-বি' আফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। এস বি ও আই-বি আফিস পাশাপাশি অবস্থিত হলে-ও, দু'টার প্রধান গেট এক রাস্তার উপর নয়। আই-বি'র সদর গেট লর্ড সিনহা রোডের উপর, এস-বি-তে ঢুকতে হলে একটা গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু, ভিতরের দিকে দু'বাড়ীই সংলগ্ন এবং উভয় বাড়ীতেই ভিতরের দিক থেকে যাতায়াত চলে। জগৎবাবু ও আমি কথা বলতে বলতে একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভিতর থেকে হঠাৎ একটা দারুণ চেঁচা-মেচির শব্দ পেলাম। আমি থমকে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চোখ ফেরালাম। জগৎবাবু আমায় ইসারায় ডেকে নীচু গলায় বললেন, "আমাদের বড় সাহেব (S.S I) একটা পাগল। সামান্য শব্দ কানে গেলেই রাগে চেঁচিয়ে উঠে। গাছে কাকের ডাক শুনলে, বন্দুক নিয়ে কাকের পিছনে ধাওয়া করে। এই যে, আমরা কথা বলে যাচ্ছিলাম, এই শব্দ-ই ওর চেঁচানির কারণ।"

মনে মনে বল্লাম, এইসব পাগলেই ত রাজত্ব চালাচ্ছে আর আপনারা তাদের বশংবদ ভৃত্য হয়ে আছেন।

যাক্—এমিন করে পুলিশ হাজতের দিনগুলি শেষ হলো। পরে কোর্টের

আদেশে জেল-হাজতে।

পুলিশ হাজতের আরেকটা দিনের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য।

আলিপুর কোর্ট থেকে প্রায় সন্ধ্যাবেলা লালবাজারে নিয়ে যাবে। প্রিজন্-ভ্যান এসে গেছে। গোরা সার্জেন্ট, সার্জেন্ট ড্রাইভার পাঁচ ছয়জন দেশী কনৃষ্টেবল—সবাই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন কেন জানি না, আসামী একমাত্র আমি। প্রফুল্লবাবু ছিলেন না বা অন্য কোন কেসের আসামী-ও ছিল না। আমি সার্জেন্টকে বললাম, "দেখ, আজ আমি একা। ঘরের ভিতর বন্ধ না-ই করলে। তোমাদের পাশে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারনা?"

একটু ভেবে উত্তর দিল, "পালাবার চেষ্টা করবে না ত?"

"কী করে তা' সম্ভব? তোমরা দু'জন অস্ত্রধারী। আমি একা, তোমাদের মাঝখানে বসে থাকবো।"

"অল্‌রাইট্, ওঠো— বলে ড্রাইভারের পাশে আমাকে বসালো। নিজে আরেক পাশে দরজার ধারে বসলো। কনেষ্টবলদের সবাইকে ভিতরে বসতে বললো। ময়দানের ধার দিয়ে যখন গাড়ী যাচ্ছিল, কী যে আনন্দ উপভোগ করলাম। খেলা ভাঙ্গার পর জনস্রোত ফিরে চলেছে। আলোয় ঝলমল চৌরঙ্গী, স্নিগ্ধ বাতাস। এতদিন প্রায় প্রত্যহ প্রায়ান্ধকার খাঁচায় বসে যাতায়াত করেছি। আজ আলো, বাতাস, মুক্তদৃষ্টি। ক্ষণেকের জন্য কী চমৎকার অনুভূতি।

এইবার হাজতবাস আলিপুর সেন্ট্র্যাল জেলে। আমি ও প্রফুল্লবাবু পাশাপাশি দুটি সেলে থাকি—সাধারণ ওয়ার্ড থেকে একটু দূরে। দু'জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী এসেছে খবর পেয়ে—কয়েদীদের মারফৎ এসব খবর যথাস্থানে পৌছাতে দেরী হয় না—জগদীশ চ্যাটার্জি জেল লাইব্রেরীর উঁচু সিঁড়িতে উঠে দূর থেকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তিনি তখন মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় শাস্তি ভোগ করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেট-কয়েদীর মারফৎ পরিষ্কার বিছানার চাদর, বালিশ ইত্যাদি আমাদের জন্য এসে গেল। এগুলি বে-আইনীভাবে তাঁরা পাঠালেন। আমাদের বোধ হয়, সাধারণ বিচারাধীন কয়েদীরূপেই জেলে পাঠান হয়েছিল। তাই, জেল-দপ্তর থেকে সাধারণ কয়েদীর প্রাপ্য দু'খানা কালো খস্‌খসে কম্বল ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় নি। পরে আমাদের 'ক্লাসিফাই' করা হয়েছিল কিনা মনে নেই।

আমাদের সেলের পাশেই আরেকটি সেলে একজন সাধারণ কয়েদী থাকতো।

মুসলমান, নামটা মনে নেই। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে সে জেলে আসে বছর দশেকের সাজা নিয়ে। এখন বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধে। ত্রিশ বছরের-ও বেশী সে-বেচারী কারাভ্যন্তরে আছে। জেলারকে মারা, সার্জেন্ট বা মেট-কয়েদীদের প্রহার করা ইত্যাদি অপরাধে দফায় দফায় তার সাজা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তাকে কেউ বড় ঘাটায় না। জেলের যেখানে খুশী সে যেতে পারে, কোন কাজ করতে হয় না। তবে সে নিজের ইচ্ছায় ফুল বাগানের একটু পরিচর্য্যা করে। আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হলো।

একদিন তার মুক্তির আদেশ এলো। সে ত' কেঁদেই আকুল। আমাদের কাছে এসে বললো, "বাবু, ছোটবেলা জেলে এসেছি। এখন বুড়ো হয়েছি। এ যাবৎ বাড়ীর কোন খবর জানি না। কেউ আমার আছে কিনা, বাড়ী-ঘর আমার আছে কি নেই, কিছুই জানি না। এই জেলই ছিল আমার বাড়ী-ঘর! এখন আমায় ছেড়ে দেওয়া মানে সমুদ্রে ফেলে দেওযা।"

লোকটির বাড়ী নোয়াখালি জেলায়। মামুলি কথায় কিছু সান্ত্বনা দেওয়ার চেন্টা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

*   *   *   *

অবশেষে আলিপুর কোর্টে একদিন বিচারক তাঁর খাস কামরায় ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "প্রমাণাভাবে আপনাকে এ মামলা থেকে বে-কসুর খালাস দেওয়া হলো।" কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে রক্ষী গোরা সার্জেন্ট ছিল। বিচারকের কামরায়ও সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সে আমায় বললো, "তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমাকে ত মুক্তি দিয়েছে। বাড়ী চলে যাও।"

একটু হেসে বললাম, "এই গোয়েন্দার দল আমায় মুক্তি দেবে না। এখনই দেখবে, আরেকটা আদেশ জারি কবে জেলে পাঠাচ্ছে।"

বলতে না বলতেই, সাদা পোষাক পরিহিত একজন পুলিশ অফিসার এসে এক-খানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, "সরকারের এই আদেশ-বলে বি, সি, এল্, এ-য়্যাক্ট, ১৯৩০ (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেন্ট য়্যাক্ট) অনুযায়ী আপনি গ্রেপ্তার হলেন।"

আমার সঙ্গের সেই সার্জেন্টকে দেখে মনে হলো, সে যেন রাগে ফুঁসছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, "দেখলে ত?"

তারপর যথারীতি প্রেসিডেন্সী জেল।



জেলখানা বা বন্দীশালা তীর্থ-ক্ষেত্র-স্বরূপ। যে সংগ্রামীর জীবনে এই তীর্থক্ষেত্র দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি, তাঁর জীবন বস্তুতঃ অপূর্ণ রয়ে গেছে, বলা চলে। আবার কারো চোখে হয়ত, এই তীর্থ-ভূমির রুদ্র রূপটিই বিশেষ করে ফুটে উঠে ; এর মাধুর্য্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

আমার সৌভাগ্য, আমি বন্দীশালার এই কঠোরতা ও মধুরতা উভয়েরই আস্বাদ পেয়েছি। একদিকে যেমন বেদনাহত হয়েছি, অপরদিকে তেমনি আনন্দ-রসে-ও আপ্লুত হয়েছি। ভয়ঙ্করের ভিতর সুন্দরের এই বিচিত্র চিত্র অনিপুন হাতে তুলে ধরার প্রয়াসই—আমার 'স্মৃতি-মন্থনে'র দ্বিতীয় পর্ব্ব।

সুধাংশু অধিকারী

স্মৃতি-মন্থন

ক) প্রেসিডেন্সি জেল

(ক) প্রেসিডেন্সি জেল

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ৫ই মে তারিখে রাজবন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরিত হই। *

প্রেসিডেন্সি জেলে বেশী দিন ছিলাম না। কাজেই, সেখানকার সম্বন্ধে বক্তব্য-ও বিশেষ কিছু নেই। তবু-ও সামান্য দু'একটা কথা লিখছি।

জেল-সুপার ছিলেন সে সময়, যতদূর মনে হচ্ছে, অনুপ সিং। অসামান্য প্রতাপ তাঁর। ব্রিটিশ আমলে সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টরা এক একজন রাজা-মহারাজার মর্য্যাদায় থাকতেন। কয়েদীদের তিনি হর্তা, কর্তা, বিধাতা। প্রতিদিন সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ জেল পরিদর্শনে বের হতেন। মাথায় রাজ-ছত্র। একজন কয়েদী সর্দার তার বাহক। ব্যাটন-হস্তে জনা দুই গোরা সার্জেন্ট তাঁর আগে আগে যেতো আর পিছনে যেতো গোরা সার্জেন্ট ও দেশীয় জেল-রক্ষীর এক বাহিনী। কয়েদীরা সার বেঁধে তাঁকে অভিনন্দন জানাতো "সরকার, সেলাম"—এই স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ করে। এই প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণের পদ্ধতি-ও ছিল বিচিত্র। বিভিন্ন ওয়ার্ডের

---

* গভর্ণমেন্ট রেকর্ডে উল্লেখ করা আছে যে ১৯৩১ সালের ২রা জুন বি, সি, এল, এ, য়্যাক্ট, ১৯৩০ (B. C. L A. Act, 1930)—অনুযায়ী আমাকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। কিন্তু, এই তথ্য ভুল। ৫ই এপ্রিল, ১৯৩১-এ আমি গ্রেপ্তার হই। এক মাস শিয়ালদহ ষ্টেশন ডাকাতি মামলায় হাজত ভোগের পর, ৫ই মে তারিখে 'ডেটিনিউ' হয়ে প্রসিডেন্সি জেলে আসি।

'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেন্ট য়্যাক্ট, ১৯৩০' (B. C. L A Act, 1930) নামক বিনা-বিচারে আটক রাখার আইনে একটি ধারা আছে যে, প্রথম গ্রেপ্তারের পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (দু'মাস বলে মনে হচ্ছে) সরকার নিযুক্ত কয়েকজন বিচারক পুলিশ প্রদত্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে এই আটক আদেশ বহাল রাখবেন বা বাতিল করবেন। বাতিল করাটা খুব কদাচিৎ ই হতো। আমার বেলায় এই বহাল রাখার আদেশ দেওয়ার তারিখটা ২রা জুন, ১৯৩১ বলে মনে হয়। সরকারী নথি পত্রে এই 'কনফারমেশন'—এর তারিখটাকেই গ্রেপ্তারের তারিখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েদীদের আগে থেকেই ফাইল-বন্দী করে বসিয়ে রাখা হতো। 'মেট' কয়েদীরা সামনে দাঁড়িয়ে সুপারকে দেখেই তার-স্বরে 'সরকার" বলে চেঁচিয়ে উঠতো আর ফাইলে উপবিষ্ট সাধারণ কয়েদীরা একসঙ্গে "সেলাম" বলে দাঁড়িয়ে পড়তো। এটা ছিল সুপার-বাহাদুরের দৈনন্দিন রাজকীয় অভিসার-পর্ব্ব।

'ডেটিনিউ'-দের ওয়ার্ডে যাওয়া ও তাঁর দৈনিক রুটিন ছিল। কিন্তু, ডেটিনিউ-রা তাঁকে ঐরূপ সম্মান দেখাতে যাবে কেন? না দেখালে আবার সাম্রাজ্য-বাদের মর্য্যাদায় আঘাত হানা হয়। তাই বোধহয়, একটা অলিখিত সমঝোতা হয়েছিল যে, ডেটিনিউ-ওয়ার্ডে সুপার এলে ডেটিনিউরা যেন শুয়ে বা বসে না থাকেন, যে-কোন অছিলায় ঐ সময়টুকু যেন দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটান। এই সমঝোতা অনুযায়ী সুপার আসার আগে আগে একজন সার্জেন্ট এসে যখন তার আশু আগমন বার্ত্তা ডেটিনিউদের জানিয়ে যেত তখন তারা-ও কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতেন, কেউ বা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতেন অথবা কয়েকজন মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করতেন।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সার্জেন্ট এসে নিত্যকার মত সুপারের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে গেল। সামনেই ছিলেন আমাদের ধরণী বিশ্বাস। রেগে গেলে তিনি একটু তোত্‌লাতেন। সার্জেন যেই না ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললো—**'Super is Coming'**, রেগে গিয়ে ধরণীবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—**'Shall we d-d-d d dance ?'**

প্রেসিডেন্সি জেলে এসে অভিভাবকস্বরূপ পেলাম প্যারীবাবুকে। প্যারীমোহন দাস। জন্মস্থান বরিশাল জেলা। তবে প্রায় সারাটা জীবন কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়। পরিচয়-ও বহুদিনের, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটি মেসে বহুদিন ছিলেন এবং আমি তাঁর 'গেষ্ট' হিসাবে অনেক সময়ই ওই মেসে কাটিয়েছি। অনুশীলন পার্টির লোক ছিলেন। গোপেন চক্রবর্ত্তী, ধরণী গোস্বামী, নীরদ চক্রবর্ত্তী যখন অনুশীলন ছেড়ে শ্রমিক কৃষক দলে যোগদান করেন, প্যারীবাবু-ও তখন তাঁদের অনুগমন করেছিলেন।

বিপ্লবী দলেও এমন দু'চারজন লোকের দেখা মেলে, যাঁরা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। এঁদের ভূমিকা কিন্তু মোটেই উপেক্ষা করবার নয়। প্যারীবাবু ছিলেন এই বিশেষ ধরণের লোক। কোন চমকপ্রদ কাজ করে সবার বাহবা কুড়াবার পরিবর্ত্তে প্রতিদিনকার অপরিহার্য্য ছোট খাট কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতেই তাঁর ছিল পারদর্শিতা। আমাদের মত বে-হিসাবী ছেলেদের নিকট তাঁর মত লোকের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। বাইরেও এক হিসাবে তাঁকে অভিভাবক মনে করতাম,

জেলের ভিতর এসে-ও তাই। তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলাম।

'ডেটিনিউ' হিসাবে জেলে এসেই প্রাথমিক খরচা হিসাবে ষাট টাকা এবং এক মাসের ভাতা বত্রিশ টাকা—মোট বিরানব্বই টাকা পাওয়া গেল। এ টাকাটা অবশ্যি আমার হাতে দেওয়া হয়নি। জেলের ভিতর বন্দীদের হাতে টাকা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তাঁদের হিসাবে ঐ টাকা জমা হতো এবং তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মত জিনিসপত্র কিনে ঐ টাকা খরচ করতে পারতেন। জেল কর্তৃপক্ষের মারফৎ-ই ঐসব জিনিসপত্র (জেলের আইন-মাফিক ভিতরে যা' দেওয়া চলে) সরবরাহ হতো।

আমি প্রায় একবস্ত্রে জেলে এসেছিলাম। প্যারীবাবু প্রয়োজনীয় জামা কাপড়, তেল, সাবান, টুথব্রাস, পেষ্ট ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অবিলম্বে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। বার্মিজ্ সেগুণ কাঠের এবং চীনা মিস্ত্রির তৈরী একখানা ডেক্-চেয়ার পেতেও বিলম্ব হলো না। ডেক-চেয়ারের প্রয়োজনীয়তা কী, আমার তখন বোধগম্য হয়নি; বরং এটা একটু বিলাসিতা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু, প্যারীবাবুর দূরদর্শিতা ছিল অশেষ। ডিটেনশান ক্যাম্পে এবং অন্তরীণে, শারীরিক ও মানসিক নানা ভাব-বিপর্য্যয়ের সময়ে নিজের অঙ্কে ধারণ করে এই দীর্ঘ কেদারাটি আমাকে আরাম প্রদান ত করেছেই, এমন কি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও অহরহঃ আমি এর কোলে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি অনুভব করি।

প্যারীবাবুর কথা বলছিলাম। বর্তমানের প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা 'ন্যাশনেল বুক এজেন্সী'-কে সূতিকাগারে পালন করে তুলেছিলেন প্যারী দাস। তখন এটি একটি অতি ছোট্ট বিপনী; বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীটের সন্নিকটে ৭২নং হরিধাম রোডে অবস্থিত ছিল। অবিশ্বাস্য রূপ যৎ সামান্য পারিশ্রমিকের * বিনিময়ে প্যারী দাসই তা' চালাতেন। বই এর প্রুফ দেখা, ছাপাবার ব্যবস্থা, বিক্রী ইত্যাদি সব কাজই একা তাঁকেই করতে হতো। সন্ধ্যার পর অল্প আলোকিত ঐ পুস্তকালয়ে বসে প্রুফ্ সংশোধনে রত প্যারীবাবুকে আমিও মাঝে মাঝে সাহায্য করেছি, মনে পড়ে।

---

* এ সম্বন্ধে ধরণী গোস্বামী লিখেছেন—"অবশেষে একখানা কাগজের টুকরায় লিখে আমি অঙ্কটা প্রকাশ করলাম—১২ টাকা। এই সংখ্যাটা মুখে আনতে সাহস হচ্ছিল না। একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে তার সকাল সন্ধ্যা খাটুনির বদলে একটা নগণ্য পারিশ্রমিকের কথা কি করে বলি। * * * সেই থেকে দুটি বছর সকল পুলিশী হামলা ও নির্য্যাতনের মধ্যে প্যারীমোহন দাস ন্যাশনেল বুক এজেন্সির পরিচালনা করেন।"

[কালান্তর, ২৫শে জুলাই, ১৯৬৪, পৃঃ ৭]

অতি পরিণত বয়সে বোধহয় নব্বুইয়ের কোঠায় এসে, প্যারী দাস কলকাতাতেই অখিল মিস্ত্রী লেনে একটি প্রায়ান্ধকার ভাড়া বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। শেষ বয়সে আনন্দ বাজার 'পত্রিকা' অফিসে, 'দেশ' সাময়িক পত্র-বিভাগে চাকরী করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে কী তাঁর আনন্দ। তাঁর উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

জেলের কথায় আসা যাক্। গত কয়েক বছরের অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে শ্রমিকদের বস্তিতে। তাদেরই পরিবার-ভুক্ত হয়ে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, (১৯২৯-৩০-৩১), সে-সময়কার শ্রমিকদের জীবন-ধারণের মান এখনকার শ্রমিকদের মানের চেয়ে অনেক নীচু স্তরের ছিল। সেই জীবনে এতদিন অভ্যস্ত থাকার পর আজ তেল. সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিস-রূপে পেয়ে নিজেকে যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো।

দাড়ি কামাবার প্রয়োজন অনুভব করলাম। প্যারীবাবু একজন কয়েদী নাপিতকে খবর দিয়ে আনিয়ে দিলেন। সে-ই ডেটিনিউ-দের ক্ষৌবকার্য্য সম্পাদন করতো। এসেই সে আমাকে বললো—"বাবু শুয়ে পড়ুন।" সে কিবে বাবা। দাড়ি কামাবো তো শুয়ে পড়তে যাবো কেন? সে জানালো যে, এক সময়ে সে ছিল মিলিটারী ক্যাম্পের নাপিত। গোরা সৈন্যদের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করা ছিল তার কাজ। গোরারা প্রাত্যহিক প্যারেড ইত্যাদি করে শ্রান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে নিজ নিজ খাটিয়ায় শুয়ে পড়তো। ঐ শায়িত অবস্থাতেই সে তাদের দাড়ি কামিয়ে দিত। অভ্যাসের ফলে উপবিষ্ট অবস্থার চেয়ে শায়িত অবস্থাতেই লোকের দাড়ি কামাতে সে অধিকতর নিপুণতা অর্জন করেছে। তার বিদ্যার তারিফ করতে হলো।

সাধারণ কয়েদীদের ভিতর থেকে ডেটিনিউদের পরিচারক নিযুক্ত করা হতো। তারা 'ফালতু' নামে পরিচিত ছিল। 'ফালতু' কথাটা একটু অবজ্ঞাসূচক মনে হতে পারে ভেবে, আমরা তাদের নাম ধরে ডাকতাম। এতে ওরাও খুশী হতো। একদিন ওদের একজন আমাদের ঘরের কাজ সেরে চলে যাচ্ছিল। কী একটা কারণে তাকে পুনরায় ডাকা প্রয়োজন হওয়াতে তাকে নাম ধরে ডাকলাম। সে একটুও ফিরে তাকালো না, চলেই যেতে লাগলো। প্যারীবাবু বললেন, "থাক্ ওকে আর ডাকবেন না। ও কানে একটু কম শোনে।" মুহূর্ত্তে সে ঘুরে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে বললো—"বাবু জেলে থাকতে হলে কানে একটু কমই শুনতে হয়, নইলে, খেটে খেটেই জীবন যাবে। যাক্‌গে, এবার বলুন। কী করতে হবে।"

পূর্ব্ব-পরিচিতদের ভিতর আর যাদের দেখা পেলাম, তার ভিতর বিভূতি ঘোষ

অন্যতম। বিভূতি ঘোষ, প্রমথ ভৌমিক, কালিদাস বোস, বিষ্ণু চ্যাটার্জি প্রভৃতি ছিলেন 'খুলনা গ্রুপ' নামে পরিচিত বিপ্লবী দলভুক্ত। ১৯২৮-২৯ সালেই এঁরা প্রায় সকলেই মার্কসবাদ গ্রহণ করে আমাদের ইয়ং কমরেডস্ লীগের সঙ্গে যোগদান করেন। বিভূতি বাবু ঐ সময় আমার সঙ্গে কিশোরগঞ্জেও গিয়েছেন এবং তাঁকে নিয়ে ওখানকার পল্লী অঞ্চলে ঘুরেছি। পরবর্ত্তীকালে সি, পি, আই-এর পঃ বঙ্গ শাখার সম্পাদক ভবানী সেনও এই খুলনা গ্রুপের লোক ছিলেন। আমার পলাতক জীবনে (১৯২৯-৩১) বিভূতিবাবু ভবানী সেনকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ভবানীবাবু তখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্, এ, ক্লাসের ছাত্র। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পরে, শুনেছি, তিনি জামানের 'কারখানা'-গ্রুপে যোগদান করেছিলেন। ধরা পড়ার পর যখন দেউলি বন্দী নিবাসে রাজবন্দীরূপে আসেন, তখন আমাদের সঙ্গেই মিশে যান।

জামানের নামটা উল্লেখ করেছি। এ, এম্, এ, জামানরূপে নিজের পরিচিতি দিতেন। এই জামানের মত এমন একটি সুবিধাবাদী লোক খুবই কম দেখা যায়। ১৯৩০ সালে গঠিত **Calcutta Committee of the Communist Party of India (Provisional)** স্থাপয়িতাদের মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আসবার পূর্ব্বে তিনি একটি চটকলের শ্রমিক ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, মুজফ ফর আহম্মদের সুনজরে পড়ে যান। এবং সেটাকেই মূলধন করে তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েন। শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর থেকে আগত এবং স্বয়ং মুজফ্ফর আহাম্মদের আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট, ইহার মূল্য তখন অনেক ছিল। আমার ধরা পড়ার পর তিনি দলত্যাগ করে কিরণ বসাক নামক একজন তথাকথিত কম্যুনিষ্ট নেতার সঙ্গে মিলে 'কারখানা' নামক একখানা কাগজ বের করেন। ভবানী সেন নাকি এই কাগজের প্রধান লেখক ছিলেন। এ খবর অবশ্য আমার অনেক পরে শোনা। ১৯৩৮ সালে বন্দীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে।

জামান পরবর্ত্তী যুগে 'মুসলীম লীগে' যোগ দেন এবং দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব-পাকিস্তানে চোরাই লবন চালান দেওয়ার যে কাহিনী একসময় আমাদের বিধান সভায় সোরগোল তুলেছিল, তার নায়ক ছিলেন এই জামান। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের হয়ে তিনি হাওড়া-হুগলীর শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন কম্যুনিষ্ট ইসমাইল-এর বিরুদ্ধে। কালী সেন তখন ইসমাইলের প্রতিনিধিরূপে বাঁশবেড়িয়া গেঞ্জেস্ জুটমিলের শ্রমিকদের ভিতর প্রচার কার্য্য চালাতেন। ঐ সময়েই ওখানকার শ্রমিক শ্রেণীদের ভিতর রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে কালীদার উদ্যোগে কতকগুলি নৈশক্লাস সংগঠন করা হয়। আমি তখন অবস্থা-বিপাকে রাজনীতিক আন্দোলনের

প্রধান স্রোত থেকে দূরে চলে গেছি। কিন্তু, কালীদার উক্ত কাজে যথাসম্ভব সহায়ক ছিলাম। উভয়েই তখন 'বেঙ্গল বেল্‌টিং'-এ চাকরী করি। আফিস থেকে ফেরার পথে 'বংশবাটি' ষ্টেশনে নেমে যেতাম, শ্রমিক বস্তিতে প্রচার কার্য্য চালিয়ে রাত দশটা, এগারটায় ত্রিবেণীতে বাড়ী ফিরতাম। আমাদের শ্রমিক সহকর্ম্মীদের ভিতর বিশেষ করে নাম মনে পড়ে মন্তাকিন ও হুসেনের।

মিল-কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে ব্যাপক কারসাজির ফলে জামানই অবশ্য সেই নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে।

এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে বাইরে থেকে দু'জন মহিলা কর্মী এসেছিলেন ইস্‌মাইলের পক্ষে মিলের মহিলা শ্রমিকদের ভিতর প্রচার কার্য্য চালাতে। এদের একজন দিল্লীর ট্রেডইউনিয়ন কর্মী সরলা ভট্টাচার্য্য। অন্যজন কলকাতার বেলা লাহিড়ী ; কম্যুনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর স্ত্রী। এঁরা দু'জনই যে কয়দিন ছিলেন, কালী সেনের বাড়ীতেই থাকতেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠছে। ত্রিবেণীর কালী সেনের বাড়ী ছিল, শুধু তাঁর জীবদ্দশাতেই নয়, তাঁর অবর্তমানেও কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বাড়ীতে পার্টির সর্ব্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যাদের থাকতে দেখেছি বা যাদের কথা শুনেছি তাঁরা হলেন লক্ষ্মী পাল, বিনয় ব্যানার্জ্জী, অমূল্য সেন ও রমেন ভট্টাচার্য্য (অশোক গুপ্ত)। আরো কেউ হয়ত ছিলেন ; এখন তা মনে করতে পারছি নে।

একদিন হঠাৎ দেখি বঙ্কিম মুখার্জি এসে হাজির। তাঁকেও **B C L.A. Act**-এ গ্রেপ্তার করে এনেছে। খুশীই হ'লাম। একসঙ্গে কিছুদিন থাকা যাবে। আমার সঙ্গে কয়েকখানা বই ছিল। তার ভিতর বুখারিনের '**Historical Materialism**' ও এঙ্গেল্‌স্ -এর '**Socialism utopain & Scientific**'-অন্যতম। বইগুলি আমার বাসস্থান সার্চ করার সময় পুলিশ আটক করে। বিচারাধীন থাকাকালে তাদের হেফাজতেই জমা ছিল। পরে 'ডেটিনিউ' হওয়ার সময় আমাকে ফেরৎ দেয়। সে-সময় কী কী বই জেলের ভিতর ডেটিনিউদের দেওয়া নিষিদ্ধ, সে বিষয় কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না বলেই বোধ হয়, জেল কর্তৃপক্ষ বইগুলি আটক করে নি। পরে কিন্তু মার্কসবাদ সংক্রান্ত যে-কোন বই কারাভ্যন্তরে বা বন্দীশিবিরে নিষিদ্ধ ছিল।

বইগুলি দেখে বঙ্কিমবাবু খুব খুশী। বললেন, 'এইগুলি পড়েই দিন কাটিয়ে দেব। বাইরে বই পড়বার সুযোগ পেয়েছি কোথায়? শুধু বক্তৃতা দিয়েই দিন

গিয়েছে।'

কিন্তু, বই পড়ার আশা বঙ্কিমবাবুর পূরণ হয়নি। দুই তিন দিন পরই বঙ্কিম বাবুর মুক্তির আদেশ এলো। B.C.L.A.-র‍্যাক্টে তাঁকে নাকি ভুলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য 124-A ধারা অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা ছিল।

* * *

রোজই সকাল বেলা দেখতাম দু'জন কয়েদী দু'টি বড় বালতি ভরতি দুধ নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে দিয়ে আসছে। ডেটিনিউদের ওয়ার্ডের কথাই বলছি। সাধারণ কয়েদীদের দুধ দেওয়ার কথাই উঠে না। ডেটিনিউ ওয়ার্ড ছাড়া হাসপাতালে দুধ যেত।

যে দু'জন কয়েদী এই দুধ বিলির কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একজন বেশ নাদুস-নুদুস, ভুড়ি-ওয়ালা, গৌরবর্ণ চেহারার লোক। অন্যজন ঠিক তার বিপরীত। কৃশ, কৃষ্ণকায়, লম্বা। প্যারীবাবুর নিকট জানলাম, সুন্দর চেহাবার লোকটি বড়বাজার অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। হিন্দু মাড়োয়ারী। আর কৃশ লোকটিও নামজাদা গুণ্ডা; মুসলমান, মেছুয়াবাজার অঞ্চলের।

বিগত ১৯২৫ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় উভয়েই মনের আনন্দে মানুষ খুন করেছে। একজন বজরঙ্গ-ওয়ালার জয়ধ্বনি তুলে মুসলমানদের, অন্যজন 'আল্লা হো আকবর' বলে হিন্দুদের। উভয়েই এখন আজীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। আজ তাদের গলায় গলায় ভাব। সর্ব্বদা দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যেতো। শত্রুকে পরম মিত্রে পরিণত করার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে জেলের মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলো।

একদিন বিকাল বেলা চুয়াল্লিশ ডিগ্রি থেকে নিজের ওয়ার্ডে ফিরছি। জেল-ফটকের কাছে একটি বটগাছ ছিল। তলাটা শান বাঁধানো। সেখানটায় আসতেই দেখতে পেলাম, দু'জন কয়েদী হাতে হাতকড়ি লাগান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কী সুন্দর চেহারা! দুধে আলতায় রঙ। একজনের বয়স কুড়ির বেশী হবে না অন্যজন-ও ত্রিশের নীচে। মুহূর্তের ভিতর জনা দুই তিন গোরা সার্জেণ্ট হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ওদের নিয়ে গেল। একজন সার্জেণ্ট ওখানে রয়ে গেল। 'ব্যাপার কী' জিজ্ঞাসা করাতে সে

বললো, 'বাবু, এরা ফাঁসির আসামী। আজ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে। কিন্তু, কী করে যে, গার্ড ছাড়া ওরা এখানে দাঁড়িয়েছিল, বোঝা গেল না। যে কোন অনর্থ এরা মুহূর্তের ভিতর ঘটাতে পারতো। যে-দু'জন পাঠান কলেজ স্ট্রীটে একজন পাবলিশারকে খুন করেছে বলে কাগজে পড়েছ, এরা সেই দু জন আসামী।'

মনে পড়লো, কোন একটা পুস্তকে মহম্মদের ছবি ছাপা হয়েছিল বলে ধর্মের অবমাননা হয়েছে মনে করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত দুই পাঠান যুবক পুস্তক প্রকাশককে তার বই-এর দোকানে ঢুকে খুন করেছিল। এরাই তারা? ধর্মান্ধতা এমন করে মানুষকে কতটা হিংস্র করতে পারে, ভেবে অবাক হ'লাম।

যারা দাগী কয়েদী, অর্থাৎ ছাড়া পেলেও যারা ঘুরে ফিরে আবার জেলেই আসে এবং যারা বহু বৎসর ধরে সাজা ভোগ করছে, তাদের অনেকেরই নাকি মুখের ভিতর গুপ্ত থলে থাকে। ওখানে ওরা টাকা পয়সা, ছোট ঘড়ি বা আংটি ইত্যাদি অনায়াসে রাখতে পারে। সার্চ করে বের করবার উপায় থাকে না। একদিন একজন কয়েদী তার মুখের ভিতরের এই প্রকার থলি থেকে কতকগুলি জিনিস বের করে দেখালো। ঘাড়টাকে একটু বাঁকা করে মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতর থেকে তিনটি গিনি-মুদ্রা বেরিয়ে এলো। কী করে মুখের বা প্রকৃতপক্ষে গলার ভিতর এই থলে বানাতে হয়, তার পদ্ধতি-ও বললো। একটি সীসার গুলি বা চাকতিতে সুতো বাঁধা থাকে। সুতোর অন্যপ্রান্ত নীচের পাটির শেষ একটি দাঁতের সঙ্গে বেঁধে রেখে গুলিটা সব সময় মুখের এ প্রান্তে রেখে দিতে হয়। সীসার ভারে ক্রমে ক্রমে গলার ভিতর দিকে ঐখানে গর্ত (cavity) হতে থাকে। মাসখানেক এমনি রাখলেই চলনসই একটি থলে তৈরী হয়। যত বেশীদিন রাখা যায় থলেটা ততই গভীর হয়। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়। তখন ওকে বলা হয় কাঁচা থলে। পাকা থলে হয়ে গেলে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

জেলের ভিতর এ সব গিনি তাদের কী দরকারে লাগে, জিজ্ঞাসা করায় বললো, বাবু, জেলেই আমাদের সারাটা জীবন প্রায় কাটবে। কাজেই বাইরের কিছু সুখ সুবিধা, নেশার জিনিষ ইত্যাদি জোগাড় করতে এই টাকার দরকার হয়। ওয়ার্ডারদের দিয়ে আমরা সব কিছুই জোগাড় করিয়ে নিতে পারি।"

প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সা বন্দী নিবাসের ভিতর রাজবন্দীদের আনা নেওয়া প্রায়শঃই ঘটতো। একদিন এইভাবে বুখারির আগমন হলো। জামাল উদ্দিন বুখারি, করাচীর লোক। শুনেছি, বোম্বেতে ডক্ শ্রমিকদের ভিতর কাজ করত। সেখান থেকে কলকাতা এসে **Workers' & Peasants' Party**-র সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২৯

সালে কলকাতায় যখন **Young Comrades' League** স্থাপিত হয়, তখন বুখারি-ও আমাদের সঙ্গে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বুখারিকে ১৯২৯ সালে একবার কিশোরগঞ্জের ইয়ং কম্‌রেড্‌স্ লীগের পক্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের কর্ম্মীদের সঙ্গে সেখানে কৃষকদের (শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান) মধ্যে গিয়ে যখন সে তার মাতৃভাষা উর্দ্দুতে বক্তৃতা দিত, তখন তার সব কথা বুঝতে না পারলেও কৃষকেরা খুবই উৎসাহিত হতো। এই সঙ্গে মনে পড়ছে আরেকজনের কথা। অখিলবন্ধু ব্যানার্জ্জী। বুখারির সঙ্গে তিনিও কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলেন। কৃষকসভায় অখিলবাবু উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতেন, নজরুলের 'জাগো, অনশনবন্দী, জাগরে যত—' এই গানটি দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ বলি, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তখনকার **Albert Hall**-এ (আজকাল যেখানে **Coffee House**) **Workers' & Peasants' Party**-র প্রথম সর্ব্বভারতীয় কন্‌ফারেন্স হয়। সেই কন্‌ফারেন্সে উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলেন, নজরুল ইসলাম, অখিল ব্যানার্জ্জী ও অন্য আরেকজন, যার নাম সঠিক মনে করতে পারছি ; না খুব সম্ভব সৌম্যেন ঠাকুর। ইন্টারনেশনেল সঙ্গীতের নজরুলকৃত অনুবাদ 'জাগো, অনশনবন্দী—' গানটি দিয়েই এই কন্‌ফারেন্সও শুরু হয়েছিল। অখিলবাবু অনেকদিন 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস' পার্টি' তথা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে সাংসারিক প্রতিকূলতার স্রোত তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। বহুদিন পরে ১৯৫৩ বা '৫৪ সালে অখিলবাবুর একবার সন্ধান পেয়েছিলাম, হুগলী জেলার সাহাগঞ্জে 'ডানলপ'-এর কারখানায় এক কন্ট্রাক্টরের অধীনে সামান্য একটা চাকরী করে 'দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি' ভোগ করছেন।

বুখারির কথায় ফিরে আসি। অত্যন্ত মিশুক, সদা হাসিখুশী, প্রাণবন্ত ছেলে। মুহূর্ত্তের ভিতর যে-কোন লোককে আপন করে নিতে পারে। প্রেসিডেন্সি জেলে আমাকে পেয়ে বুখারি বললো যে, আমার বন্ধুরা বক্সাতে আমার জন্য উদগ্রীব ভাবে অপেক্ষা করছেন। আমার য়্যারেষ্ট হওয়ার সংবাদ তাঁরা খবরের কাগজ থেকে জানতে পেরেছেন। আর নিজের সম্বন্ধে জানালো, সে ভিন্ন প্রদেশের লোক ; তাই, **Bengal Criminal Law Amendment Act** অনুযায়ী তাকে এখানে আবদ্ধ না রেখে করাচীতে পাঠিয়ে দেওয়াই বাংলা সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। বক্সা থেকে তাই তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বুখারির সঙ্গে এই জেলেই শেষ দেখা। পরবর্ত্তী জীবনে, দেশ বিভাগের পর সে পাকিস্তানে একজন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা-বাদী-রূপে পরিণত হয়েছিল, শুনেছি। বর্ত্তমানে সে আর ইহ জগতে নাই।

ইতিমধ্যে প্যারীবাবু, বিভূতি ঘোষ প্রভৃতি অনেকে বক্সাতে স্থানান্তরিত হয়েছেন! আমার পালা আসছে বেশ বুঝতে পারলাম। তাই আর দু'চাটি কথা বলেই প্রেসিডেন্সি

জেলের কথা শেষ করি।

প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের জন্য প্রধানতঃ তিনটি ওয়ার্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাত খাতা (ওয়ার্ডকে কেন খাতা বলা হতো, জানিনা।) ১৪নং ওয়ার্ড ও চুয়াল্লিশ ডিগ্রি। চুয়াল্লিশ ডিগ্রি চুয়াল্লিশটি সেলের সমষ্টি। ওখানে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা তাই Single Sea'ed room-এর সুবিধা ভোগ করতেন। এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিরই একটি কক্ষে থাকতেন বীরেন দাশগুপ্ত। একসময়কার প্রসিদ্ধ জঙ্গী ছাত্র-সংগঠন 'All Bengal Students' Association (A B S.A)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহুকাল তিনি ঐ সংগঠনের General Secretary-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বীরেনবাবু স্বপাক আহার করতেন। তাস খেলায় ছিল তাঁর দারুণ ঝোঁক। 'কনট্রাক্ট ব্রিজ' খেলতেন। বেলা দশটার ভিতরই তিনি নিজের আহারাদি সেরে দুই প্যাক তাস এবং একটি 'Pear's encyclopedia' হাতে আমাদের ব্যারাকে এসে হাজির হতেন। Pear's encyclopedia-তে (বইটি ছোট, encyclopedia বলতে যে বৃহৎ আকারের বই-এর কথা মনে হয়, এটা তা' নয) 'ব্রিজ' খেলার নিয়মাদি লেখা ছিল। তাই ওটা সঙ্গে রাখতেন, প্রয়োজনানুযায়ী খুলে দেখবার জন্য। কিন্তু এত সকালে তার সঙ্গে তাস খেলতে বসবে কে? এদিকে আমি এবং খুলনার সতীশ ঘোষ একসঙ্গে কুকারে রান্না করে খেতাম। সতীশবাবু পেটের রোগে ভুগছিলেন এবং আমি যেহেতু বাইরে বেশ কৃচ্ছ্র-সাধনের ভিতর দিয়ে কাটিয়েছি এবং সেইজন্যেই ভগ্ন স্বাস্থ্য— বন্ধুদের এই সিদ্ধান্তের শিকার-হয়ে, তাদের নির্দ্ধারিত স্বাস্থ্যোদ্ধারের পন্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। 'ইকমিক কুকারে' (তখন প্রেসার কুকার আবিষ্কৃত হয় নি) প্রতিদিন মুরগীর মাংস বিশেষ কোন মসলা না দিয়ে রান্না করে খেতে হতো। বিভূতি ঘোষ অগ্রনী হয়ে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের খাওয়া দাওয়া-ও তাই, বীরেনবাবুর মত সকালে না হলেও, সাড়ে দশটার ভিতর সম্পন্ন হয়ে যেতো। বীরেন-বাবু তাই আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁর একজন খেলার সাথী করে নিলেন। আর দু'জনও জুটে গিয়েছিল। [সতীশবাবু তাস খেলতেন বলে মনে হচ্ছে না।] বারটা সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত তাস খেলতাম। তারপর অন্য লোক জুটে যেতো। আমি-ও রেহাই পেয়ে বাঁচতাম।

ধূর্জটি নাগ বরিশালের লোক। যুগান্তরের 'রিভোল্ট' রাখাল দাসের গ্রুপের ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি ছবি আঁকতে জানতেন। বেশ কয়েকজন, দেখলাম,

তাঁর কাছে **Sauce Painting** শিখছে। জিনিষটা খুব কঠিন বলে মনে হলো না। তাই, মাল মশলা কিনে তাঁর স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেলাম। একখনো ছবি-ই আঁকতে পেরেছিলাম। স্তালিনের প্রতিকৃতি। ছবিটি আঁকা শেষ হতে না হতেই বপ্পার ডাক এলো।



খ) বক্সা বন্দীশিবির

(খ) বক্সা বন্দীশিবির

অবশেষে বক্সা ক্যাম্পে আসা গেল। দলে ছিলাম, মনে হচ্ছে, দশ থেকে পনের জন। শিয়ালদা' স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিলাম, সন্ধ্যার পর। পরদিন সকাল বেলা 'রাজা-ভাত-খাওয়া' নামক স্টেশনে নেমে গাড়ী বদল করে মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে উঠলাম। আশে পাশে সবুজ বন, চাষের ক্ষেত, ছোট্ট গ্রাম—এই সব পেরিয়ে ধীর গতিতে গাড়ী যখন এগিয়ে চললো, মনে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের অনুভূতি জেগেছিল।

'বক্সা-রোড' ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। একদল বন্দুকধারী সিপাই এবং কয়েকজন অফিসার আমাদের রক্ষী হিসাবে ছিলেন। সকলেই একসঙ্গে স্টেশনের ঘরটির পিছনে যেই গিয়েছি, একদল পাহাড়ী ছুটে এসে আমাকে আক্রমণ করলো। এক হাত ধরে একজন টানছে, অন্য হাত ধরে অন্য একজন; সামনে দাঁড়িয়ে আরেকজন কী সব বলছে, আমাকে লক্ষ্য করে। সবাই চেঁচামেচি করছে। হকচকিয়ে গেলাম। পুলিশের তাড়া খেয়ে একজন ভিন্ন অন্যেরা একটু সরে গেল। যে রইল, সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা চেয়ার সদৃশ আসনে বসিয়ে দিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্য 'ডাণ্ডি' এবং ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ের চড়াই-এ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা আমাদের বয়ে' নিয়ে যাবে এই ডাণ্ডি বাহকেরা। বাহিত বস্তুটির ওজন যত কম হয়, তাদের পক্ষে ততই সুবিধা। ওরা লক্ষ্য করেছিল যে, আমাদের দলের ভিতর আমিই সবচেয়ে রোগা। তাই, আমাকে নিয়ে এই টানা-টানি। সবাই চাইছে, তার ডাণ্ডি তে আমি উঠি।

এক কিলোমিটার মত যাবার পর সান্তাল বাড়ী' নামক একটা স্থানে এলাম। এখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে। এরপর থেকেই পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়েছে। আমার সঙ্গে সঙ্গেই ডাণ্ডি চড়ে আসছিলেন আরো জনা চারি। শুধু ভবেশ নন্দীকে মনে আছে। অন্য কারা ছিলেন ভুলে গেছি। একজন মনে হয়, সতীন রায়। অনু-শীলনের যুগে আমার বহুদিনকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সামনে সবুজের বর্ণাঢ্যে ঢাকা সু-উচ্চ পাহাড়। নিম্নে বন বৃক্ষ-রাজির তলা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলা শান্ত বনবীথিকা যেন আহ্বান জানাচ্ছিল। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যকে অবমাননা করে মানুষের কাঁধে

চড়ে কেউ এ রাস্তাটুকু যেতে চাইলাম না। ডাণ্ডি নামাতে বললাম। ডাণ্ডি-ওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে আমরা কয়জন হেঁটে চললাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের 'গাড' হিসাবে একজন স্থূলবপু পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর। আমাদের সঙ্গী রাজবন্দীরা একটু পিছনে পড়েছিল, রক্ষীদের বড় দলটা ওদের সঙ্গে। সাব-ইন্‌সপেক্টর বেচারা আমাদের ডাণ্ডির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওঁর জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা ছিল না। ওঁকে বললাম, "মশাই, আমরা হেঁটে যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ একটা 'ডাণ্ডি'তে চড়ে কিছুটা রাস্তা চলুন।" ডাণ্ডি বাহকেরা নিতে নারাজ। কিন্তু হাজার হোক, পুলিশের লোক। তাই শেষ পর্যন্ত গাঁই-গুঁই করে বিশালদেহী ভদ্রলোককে বয়ে নিয়ে চললো।

খানিকটা যেতেই পথে পড়লো একটি কল কল রবে প্রবাহিনী নির্ঝরিনী। ক্ষীণ কলেবরা, কিন্তু জল কাক-চক্ষু নির্মল। উপরে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি ছোট সাঁকো। এর উপর দিয়েই আমাদের রাস্তা গিয়েছে। ভবেশ বাবু বললেন, "এই ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে চলুন একটু জিরিয়ে নেই। এমন জায়গার দেখা আমরা শহরবাসী বাঙালীরা কমই পেয়ে থাকি। এ জল কিন্তু একপ্রকার পরিস্রুত-ই বলা চলে। কারো ইচ্ছা হলে পান-ও করতে পারেন।"

এই গ্রীষ্মে অনভ্যস্ত পদে এতটা হেঁটে আমরা একটু পরিশ্রান্তই হয়ে পড়েছিলাম। তাই, ভবেশবাবুর প্রস্তাব সকলেই সানন্দে গ্রহণ করলাম। কী আরামদায়ক শীতল জল। হাত, মুখ, মাথা ধুয়ে সকলেই আকণ্ঠ জল পান করলাম, তারপর ঝর্ণার পাড়েই পাথরের উপর শরীর এলিয়ে দিয়ে কেউ বসলাম, কেউ অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বিশ্রাম নিতে লাগলাম। আমাদের পিছনের যাত্রীরা কেউ কেউ নিজ নিজ বাহনে চড়ে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। যাবার বেলায় কেউ স্মিত কটাক্ষ হেনে গেলেন। কেউ চলে আসার তাগিদ দিয়ে গেলেন।

উঠ্‌তে হলো আমাদের-ও। কতটা পথ যেতে হবে জানি না। তিনটি ডাণ্ডি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। লোক আমরা চারজন। আমার 'ডাণ্ডি' সেই দারোগা বাবুকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। তাই, পদব্রজেই সকলে চললাম, যদিও এবার চড়াই পথে যেতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তবে বনের শোভা দেখতে দেখতে প্রসন্ন মনেই চারজন এগিয়ে চললাম। রাস্তার একস্থানে একটু দূরে পাহাড়ের উপর একটা কুটির চোখে পড়লো। বোধ হয় একটি গ্রাম। অন্য কুটিরগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ঐ কুটিরটির পাশের বনের ভিতর থেকে একটি কলাগাছের ঝোপ মাথা চাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, একটি প্রকাণ্ড কলার কাঁদি-ও একটি গাছ

থেকে ঝুলছে—একেবারে পাকা, সূর্য্যের কিরণ পড়ে সোনার মত জল্ জল্ করছে। নিজেরাই বলাবলি করলাম, "এরা কি কলা খায় না নাকি? বাঁদরে-ও খায় না?"

সঙ্গের ডাণ্ডি-বাহকেরা কথাটা শুনেছিল। একজন বললো—"কলা খাবে বাবু? ছি-ছি, হু হু করতে হবে…" বলে শরীরটা একটু ঝাঁকালো। বুঝলাম, এই কলা খেলে ম্যালেরিয়া হয়। এটা ওদের ধারণা, কি সত্যি জানিনা। জানালো যে, বন্য প্রাণী বানরেও এ কলা খায় না।

আরেকটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, আমার ডাণ্ডি-বাহকেরা ডাণ্ডি নামিয়ে বসে আছে। তারা এই মেদ-বহুল দারোগা বাবুকে আর বয়ে নিয়ে যেতে রাজী নয়। দারোগাবাবুও পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। এইবার আমরা চারজন নিজ নিজ 'ডাণ্ডি'-তে উঠ্‌লাম। দারোগাবাবু বিশালবপু নিয়ে পিছন পিছন পদব্রজেই চললেন।

একধারে পাহাড়ের খাড়াই দেয়াল। অন্যদিকে অতল খাদ। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে চলেছে একদল তরুণ যুবক—দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে জীবনের ব্রত করে নেওয়ার অপরাধে যারা আজ নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে দুর্গম গিরি-চূড়ায় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী-জীবন যাপন করতে যাচ্ছে। কেহ চলেছে অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ ডাণ্ডি বাহকের স্কন্ধে। সঙ্গে তাদের বিদেশী শাসনের প্রতীক অস্ত্রধারী একটি পদাতিক পুলিশ বাহিনী ও কয়েকজন অফিসার।

যাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের ঘোড়ার রাশ ধরে যাচ্ছিল, ভুটিয়া অশ্ববাহক। ঘোড়াগুলির এমনই স্বভাব যে, রাস্তার যে-প্রান্তে খাদ, সেই প্রান্তের প্রায় সীমা ধরে চলবে। যদি কোন কারণে পা ফসকায়, তবে আরোহী-সমেত একেবারে পাতালে। হাড়-গোড় চূর্ণ অবস্থায় একতাল মাংস-পিণ্ড-ই হবে পরিণতি। একজন বন্ধু মনে হয়, অশ্বারোহণে অভ্যস্ত; বাহকের হাত থেকে নিজে লাগাম নিয়ে গোড়ালির গুঁতো দিয়ে ঘোড়াটাকে দৌড়াবার প্রেরণা দিলেন। একটু দৌড়ে গিয়েই অশ্ব-প্রবর পূর্ব্বেকার সেই মন্থর গতি অবলম্বন করলো এবং অশ্ব-বাহক এসে পুনরায় তার রাশ ধরলো। তিনিও আর ঘোড়া ছুটাবার চেষ্টা করলেন না।

আমাদের মালপত্র বহনকারী ভুটিয়া রমণীরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল। এইবার তারা বাঁ দিকের পর্ব্বত-গাত্রের উপর দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা রেখার মত সরু রাস্তায় উঠে গেল। এই রাস্তা নাকি বক্সা-ক্যাম্পে যাবার 'সর্ট-কাট' পথ। তবে পাহাড়ীরাই বোধহয় এরূপ রাস্তায় চলতে পারে। এই ভুটিয়াদের মাল বহন করবার পদ্ধতি-ও অভিনব। দড়ির পরিবর্ত্তে এক জাতীয় শক্ত লতা দিয়ে ওরা মালটাকে

জড়িয়ে নেয়। দড়ির অন্য দিকটা ওদের কপালে জড়ান থাকে, আর মালের বোঝাটা থাকে পিঠের উপর। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অনায়াসে এরা প্রকাণ্ড সব বোঝা বহন করে। আমাদের বড় বড় ট্রাঙ্ক, বেডিং ইত্যাদি এরা এইভাবে পিঠে নিয়ে পাথর বাঁধান তৈরী রাস্তা ছেড়ে কেমন ভাবে পাহাড়ের খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে গেল, আমরা তা' চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

বাঁ পাশের পর্ব্বত গাত্র অনেক স্থানেই ভিজে, স্যাঁৎসেতে। কোন কোন জায়গায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলও পড়ছে, দেখলাম। এই জায়গাগুলি একটু বিপজ্জনক। চোয়ান জল রাস্তায় এসে সেই স্থানটুকু পিছল করে দিয়েছে। পা' পিছলে পড়ে গেলে খাদের অতলে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ফোর্টের হাতায় যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল তিনটে, সাড়ে তিনটে হবে। কাঁটা তারে ঘেরা খেলার মাঠ বাঁয়ে রেখে উঁচো উঠে গিয়েছে আমাদের রাস্তা ফোর্টের ভিতর। আফিসের নিয়ম-মাফিক কাজগুলি সারা হওয়ার পর, যেই না দরজা দিয়ে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকেছি, দেখি দাঁড়িয়ে আছেন নীরদ চক্রবর্ত্তী, নলীন্দ্র সেন, মনি সিং, বিভূতি ঘোষ প্রভৃতি বন্ধুরন্দ। বিপুল অভ্যর্থনায় আমায় নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। ব্যারাক নং 'VI C'-তে নীরদবাবুর সিটের পাশেই আমার সিট পাতা হলো।

এইবার বক্সা ক্যাম্পের মোটামুটি একটা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে, ভুটান সীমান্তে হিমালয়ের ২,৫০০—৩,০০০ ফুট উচ্চতায় এই বক্সা দুর্গ অবস্থিত। পূর্বে ইহা ভুটান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ভুটান রাজই এখানে একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন। এক সময় (বোধহয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে) ভুটান রাজ্যের সহিত কোচবিহার রাজ্যের যুদ্ধ বাঁধে এবং কোচবিহার রাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের হাতে বন্দী হন। এই বক্সা দুর্গে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। পরে, তদানীন্তন ভারত-শাসক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহার রাজের সহায়তায় এসে ভুটিয়াদের পরাজিত করে এবং তাঁকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে। এই সময় থেকেই বক্সা দুর্গ ইংরেজদের দখলে আসে এবং সেখানে একটি ব্রিটিশ সেনা-নিবাস স্থাপিত হয়।

'রাজা ভাত খাওয়া' নামক যে রেল ষ্টেশনের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, সেই নামের উৎপত্তি-ও নাকি ঐ বন্দী কোচবিহার রাজের উদ্ধার প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত আছে। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মুক্ত হবার পর এইখানে এসেই নাকি প্রথম অন্নগ্রহণ করেন।*

---

* দ্রষ্টব্য—'দেশ' পত্রিকা ৭।১১।৮৩

আরেকটা কথা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিহারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বক্সার-দুর্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত এই বক্সা দুর্গকে অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। আলোচ্য স্থানটি 'বক্সা', ইহার পিছনে 'র' নেই।

বক্সা দুর্গের একটি মোটামুটি 'স্কেচ' এইসঙ্গে দেওয়া হলো।

বলাবাহুল্য একটি পাহাড়ের শিখর দেশে এই দুর্গটি তৈরী করা হয়েছে বলে এব ব্যারাকগুলি একই সমতলে অবস্থিত নয়।

বন্দী নিবাসে প্রথম ঢুকেই যে ব্যাবাকটি (৩নং) পড়ে, সেটিই সবচেয়ে উঁচুতে। সামনে একটি প্রশস্ত চাতাল আছে। চাতালেব পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটি বটগাছ ও ঝোপঝাড। তাবপরই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে ডান হাতে পডে ৪নং ব্যারাক। ক্রম নীচু পথে একটু হেঁটে গেলে সামনে পডবে ৫নং ব্যাবাক। উচ্চাবতল স্থান জুডে ব্যারাকটি অবস্থিত বলে এই লম্বা ব্যারাকটিকে 'A', 'B' ও 'C' এই তিনভাগে ভাগ কবা হয়েছে। এই ব্যারাকটি পুবোপুবি অনুশীলন দলের বন্দীদের দখলে ছিল।

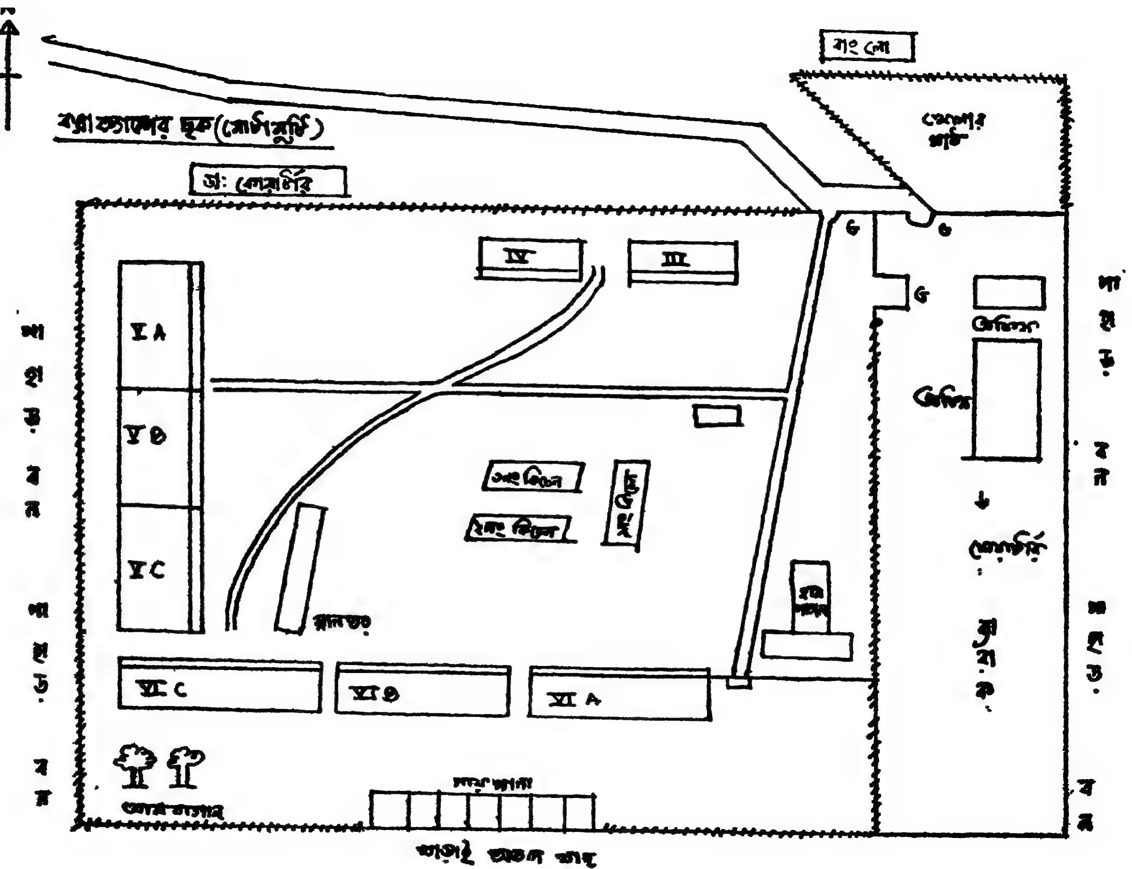
বাঁ পাশের এমনি আরেকটি ব্যারাক—VI 'A', 'B' ও 'C'। একই কারণে তিন ভাগে বিভক্ত। 'VI-C' তে যাঁরা থাকতেন তাঁবা সবাই কম্যুনিস্ট। আমি যে সময় ছিলাম, তখন অন্য যাঁবা সেখানে ছিলেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া গেল—

কালী সেন; নীবদ চক্রবর্ত্তী; আবদুর রেজ্জাক খাঁ; নলীন্দ্র সেন; জ্ঞান চক্রবর্ত্তী; মণি সিং; প্যারী দাস; জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

এছাড়া জেলে এসে কম্যুনিষ্ট হযেছেন এরূপ দু'জন বন্ধু আমাদের ঘরে স্থানাভাবেব দরুন ৩নং ব্যারাকে স্থান নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রায় সব সময়ই 'VI-C'-তে থেকে পড়াশোনা করতেন! তাঁদের একজন ঢাকাব ধীরেন রায (কুণ্ডু) ও অন্যজন হবিপদ বাগচী। হবিপদবাবু হিজলী থেকে বক্সা এসেছিলেন।

বন্দীশালার ভিতরকার প্রধান রাস্তাটি আফিস থেকে ক্যাম্পে ঢুকবার দরজা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচু দিকে গিয়ে ডান হাতে VI নং ব্যারাক ও বাঁ দিকে হাসপাতাল বিল্ডিংকে রেখে শেষ হয়েছে। এইখানে একটি লোহার গেট আছে। গেটের পর খানিকটা সমতলভূমি। সমতলভূমিটি শেষ হয়েছে এক অতল খাদের প্রান্ত দেশে। ক্যাম্পের ল্যাট্রিনগুলি তৈরী হয়েছে এই খাদের উপর। লোহার গেটটি রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং সেন্ট্রি থাকতো পাহারায়।

বন্দী-নিবাসের তিন দিকে সবুজ অরণ্যাবৃত ছোট ছোট পাহাড়। উত্তরদিকে


বাংলো
ডাঃ কোয়ার্টার
অফিস
I A
I B
I C
III
IV
VI A
VI B
VI C
G

এক পাহাড় শ্রেণীর পিছনে উচ্চ প্রশস্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সিনচুলা (Chinsula) পর্বত। অনেক দূরে নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্যাম্পের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে মনে হতো সিঞ্চুলা যেন এই দুর্গের উপর সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন বিকালবেলা দেখা গেল, দুইজন ইউরোপীয় সিনচুলার প্রশস্ত শিখর থেকে আমাদের উদ্দেশে টুপি নাড়ছেন। আমরাও রুমাল নাড়িয়ে প্রত্যুত্তর জানালাম। পরে জানা গেল আমাদের ক্যাম্পের কম্যাণ্ডেন্ট ও সহকারী কম্যাণ্ডেন্ট মিঃ গিনে ও মিঃ লিণ্ডেলিন সেদিন সিনচুলার শৃঙ্গে উঠার অভিযানে গিয়েছিলেন। ঐ শিখর থেকে ক্যাম্পের অভ্যন্তর ভাগ স্পষ্ট দেখা যায়।

ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে অতল খাদ। আমাদের ছয় নং ব্যারাকের পিছনে খানিকটা সমতল স্থানের উপর কয়েকটা আম গাছ। তার কিছু পরেই খাড়া নেমে গিয়েছে কয়েক হাজার ফিট গভীর খাদ। এখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালে দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি। আলো-আঁধারিতে এ বিস্তীর্ণ সমভূমি বিশাল সমুদ্র বলে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নয়। একজন নবাগত বন্দী নাকি একদিন সন্ধ্যায় এখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চল এটা?

ক্যাম্পে হেঁসেল ছিল তিনটি। ১নং কিচেন অনুশীলনের, ২নং যুগান্তরের এবং যারা অনুশীলন বা যুগান্তর কোন দলেরই ছিলেন না, তাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল ৩নং কিচেনে। অর্থাৎ অনুশীলন এবং যুগান্তর থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা 'থার্ড-পার্টি' গঠন করেছিলেন, তাঁরা এবং কম্যুনিষ্টরা এই কিচেনে আহার করতেন। কিচেন তিনটির পরিচালনা ভার বন্দীদের নিজেদের হাতে ছিল। ৩নং কিচেনের ম্যানেজার ছিলেন দক্ষিণা মিত্র অনুশীলনের **Revolt Group** এর অন্তর্গত। হেঁসেল পরিচালনায় তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন লোকটি-ও ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিপ্লবী দলগুলির প্রবীণ নেতা, যাঁরা তখন বক্সায় ছিলেন, তাদের ভিতর এদের নাম মনে পড়ছে :—

প্রঃ জ্যোতিষ ঘোষ সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ; নিরণ মুখার্জী , মনোরঞ্জন গুপ্ত , অরুণ গুহ।

এরা সকলেই 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর। অনুশীলন দলের ছিলেন :—

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ) , প্রতুল গাঙ্গুলি ; রবি সেন , আশু কাহিলী ; জ্ঞান মজুমদার প্রভৃতি।

'বি, ভি' (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স)-র নেতা হেম ঘোষ ও সত্য বক্সী-ও তখন বক্সা ক্যাম্পে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে।

এ ছাড়া ছিলেন ময়মনসিংহের প্রথম যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী। ময়মনসিংহে 'আচার্য্য পার্টি' নামে প্রথমে তাঁর দল পরিচিত ছিল। পরে ঐ দল যুগান্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। হেমেন্দ্র কিশোর ইউরোপীয় ধাঁচে জীবন ধারণে অভ্যস্ত বলে হাসপাতালের সংলগ্ন একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা তাঁর জন্য করা হয়েছিল। সেখানে তাঁর খাবার দাবার ব্যবস্থাও ইউরোপীয় ধরণেরই ছিল।

* * * *

'VI C' তে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পূর্ব্ব পরিচিত। বহুদিন পর পুরানো বন্ধুদের পেয়ে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। বিছানা-পত্র গুছিয়ে একটু বিশ্রামান্তে সকলে মিলে চা খেতে কিচেনে গেলাম। সেখানে নলীন্দ্র সেন বললো, যাক, সুধাংশুবাবু আসাতে আমাদের সমস্যাটা মিটে গেল।"

সমস্যাটা কী, শুনলাম। সে সময় মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল' নামে ছোট একখানা ইংরেজী বই বাজারে প্রচলিত ছিল। বইখানা 'ক্যাপিটেল' এর প্রথম খণ্ডের উপর ভিত্তি করে লেখা। লেখকের নামটা ভুলে গেছি। বন্ধুরা বইখানা পড়েছিলেন। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোল দ্বারা মিটিয়ে তাঁদের তৃপ্তি হলো না। মার্ক্সের মূল ক্যাপিটেল পড়বার আগ্রহ তাদের জন্মালো। বেশ কয়েকটি পুস্তকালয়ে তাঁরা চিঠি লিখলেন কিন্তু কেউই কার্ল মার্ক্সের মূল ক্যাপিটেল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের সন্ধান তাঁদের দিতে পারলো না। ঐ সময় বুখারি বক্সা ক্যাম্পে আটক ছিল। সে Nelson & Co নামে বোম্বের একটি পুস্তকালয়ের ঠিকানা দিল। এরা নাকি বিদেশ থেকেও বই আনিয়ে খদ্দেরদের সরবরাহ করে থাকে। Nelson & Co.-তে যথারীতি অর্ডার দেওয়া হলো। তারপর বহুদিন পার হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বুখারি বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে করাচীতে চলে গিয়েছে।

বেশ কিছুদিন পর Nelson Co থেকে এক ভি, পি, এসে হাজির। টাকা চল্লিশ মত দিয়ে ভি, পি, পার্শেলটি ছাড়াতে হবে। কিন্তু বন্ধুদের কারো একাউন্টেই এই টাকা নেই। কয়েকদিন ধরে V P. পড়ে আছে; ছাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই সঙ্কট সময় আমার আগমন। আমি নতুন এসেছি। গভর্ণমেন্ট থেকে প্রাপ্য সব টাকাই আমার একাউন্টে জমা পড়বে। কাজেই আমার টাকা দিয়ে ভি, পি, ছাড়ান সমস্যার সমাধান হওয়াতে বন্ধুরা খুশী। আমি-ও এসেই মার্ক্সের 'Capital' পড়ার সুযোগ পাবো ভেবে আনন্দিত।

প্রসঙ্গতঃ জানাই, ঐ সময়ে ডেটিনিউদের, তেল, সাবান, টুথপেস্ট, জামাকাপড় বই ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনবার জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে মাসিক বত্রিশ টাকা করে ভাতা দেওয়া হতো। খাওয়া খরচার বরাদ্দ ছিল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। দুরধিগম্য স্থান বলে বক্সায় একটু বেশী দেওয়া হতো, মাথাপিছু দৈনিক চার টাকা। পরে অবশ্য ধাপে ধাপে ঐ সব ভাতা কমে যায়। পকেট ভাতা প্রথম ধাপে কমে গিয়ে হয়, কুড়ি টাকা, পরে দশ টাকা। আমি অবশ্য তখন বক্সা ছেড়ে দেউলি চলে গিয়েছি। বক্সাতে দু'শ টাকার একটা শীতকালীন এলাওয়েন্স-ও পাওয়া যেত।

যাইহোক, আমাদের সঙ্কট মোচনের জন্য অফিসে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, নেলশন কোম্পানী থেকে যে-ভি, পি, পার্শেলটা এসেছে সেটা যেন সুধাংশু অধিকারীর একাউন্টের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং যথাসম্ভব সত্বর বইখানা ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কয়েকদিন পর অফিস থেকে যথারীতি censored হয়ে বই ভিতরে এলো। কার্লমার্ক্সের 'ক্যাপিটেল'– তিন ভলিউম। তিন খণ্ডে মিলে আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বই। শিকাগো সহরের **Charles H. Kerr & Co** দ্বারা প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন **Samuel Moore & Edward Aveling**—তৃতীয় জার্মান এডিশন থেকে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদক **Ernest Unterman**। দ্বিতীয় জার্মান এডিশন থেকে এটা অনূদিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের-ও অনুবাদ করেছেন, **Ernest Unterman,** প্রথম জার্মান এডিশন থেকে। বই পেয়ে আমরা মহাখুশী। এ যেন এক দুর্লভ রত্ন লাভ হয়েছে। * কবে পড়া শুরু হবে উদগ্রীব ভাবে সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

আমি যখন বক্সা গেলাম। তখন কালীদা' (কালী সেন) সেখানে ছিলেন না। শুনলাম, কয়েকদিন আগে তাঁকে কালিম্পং-এ অন্তরীণ করে পাঠান হয়েছে। সেখানে সপরিবারে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, বন্ধুদের বন্দীদশায় রেখে এই অর্দ্ধমুক্ত জীবনযাপনে বোধহয় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই, অচিরেই তাঁর ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটলো।

একদিন সবাই মিলে ঘরে বসে আছি, বেলা দু'টো আড়াইটে হবে। বিকালের পড়ার আসরটা শুরু করার তোড়জোড় হচ্ছে। এমন সময় 'লাউ গাছি' ছুটে এসে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে জানালো, "কালীবাবু আ গিয়া।"

---

* শিকাগোর **C H. Kerr & Co.** কর্তৃক প্রকাশিত এই সংস্করণটিই ইংরেজী অনুবাদে সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশিত মার্ক্সের মূল 'ক্যাপিটেল'-গ্রন্থ।

'লাউগাছি' আমাদের ব্যারাকের ভুটিয়া বালক-ভৃত্য। ভুটিয়া ভাষায় তার নাম 'লা টুয়া গ্যাছে'। আমরা বঙ্গাষণ করে নিয়ে 'লাউগাছি' বলে ডাকি। বছর ১৩।১৪ বয়স, চমৎকার ফুটফুটে চেহারা। চোখ দুটো একটু ছোট না হলে মোঙ্গল-জাতি-উদ্ভূত বলে মনেই হতো না। কোন ইউরোপীয় সাহেবের বাচ্চা বলে ভুল হতো। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। বক্সা ক্যাম্পে আরো অনেক ভুটিয়া বালক ছিল। বিভিন্ন ব্যারাকে পরিচারকের কাজ করতো। শিক্ষার অভাবে এবং অপরিসীম দারিদ্র্যের দরুণ এদের জীবনটা কী নির্মম ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, দেখে মনে মনে আমরা খুবই ব্যথা অনুভব করতাম। 'লাউগাছি'কে কতদিন বলেছি, "ছাখ্, আমরা ছাড়া পেলে তোকে কলকাতা নিয়ে যাবো; লেখাপড়া শিখিয়ে আফিসে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেব।" সে খুব খুশী হতো।

'লাউগাছি'র কথা শুনে আমরা ছুটে বারান্দায় এলাম। দেখতে পেলাম, কিচেনের সম্মুখস্থ পাথরে ইঁটা রাস্তা ধরে কালীদা তাঁর লম্বা চেষ্টারফিল্ড কোট গায়ে সহাস্যবদনে হেলতে দুলতে নেমে আসছেন। হৈ চৈ বিলাসী নলীন্দ্র সেন 'থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ কালীদা' বলে চেচিয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

ঘরে এসে হাসতে হাসতে কালীদা' বললেন, ব্যাটাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি। আমার থাকবার জন্য বাসা ঠিক করেছে কিনা এমন একটা জায়গায় যে, ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে হলেই খানা খন্দ ডিঙিয়ে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নামতে হবে। থানা অফিসারকে বল্লাম। **"Is my wife a dancing girl that you have selected such a place for me to live with my family?** জানালাম, এ জায়গায় আমি কখ্খনো থাকবো না; বিধি নিষেধ ভঙ্গ করে বরং জেলে যাবো।' ব্যাটারা ঘাবড়ে গেল; কয়েকদিন পরেই যেখান থেকে গিয়েছিলাম, সেখানে ফেরৎ পাঠিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।"

আমাদের পড়ার আসরটা এবার বেশ জমে উঠ্লো। একটা ঘরে আমরা কম্যুনিষ্টরা একসঙ্গে থাকাতে সব দিক দিয়েই সুবিধা হয়েছিল। বিশেষ করে পড়া-শোনার ব্যাপারে। পড়াশোনাটাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। সকালে এবং দুপুরে মিলিয়ে দৈনিক ৫/৬ ঘন্টার মত আমাদের ক্লাস চলতো। এবং তা' নিয়মিত ভাবে, রুটিন-মাফিক।

'ক্যাপিটেল' বইখানা নূতন এসেছে। এবার কালীদা' আসার পর সেটাই শুরু করা গেল। প্রধান পাঠক ছিলেন যদিও কালীদা', তবুও প্রত্যেককেই পালা করে কিছু কিছু অংশ পড়তে হতো। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এবং আলোচনা। মার্ক্সের বক্তব্যগুলি

মার্ক্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন পাঠকের মস্তিস্কে না ঢোকা পর্য্যন্ত বলে যেতেন। নলীন্দ্র সেন একদিন ঠাট্টা করে বললো, "মার্ক্স বোধহয় ভাবতেন, তাঁর 'Capital' যারা পড়বে, ওরা সব গবেট; তাই হাতুড়ি পিটিয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি ওদের মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করছেন।" ক্যাপিটেলের তিনটি খণ্ডই আমরা বেশ যত্ন সহকারে পড়েছিলাম। তখন মনে হতো, এই একটি বই পড়লেই তো মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে একরকম জ্ঞান লাভ করা যায়। আর কী সুন্দর লেখা। পড়তে গিয়ে আমাদের মোটেই ক্লান্তির ভাব হতো না। অবশ্য, প্রথম খণ্ডের বেলায়ই এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পরে যে বই বক্সা ক্যাম্পে পড়া হয়েছিল, তার একটা মোটামুটি ফিরিস্তি দিচ্ছি। মার্ক্সবাদ অধ্যয়নের শুরুতেই আমরা পড়তাম Engels-এর 'Socialism utopian & Scientific বইখানা, এবং Bogdanov ও Lapidas লিখিত Marxian Economics সম্বন্ধে দু'খানা বই। পরে Communist Menifesto Historical Materialism (Bukherin) Family, Private Property & State (Engels) Ancient Society (Morgan) Darwin-এর Theory of Evolution সম্বন্ধে একখানা বই, The Mothers (Briffault), Conditioned Reflex (Pavlov) Leninism (Stalin) Materialism & Emperio criticism (Lenin) ইত্যাদি।

'Conditioned Reflex পড়বার আগে মানুষের শারীর বিদ্যা, বিশেষ করে মস্তিস্ক ও Nervous System এর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য Gray's Anatomy বইখানা পড়া হয়। কালীদা ইহা পড়বার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের বুঝিয়েছিলেন।

একটা কথা এখানে কারো কারো মনে জাগতে পারে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কি তা'হলে ডেটিনিউদের প্রতি এতই উদার ছিল যে, এই সমস্ত রাজনৈতিক ও বৈপ্লাবিক পুস্তক পড়বার জন্য একেবারে ঢালাও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল?

কথাটা তা' নয়। প্রথম দিকে আই বি, পুলিশের কর্তারা কোন্ বই ডেটিনিউদের পড়তে দেওয়া যেতে পারে এবং কোনগুলি নয়, সে বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তারপর সাম্যবাদ সম্বন্ধে পুস্তকের কোন ধারণাও তখন তাদের ছিল বলে মনে হয় না। আমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন পুলিশ Historical Materialism (Bukherin), Socialism-Utopian & Scientific (Engels) এবং Communist Menifesto প্রভৃতি কয়েকখানি বই আমার বাসস্থান থেকে আটক করে। বিচারাধীন থাকা কালে ঐ বইগুলি পুলিশের জিম্মায় ছিল। কিন্তু যখন আমাকে B. C. L. A. act-এ রাজবন্দী করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠান হলো, তখন বইগুলি-ও আমার সঙ্গে

বক্সা দুর্গে বন্দী কয়েকজন কম্যুনিষ্ট (১৯৩১ সাল)



সামনে দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে) :—নীরদ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) ; হরিপদ বাগচী (রাজশাহী) ; বিভূতি ঘোষ (খুলনা) ; আব্দুর রেজ্জাক খাঁ (কলকাতা) ; প্যারী দাস (বরিশাল) ; বিষ্ণু চ্যাটার্জী (খুলনা)।

পিছনে বসে (বাঁদিক থেকে) :—নরেন্দ্র সেন (ঢাকা) ; জগদীশ চক্রবর্তী (ঢাকা) ; গোপাল দুবে (বহরমপুর) ; প্রমথ ভৌমিক (খুলনা) ; সুধাংশু অধিকারী (ময়মনসিংহ)।

দিয়ে দেওয়া হয়। বক্সা ক্যাম্পে-ও সে বইগুলি কর্তৃপক্ষ আমাকে সঙ্গে নিতে দিয়েছিলেন। আর অনেক সাম্যবাদী পুস্তক বন্ধুরা ইতিমধ্যেই সেখানে কিনেছিলেন। যদি ও Censor করার নিয়ম ছিল, তথাপি এইসব বই সে সময় বড় আটকান হতোনা।

কিন্তু কড়াকড়ি হয়েছিল পরে। আমি তখন দেউলি বন্দী নিবাসে। তখন বই দিতে যেমন censor-এর কড়াকড়ি হয়, তেমনি নিয়মিতভাবে ক্যাম্পের ভিতর 'সার্চ' করে আগে দেওয়া পুস্তকগুলিও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হতো। তাই, সে-গুলি রক্ষা করারও নানা কৌশল আমাদের অবলম্বন করতে হতো। তবে, সে কথায় আসা যাবে পরে, যখন দেউলি সম্বন্ধে লিখতে যাবো।

Dialectical Materialism সম্বন্ধে বক্সাতে পড়েছিলাম দু'খানা বই। লেনিনের Materialism & Emperio criticism এবং বুখারিনের Historical Materialism। Worrail-এর লিখিত The outlook of Science নামক একখানা সুন্দর বই এ সম্বন্ধে পড়েছি। কিন্তু সেটা বোধ হয় দেউলি গিয়ে। লেনিনের বইটি বেশ কঠিন মনে হতো এবং বুখারিনের বইটিতে যেন Mechanestic Materialism এর দিকে একটু বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল। তবে আলোচনার মাধ্যমে পড়া হতো বলে অনেক দুরূহ বিষয়ও বোধগম্য হতে খব অসুবিধা হতো না। 'Communist Menifesto' এবং লেনিনের 'Iskra Period' ও 'Revolution—1917' বইগুলিতে Ryazanov-এর প্রদত্ত টিকাগুলি ঐ বইগুলি পাঠে আমাদের খুব সহায়ক ছিল।

* * * *

বস্তুবাদ ও ভাববাদ নিয়ে ক্যাম্প একসময় বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। কম্যুনিষ্টরা বস্তুবাদী ; অন্য বিপ্লবী দলের বন্ধুরা অনেকেই মার্ক্সের অর্থনীতির দিকটা মানতে রাজী ছিলেন কিন্তু বস্তুবাদী দর্শন তাঁদের নিকট অগ্রাহ্য ছিল। এই নিয়ে দু'পক্ষে একটু রেষারেষি-ও ছিল।

একদিন রুনুবাবু (শৈলেন দাসগুপ্ত) হন্তদন্ত হয়ে আমাদের ঘরে এসে বললেন, "না মশায়, Materialism আর টিকলো না।"

রুনুবাবু সম্বন্ধে একটু বলে নিই। শৈলেন দাশগুপ্ত বরিশালের 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট কর্মী। যদিও তিনি যুগান্তরের বন্ধন প্রকাশ্যতঃ ছিন্ন করেন নি, তবু ভাবধারার দিক থেকে অনেকটা কম্যুনিষ্টদের সমগোত্রীয় ছিলেন। মার্ক্সীয় গ্রন্থাদি তিনি নিজে অনেক পড়তেন এবং বক্সাতে আমি গিয়ে দেখেছি, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গেই তাঁর মহরম মহরম বেশী ছিল। নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "আমার ঠাকুর্দা একদিন

ভগবানকে বিদায় দিয়েছিলেন। আমি সেই ঠাকুর্দ্দার পতাকাবাহী সুযোগ্য নাতি।"

এ হেন রুণু দাশগুপ্ত হঠাৎ এমন মুষড়ে গেলেন কেন?

কারণ-টা জানা গেল। সম্প্রতি Sir Arthur Eddington ও Sir James Jeans নামক দু'জন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের লেখা দু'খানি গ্রন্থ ক্যাম্পে এসেছে। বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁরা নানা বস্তুবাদী তথ্যের পরিবেশ করেও শেষ পর্য্যন্ত এক অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাস দিয়েছেন—বিজ্ঞান-ও যাঁকে ধরতে ছু'তে পারে না।

জিন্‌স্ ও এডিংটনের বই দু'খানা আসার পর ভাববাদী মহলে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। বস্তুবাদী কম্যুনিষ্টদের উপর তাঁরা একহাত নিতে পারবেন ভেবে উল্লসিত হলেন। ঢাকা শ্রীসঙ্ঘের নেতা অনিল রায় মস্ত বড় একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। কমনরুমে সেটি পঠিত হলো। বস্তুবাদকে নস্যাৎ করে দিতে পেরেছেন বলে অকম্যুনিষ্ট মহলে তাঁর জয় জয়কার পড়ে গেল।

জিন্‌স্ ও এডিংটনের লেখা-দুটো আমরাও পড়লাম। প্রমথ ভৌমিকের উপর ভার দেওয়া হলো পাল্টা প্রবন্ধ লিখে অনিল রায়ের প্রবন্ধের যথোচিত উত্তর দিতে। প্রমথ বাবুর প্রবন্ধ পড়ে আমাদের তরফ থেকে অনুমোদন করা হলো এবং কমনরুমের পরের অধিবেশনে সেটা পঠিত হলো।

প্রমথবাবুর প্রবন্ধে দেখান হয়েছিল, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে অপসৃয়মান ভাববাদকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া ও পুরোহিত শ্রেণীর একটি মরিয়া হইয়া প্রয়াস জিন্‌স্ ও এডিংটনের এই লেখা দুইটি। যে দার্শনিক ভিত্তির উপর এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান আজ প্রতিপদে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, তাহা কত ঠুন্‌কো। জিন্‌স্ ও এডিংটন বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকৃত বস্তুবাদী তথ্য পরিবেশন করেছেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অসমাধিত কিছু রহস্যের জের টেনে নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে ভগবানের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা' না দিয়ে তাঁদের গত্যন্তর-ও ছিল না। প্রথমতঃ নিজেদের শ্রেণীগত চেতনা ত' ছিলই, দ্বিতীয়ত এই লেখা দু'টি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকদের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান (নামটা আজ মনে নেই) কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েই লিখিত হয়েছে। আর তার জন্য তাঁরা পারিশ্রমিক পেয়েছেন, কয়েক লক্ষ ডলার। কাজেই, প্রভুর মন রক্ষা না করে তাঁদের কোন উপায় ছিল কি?

শেষের তথ্যগুলি আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। বোধ হয়, কোন বিদেশী পত্রিকা থেকে।

প্রমথ বাবুর প্রবন্ধের জের-ও ক্যাম্পে বেশ কিছুদিন অনুভূত হয়েছিল।

Engels এর Socialism—utopian & Scientific-বইখানা বাংলায় অনুবাদের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন, যতটা অনুবাদ হয়েছে, তা' ক্লাসে পড়ে শোনাতে হতো। বন্ধুরা তাঁদের মত বা মন্তব্য জানাতেন। মাঝে মাঝে অনুবাদটা আমারই মনঃপূত হতো না। কিন্তু কালীদা' আমায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। Revision-এর সময় যে, লেখাটা আরো ভালো হবে, তা' তিনি জোর দিয়ে বলতেন। বইখানা শেষ করেছিলাম এবং মোটামুটি ভালই হয়েছিল বলে বন্ধুরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পাণ্ডুলিপিখানা বহুদিন কাছে ছিল এবং সুযোগ হলে তা' ছাপান হবে, এরূপ অভিপ্রায়-ও ছিল। কিন্তু দেউলিতে Periodic Search-এর সময় কর্তৃপক্ষ এটা Seize করেন। পরে আমাকে জানানো হয় যে পাণ্ডুলিপিখানা কলকাতা I. B.-তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাড়া পাবার পর অনেক লেখালেখি করেও I. B. থেকে ওটা আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি। আমার অনেক বই-এর-ও একই গতি হয়েছে।

* * *

কয়েকটা ভাষা শেখার চেষ্টা শুরু করেছিলাম, বক্সাতে। তন্মধ্যে উর্দ্দু ও জার্মানের চর্চ্চাটা দেউলিতে গিয়ে-ও বজায় ছিল। উর্দ্দুতে হাতে খড়ি হয় ১৯২৫ সালে যখন কুল্লীতে অন্তরীন ছিলাম। নাসের আলী নামে একজন পেশোয়ারী কনেষ্টবল আমার প্রথম শিক্ষক। কিন্তু কুল্লী থেকে যখন বদলি হয়ে অন্যান্য স্থানে গেলাম, তখন সে-সব স্থানে আর উর্দ্দু-ভাষা চর্চ্চার সুযোগ পাইনি। এইবার আব্দুর রেজাক খাঁকে একজন সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়া গেল। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে নীরদবাবু, নলীন্দ্র সেন প্রভৃতিও উৎসাহভরে লেগে গেলেন। মাঝে মাঝে বেশ মজার ব্যাপার হতো। একদিন সবাই মিলে পড়ছি—"শের খতরনাক জানোয়ার হ্যায়।" মানে বেশ বুঝতে পারলাম, "বাঘ হিংস্র প্রাণী।" পরের লাইনে পড়লাম—"মগর পানি মেঁ রহতা হ্যায়।" —এর অর্থ ত "কিন্তু জলে থাকে।" বাঘ আবার জলে থাকে নাকি? তিনজনে মিলে বহুক্ষণ মাথা ঘামালাম। না, ছাপা অস্পষ্ট নয়। আমাদের বুদ্ধিতে কুলালো না—"বাঘ হিংস্র প্রাণী; কিন্তু জলে থাকে—" এ কী করে হয়। অবশেষে নলীন্দ্র সেন তার স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক মিশ্রিত স্বরে বললো—"ওদের দেশে বাঘ-ও বোধ হয় জলেই থাকে।' সবাই হাসলাম। সেদিনকার পাঠ সেখানেই বন্ধ হলো।

খাঁ সাহেব তখন ঘরে ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসা মাত্রই তিনজনে তাঁকে ঘিরে ধরলাম—"কি খাঁ সাহেব, বাঘ আবার জলে থাকে নাকি? কী সব ছাই ভস্ম লিখেছে, উর্দ্দু বইয়ে।" খাঁ সাহেব একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

বললেন,—"কী বাজে কথা বলছেন ? আনুন দেখি বই।" বই এলে লাইন দুটো পড়ে তিনি হেসেই আকুল। "আরে, এ মগর নয়, 'মাগর', মানে কুমীর। কুমীর জলে থাকে।"

যাঃ ব্বাবাঃ। এ আবার সেই জবর, জের, পেশের ব্যাপার। অক্ষরের উপরে বা নীচে সামান্য একটু চিহ্ন ব্যবহার করে আকার, একার বা উ-কার উচ্চারিত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন ব্যবহাব করা হয় শুধু প্রথম শিক্ষার্থীদের বেলায। পরে চিহ্ন ছাড়াই উর্দ্দু-ভাষীরা বুঝতে পারেন, উচ্চারণ কী হবে। "আজমব গিয়া" এবং "আজমীর গিয়া"-ব গল্পটা মনে হলো।

উর্দ্দু খানিকটা রপ্ত হওয়ার পর খাঁ সাহেব একদিন আমাকে কলকাতা থেকে বক্সা পর্য্যন্ত আসার ভ্রমণ-কাহিনী উর্দ্দুতে লিখতে বললেন। দুই-তিন দিন ধরে বেশ বিশদ ভাবে লিখে খাঁ সাহেবকে দিলাম। লেখাটা পড়ে খাঁ সাহেব ত' আনন্দে উৎফুল্ল। "আরে, সুধাংশু বাবু কী সুন্দর লিখেছেন। তিনি যে একজন কবি। 'জাদুভবী আঁখোঁ সে— বাঃ কী চমৎকার হযেছে—"

প্রবন্ধটির একটি স্থানে এই ধবণেব লেখা ছিল—'রাজাভাত খাওযা ষ্টেশন ছাড়িয়ে ছোট লাইনেব গাড়ী বনাঞ্চলেব ভিতর দিযে এঁকে বেঁকে গিযে একটি ষ্টেশনে থামলো। সেই অঞ্চলে বোধ হয় জলকষ্ট। গ্রামের মেযেরা কলসি নিয়ে রেল-লাইনেব ধারে অপেক্ষা করছিল। গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে তাদেব কলসীতে জল দেওযা হচ্ছিল। সেই গ্রাম্য মেয়েরা যখন তাদের যাদু-ভরা চোখে আমাদেব দিকে তাকিযে দেখছিল, আমাদের পাষান প্রাণেও এক আনন্দের শিহরণ জেগে উঠছিল—"

এই অংশটুকু পড়েই খাঁ সাহেবেব এই আনন্দোচ্ছ্বাস।

জার্মানটা শিখেছিলাম, অনুশীলনেব সুরপতি চক্রবর্ত্তীব কাছে। রোগাটে, লম্বা চেহারার এই ভদ্রলোক অশেষ গুণেব অধিকারী ছিলেন। বেশ কযেকটা ভাষা জানতেন। পরবর্ত্তী জীবনে **Indian Statistical Institute**-এ (বরানগর) চাকরী করতেন। বর্ত্তমানে তিনি লোকান্তরিত।

জার্মান ভাষার উচ্চারণটা সঠিক হ'তে হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে সাহায্য নিতাম উত্তরবঙ্গের (রাজশাহী ?) সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি (কালু ব্যানার্জি)-র কাছে। তিনি কিছুদিন জার্মানীতে পড়াশুনা করেছেন এবং সেখানকার পি, এইচ, ডি, উপাধিধারী, 'যুগান্তর' দলের লোক ছিলেন তিনি।

জার্মান ভাষার চর্চ্চা দেউলিতেও বজায় ছিল। রুনু দাশগুপ্ত এ বিষয়ে আমার

সহায়ক ছিলেন। তিনি জার্ম্মান-ভাষা জানতেন এবং 'Welt Rund Schau' (World Review) নামক একখানা জার্ম্মান সাময়িক পত্রের গ্রাহক ছিলেন। বন্দীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে অন্য কোন ভাষার চর্চ্চা করার সুযোগ ছিল না। তাই আজ সে-সব সম্পূর্ণ বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে। উর্দ্দুটা এদেশের ভাষা বলেই হয়ত, দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর-ও বেশী কালের চর্চ্চার অভাবে-ও একেবারে ভুলে যাই নি।

* * * *

খেলার মাঠ ছিল ক্যাম্পের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। কয়েকশ' ফিট নিম্ন-সমতলে অবস্থিত। কাঁটা তারে বেষ্টিত এবং সান্ত্রী-পরিরক্ষিত। মাঠের উত্তর দিকে একটি গেট পেরোলেই কম্যাণ্ডেন্টের বাংলো। এখনো নাকি ওটাকে ফিনে সাহেবের বাংলো বলা হয়। E G. Finney ছিলেন বক্সা ক্যাম্পের প্রথম কম্যাণ্ডেন্ট। বর্ত্তমানে ঐ বাংলোতে বক্সা পোষ্ট আফিস অবস্থিত।* মাঠের পূব দিকে শ্যামল অরণ্য। তার ভিতর থেকে মাথা তুলেছে ছোট ছোট পর্ব্বত শীর্ষ। সে-গুলিও সবুজ ছোট ছোট বৃক্ষ এবং লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। অতি মনোরম দৃশ্য। মনে হতো যেন, এই বন, এই পর্ব্বত চূড়া আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কম্যাণ্ডেন্ট-এব সঙ্গে একদিন দববার করা হলো—এই সুন্দর পরিবেশে থেকেও বন্দী জীবনেব এক ঘেয়েমিতে আমরা ভুগছি। কারো কারো স্বাস্থ্য-হানিও ঘটছে। এই পাহাড-গুলিতে আমাদেব মাঝে মাঝে বেড়াতে দেওয়া যায় নাকি?

অনুমতি মিললো। দশ থেকে পনেব জনের এক একটি ব্যাচ উপযুক্ত সান্ত্রীর পাহাবায় বিকালের দিকে ঘন্টাখানেকের জন্য বেডাতে যাওয়া চলবে। প্রথম ব্যাচেই বোধহয় গিয়েছিলাম। কাঁটাতারের বাইবে এই সুন্দর শ্যামলিমাময় জগতে বেরুতেই বেশ একটা আনন্দের অনুভূতি পেলাম। পাহাড়ের শিখরটাকে ঘিরে একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা একদিকে উপরে উঠে গিয়ে আবার অন্যদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এসেছে। হৈ-চৈ করে সবাই উঠলাম। মাঝে মাঝে পাথরের প্রশস্ত চাঁই-এর উপর উপবেশন করে বিশ্রাম ও প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-পান—কী ভালই না লাগলো!

দিন কয়েক মাত্র অল্প সংখ্যক বন্দীই এই সুযোগটা ভোগ করতে পেরেছিলেন। অজানিত কারণে কম্যাণ্ডেন্ট-এর আদেশে হঠাৎ একদিন এই সুবিধা-দান বন্ধ হয়ে গেল।

খেলার মাঠে ফুটবল ও হকি—এই দুটো খেলা মরশুম অনুযায়ী খেলা হতো। ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত মাঠ এ'টা ছিল না। Indoor game-এ তাস, ক্যারম

* 'দেশ' পত্রিকার ৭-১১-৮৩।

প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া তিন নম্বর ব্যারাকের সম্মুখস্থ চাতালে একটি ব্যাড্মিন্টন কোর্ট-ও ছিল। **Indoor** ও **Outdoor** উভয় প্রকার খেলাতেই অংশ নিতাম। হকি ষ্টিকের একটি আঘাতের দাগ মুখমণ্ডলে চিরাঙ্কিত হয়ে আছে।

কর্তৃপক্ষের সুযোগ সুবিধাদানের কথা যখন উঠ্লো, তখন আর দু'টো ব্যাপারের-ও উল্লেখ করছি।

একবার কম্যাণ্ডেন্ট-কে বোঝান হলো—আমরা ডেটিনিউরা অনেকেই বহু বৎসর যাবৎ ঘরছাড়া। ছাড়া পেয়ে কবে ঘরে যাবো তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা যদি অন্ততঃ আমাদের একখানা ফটো পান, তবে তাঁদের মনে খানিকটা শান্তি আসবে। আমাদের ফটো তোলার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় না কি? ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। জলপাইগুড়ি শহরের এক ফটোগ্রাফারকে আনানো হলো, সে ক্যাম্পে ঢুকতে পারবে না। ক্যাম্পের বাইরে খেলার মাঠে গিয়ে আমরা দাঁড়াবো—সে ফটো তুলবে। আফিস থেকে সেই ফটো আমাদের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু একবার অনুমতি দেওয়ার পরই এই সুযোগ দান বন্ধ করে দেওয়া হলো। কাজটা সঠিক হয়নি, বিবেচনা করেই হোক, অথবা উপর থেকে আই, বি-'র নির্দেশ পেয়েই হোক, কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বার আর এই অনুমতি দিতে রাজী হলেন না। প্রথম সুযোগের এই ফটোর একটি কপি আজ-ও আমার নিকট রক্ষিত আছে।

অনুশীলনের কেশব চ্যাটার্জি রোগে ভুগে ভুগে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিলেন। কোন ওষুধেই কাজ করছিল না। ডাক্তার বললেন, ক্যাম্পের বদ্ধ আবহাওয়ার বাইরে কিছুক্ষণ নিয়মিত ভ্রমণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। সেই ব্যবস্থা হলো। রোজ বিকেল বেলা কিছুক্ষণ পাল্কী করে তাঁকে সিপাইর পাহারাধীনে ক্যাম্পের সন্নিহিত অঞ্চলে ঘুরিয়ে আনা হতো। কতদিন এই ব্যবস্থা চলেছিল, মনে নেই।

* * * *

ক্যাম্পে জল সরবরাহ করা হতো নীচের একটি ঝরণা থেকে পাম্পের সাহায্যে। কখন-ও কখন-ও এই পাম্প বিগড়ে যেতো, তখন আমাদের বেশ মজা হতো। পানীয় বা রান্না ইত্যাদির জন্য জল স্থানীয় ভুটিয়া মজুরদের সাহায্যে ক্যাম্পের ভিতর আনা হতো। কিন্তু, এত বেশী সংখ্যক লোকের স্নানের জল এভাবে আনা সম্ভব ছিল না। তাই, সিপাইদের রক্ষণাধীনে দশ পনর জনের এক একটি ব্যাচকে নীচে নিয়ে যাওয়া হতো স্নানের জন্য। কাঁটা তারের বেষ্টনীর বাইরে যাওয়াটাই একটা আনন্দের বিষয়

ছিল। হৈ হুল্লোড় করে সকলে ঝরণার জলে স্নান করতাম। অবশ্য বেশীক্ষণ সেখানে থাকা চলতো না। ক্যাম্পের সকলকেই স্নানের সুযোগ দিতে হবে ত।

*   *   *   *

ডেটিনিউরা নিজেদের শিল্প ও কারুকার্য্যের একটা প্রদর্শনী করবার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাতে সম্মতি দিলেন। স্নানের ঘরের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গোটা আট দশ ষ্টল মত করে দেওয়া হলো। নিজেদের আঁকা ছবি, সূচি-কর্ম্ম, পেষ্ট-বোর্ড ও আঠা দিয়ে তৈরী সুন্দর ঘর বাড়ীর নমুনা, পুতুল ইত্যাদি দিয়ে ষ্টল গুলি সাজানো হলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল সব শেষের ষ্টল-টাতে। ষ্টলের সম্মুখ ভাগ একটি পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দ্দার উপর দিকে বড় হরফে লেখা—**African Baboon.** তার নীচে একটু ছোট অক্ষরে **"Remove the Screen and See the Baboon'** (পর্দা সরিয়ে বেবুনকে দেখুন) এই কথা কয়টি লেখা। এই ষ্টল-টি করা হয়েছিল Camp-এর কম্যাণ্ডেন্ট-কে বিশেষভাবে উদ্দেশ করে। তাঁকে এবং অফিসের অন্যান্য সব কর্ম্মচারীকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, **exhibition** দেখতে, সবাই এসেছিলেন-ও। কম্যাণ্ডেন্ট সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রথম দিককার **Stall**-গুলি দেখে সঙ্গীদের কাছে ডেটিনিউদের কারুকার্য্যের প্রশংসা করতে করতে এসে শেষ ষ্টল-টির পর্দ্দা সরালেন। চোখের সামনে নিজের পরিষ্কার প্রতি—মূর্ত্তিটি দেখে লজ্জায় তাড়াতাড়ি পর্দ্দা ফেলে দিয়ে চলে এলেন। পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী (মনে হচ্ছে তিনিই) নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসিমুখে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আফ্রিকান বেবুন কেমন দেখলে?"

সাহেব-ও দমবার পাত্র নন। চটপট উত্তর দিলেন "যাওনা, নিজেই গিয়ে দেখে এস" (**Go and See for yourself**)। উভয়েই এবং উপস্থিত আর যারা ছিলেন। সবাই হাসলেন। কম্যাণ্ডেন্ট ছিলেন তখন ফিনে সাহেব।

এই ষ্টলটাতে এমনভাবে আয়না রাখা হয়েছিল যে, আয়নার অস্তিত্ব মোটেই টের পাওয়া যেত না, অথচ সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ওতে প্রতিফলিত হতো।

*   *   *   *

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কয়েকজন ডেটিনিউ হিজলী বন্দী শিবির থেকে বক্সা ক্যাম্পে বদলি হয়ে এলেন। পরবর্ত্তী জীবনে **C. P. I. (M)**-এর প্রখ্যাত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত এদের অন্যতম। প্রমোদবাবু তখন অনুশীলন পার্টির লোক।

এঁদের মুখেই আমরা প্রথম শুনি হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিশের গুলি চালনার কথা। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে। ক্যাম্পে যদিও দৈনিক খবরের কাগজ আসে, সেগুলিকে ভিতরে পাঠান হয় Censor করে। কর্তৃপক্ষ যে-খবর আমাদের গোচরে আনা অনুচিত মনে করেন, সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দেন। প্রায় প্রত্যহই আমরা এইরূপ কাঁচি কাটা সংবাদপত্র পেয়ে থাকি। তাই হিজলীর বন্ধুদের এখানে আসার পূর্ব্বে এ খবর আমরা জানতে পারিনি।

রাত ন'টার সময় বন্দীশালার ভিতরে ঢুকে বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালনা, যার ফলে দুইজন নিহত ও বহুবন্দী আহত হন, এ'যে কত বড় হিংস্র বর্ব্বরতা, 'তা' সহজেই বোধগম্য। সমস্ত দেশ বিদেশী শাসকের এই হিংস্রতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। জেলে বা বন্দীশালাতে যে সব ডেটিনিউ ছিলেন, তাঁরা এই অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন।

বক্সা ক্যাম্পে-ও অনশন শুরু হলো। রুগ্ন ও অসুস্থদের অনশনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হলো। আমিও এই বাদের তালিকায় পড়লাম। দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, আমি রুগ্ন বা অসুস্থ কোনটাই নই। দেহের গড়ন কারো পাতলা, কারো ভারী হতেই পারে। আমিও অনশনে যোগ দেব।

ততোধিক দৃঢ়ভাবে নীরদবাবু আমার মোকাবেলা করলেন—

'স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আপনি অনশনে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত কিনা, শুধু সেই প্রশ্নই আসছে না। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে-ই একজন করে অনশন-মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, কতদিন এই আন্দোলন চলবে জানা নেই। কেউ কেউ নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তখন দেখাশোনা, পরিচর্য্যার জন্য নিজেদের লোক থাকা চাই। তারপর প্রাত্যহিক কতকগুলি কাজ আছে—অনশনকারীদের সময় মত লেবু-জল দেওয়া, হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আমাদের লাউগাছির একার পক্ষে এসব সামলিয়ে উঠা সম্ভব হবে না। এইসব দিক বিবেচনা করেই আমাদের VI-C ওয়ার্ডে আপনাকে অনশন-মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে আপনি ছোট হয়ে গেলেন, এরূপ মানসিকতা আসার কোন কারণ নেই। কাজেই আমাদের যুক্ত সিদ্ধান্ত আপনার উপর অবশ্য প্রযোজ্য। এখানে আপনার নিজের মতামত দেবার অবকাশ নেই।"

মনে হয়, সপ্তাহ দুই অনশন চলেছিল। আব্দুর রেজাক খাঁ শেষ পর্য্যন্ত অন্যদের অপেক্ষা শক্ত ছিলেন। অন্যেরা কম বেশী কাহিল হয়ে পড়েছিলেন।

এই অনশনের জের হিসাবেই কিনা জানিনা, নীরদবাবু বেশ অসুস্থ হয়ে বাস

খানেক ভুগেছিলেন। তার Bacillary Dysentry হয়েছিল। মনি সিং তখন তাঁর যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। মনে রাখা দরকার যে, সে-সময় Anti Biotic ওষুধ পত্র আবিষ্কৃত হয়নি। Bacillary Dysentry-র বিশেষ কোন ওষুধ ছিল না, শুশ্রূষাই ছিল প্রধান ওষুধ।

* * * *

১৯৩১ সালের শেষ ভাগে বন্দীদের ছাড়া পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজি তখন লণ্ডনে রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্সে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা আপোশ-রফার আলোচনায় রত। ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের কার্যকলাপে গভর্ণমেন্ট ব্যতিব্যস্ত। হঠাৎ একদিন (১৯৩১-এর অক্টোবরের শেষ ভাগে বা নভেম্বরের প্রথম দিকে) কংগ্রেস নেতা জে, এম, সেনগুপ্ত (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) বক্সায় এসে হাজির। ফিনে সাহেবের বাংলোতে প্রধান দু'টি বিপ্লবী দলের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী ও যুগান্তরের সুরেন ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কোন কোন বিষয়ে আশ্বাস পেলে গভর্ণমেন্ট বন্দীদের মুক্তি দিতে আগ্রহী—এই বার্তা নিয়েই সেনগুপ্ত এসেছিলেন। বিপ্লবীদের পক্ষের কথা জেনে তিনি প্রস্থান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন মুক্তির একটা সুখকর হাওয়া যেন ক্যাম্পের ভিতর কিছুদিন প্রবাহিত হয়েছিল।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। যে-সব কারণে এই মিটমাটের প্রস্তাব ভেস্তে গেল। তার ভিতর 'প্রেস্টিজ'-এর প্রশ্নটাই প্রধান ছিল মনে হয়।

* * *

ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষের কথা এখানে কিছু বলা যেতে পারে। শুরু থেকে এই বন্দী শিবিরে কম্যাণ্ডেট্ ছিলেন ফিনে সাহেব। E G Finney অত্যন্ত চতুর, ধুরন্ধর লোক। বন্দীদের সঙ্গে প্রকাশ্যতঃ তাঁর এমন কোন খারাপ ব্যবহারের কথা মনে পড়ছে না। তবে তিনি যে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধি এ বিষয়ে মনে মনে বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। নিজ জাতির স্বার্থে তিনি যথেষ্ট কাজ-ও করে গেছেন। উত্তরকালে এরই স্বীকৃতি-ও পেয়েছেন, ব্রিটিশ সম্রাট কর্তৃক Order of British Empire (O.B.E.) উপাধিতে ভূষিত হয়ে। ফিনে সাহেব দেউলি বন্দী নিবাসে-ও প্রথম থেকেই সুপারিন্টেণ্ডেট্ ছিলেন। সেখানে বন্দীদের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। তবে সে বিবরণ এখানে নয়।

সহকারী কম্যাণ্ডেট্ ছিলেন J. L. Llewellyn I. C. S। তার মানুষ।

পূর্ব্বে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কোন কোন জেলায় কাজ করেছেন। বক্সা বন্দী-নিবাস স্থাপিত হবার পর তাঁকে এখানে ফিনে সাহেবের সহকারী হিসাবে পাঠান হয়। আমাদের সঙ্গে তাঁরই বেশী যোগাযোগ ছিল। তিনিই বন্দীদের টাকা পয়সার হিসাবাদি রাখতেন, জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে সব ব্যবস্থা করতেন।

কর্তৃপক্ষের তিতর আরেকজন ছিলেন, জগদীশ কর। দিনাজপুর সহরে বাড়ী। লম্বা দাড়ি, বাহ্যতঃ একজন সাধু পুরুষরূপে প্রতিভাত হতেন। কিন্তু ডেটিনিউ মহলে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল না। সাহেবেরা অনেক সময় ডেটিনিউদের যে-সব সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী হতেন, কর-মশায় তা'তে বাধা দিতেন।

ফিনে সাহেব পরে বক্সা ক্যাম্প ছেড়ে যান। বোধহয় অনেক দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন। সে-সময় Cottam নামে অন্য একজন ইউরোপীয় এই ক্যাম্পের কম্যাণ্ডেন্ট্ হয়ে আসেন। কটাম পূর্ব্বে ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেট্। অত্যন্ত বদ্-মেজাজী লোক। তাঁর আমলে ঢাকা শহরে পুলিশ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্রব আছে সন্দেহে বহু যুবক তখন গ্রেপ্তার হয়ে নির্য্যাতন ভোগ করেছেন। অনেক-সময় তাদের অভিভাবকেরা-ও এই নির্য্যাতনের হাত থেকে রেহাই পান নাই।

ঢাকার একজন সহ-বন্দীর মুখে কটাম সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। নিজের অধস্তন দেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে কতকগুলি বাংলা গালিগালাজ, খিস্তি খেউর তিনি ইংরেজী হরফে একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। অবসর সময়ে সে-গুলি মুখস্থ করতেন এবং সুযোগ পেলেই স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করতেন।

একদিন শহরের একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি কটামের সঙ্গে তার বাংলোতে দেখা করতে যান। ভদ্রলোকের ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর যতদূর ধারণা তাঁর ছেলে কোন গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত নয়। এই বিষয় নিয়ে তিনি পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলবেন। ভদ্রলোকের আগমনের উদ্দেশ্য শুনেই ত' সাহেব তাঁর খাতা-ঝাড়া গালিগালাজগুলি তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করতে লাগলেন। অপরাধ, এমন ছেলেকে তিনি জন্ম দিয়েছেন কেন। গালি খেয়ে অপমানাহত হয়ে ভদ্রলোক ফিরে আসছিলেন। বাংলোর গেট মাত্র পার হয়েছেন, এমন সময় সাহেবের আর্দ্দালী ছুটে এসে তাঁকে জানালো—'সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

ভদ্রলোকের মনে আশা হলো, এবার বোধহয়, সাহেবের মন একটু নরম হয়েছে, ছেলের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য শুনবে। কিন্তু সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হতেই, "তুমি আমার······(একটি অশ্লীল বাক্য)···আছে"—বলে তাঁকে বেরিয়ে যেতে আদেশ দিল।

ভদ্রলোক ত' স্তম্ভিত। অপমানে জর্জরিত হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই, প্রথম দফার গালি খেয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে আসার পর, সাহেবের ধারণা হলো সব গালিগালাজগুলো দেওয়া হয়নি। খাতা খুলে সে দেখলো, একটা গালি বাকি আছে। তাই আর্দালিকে পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনে সেটা-ও বর্ষণ করা হলো।

এহেন কটাম সাহেব যখন বক্সা-ক্যাম্পে কম্যাণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন, তখন ডেটিনিউরা স্বভাবতঃই আশঙ্কিত হলেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ব্বে যেমন, অন্ততঃ বাহ্যতঃ একটা সদ্ভাব ছিল, সেটা বোধহয় আর বজায় থাকবে না।

হলো-ও তাই। ডেটিনিউদের সঙ্গে আচরণে কটামের শাসক-সুলভ দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য-পূর্ণ মনোভাব ফুটে উঠতে লাগলো। অবশেষে অনুশীলন পার্টি এর প্রত্যুত্তর দিবার সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু, ইতিমধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেছে। তার উল্লেখই আগে করা প্রয়োজন।

ক্যাম্পে প্রত্যহ ডেটিনিউদের রোল-কল হতো। সকাল আটটা নাগাদ একজন বাঙালী অফিসার লাঠিধারী একজন সিপাই-সহ এসে প্রতি ব্যারাকে ঘুরে যেতেন। হাতে খাতা থাকতো, বন্দীদের উপস্থিতি তাতে রেকর্ড করা হতো। কাজটা একটা মামুলি প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে, এরূপ ধারণা কর্ম্মচারীটির মাথায় কোনদিন ঢোকেনি। তাই ব্যারাকের ভিতর দিয়ে ঘুরে যাওয়া ও সবাইকে উপস্থিত দেখানোই তাঁর কাজ ছিল।

হঠাৎ একদিন এই প্রথায় পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কম্যাণ্ডেণ্ট কটাম, সহঃ-কম্যাণ্ডেণ্ট লিওলিন এবং একদল সশস্ত্র সিপাইসহ স্বয়ং রোল কল করতে এসেছেন। প্রত্যেকের সিটের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে তবে খাতায় উপস্থিতি দেওয়া হচ্ছে। অনুশীলনের জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তীকে পাওয়া গেল না। কবে থেকে যে তাঁরা নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কর্তৃপক্ষের তা'ও অজ্ঞাত।

জানা গেল, কলকাতার আই, বি থেকে নাকি বক্সা ক্যাম্পের কম্যাণ্ডেণ্টর কাছে খবর এসেছে, ঐ ক্যাম্পের বন্দী জিতেন গুপ্তকে আই, বি'র ওয়াচার-রা কলকাতার রাস্তায় দেখতে পেয়েছে। ক্যাম্পে ভাল করে 'সার্চ্চ' করে দেখা হোক, জিতেন গুপ্ত সেখানে আছেন কি না। 'সার্চ্চ' করে দেখা গেল, একজন নয়, দু'জন বন্দী নিরুদ্দেশ।

লেগে গেল হুলুস্থুল। বন্দীদের সব সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহৃত হলো। কম্যাণ্ডেন্টের আদেশ হলো, প্রত্যহ সকাল ন'টার সময় ক্যাম্পের চত্বরে বন্দীদের সার বেঁধে দাড়াতে হবে (fallin)। সেইখানে রোল-কল্ হবে। বন্দীরা এ আদেশ অপমান জনক মনে করে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। কয়েকদিন বেশ উত্তেজনাময় পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে কাটলো। অবশেষে লিওলিনের মধ্যস্থতায় একটি রফায় পেঁছান গেল। ডেটিনিউদের 'ফল্-ইন্' করতে হবে না। কম্যাণ্ডেন্ট নিজেই যাবেন রোল-কল্ করতে। তবে, সে-সময় ডেটিনিউরা শুয়ে বা বসে না থেকে যেন উঠে দাঁড়ায়।

কটামের মেজাজ এমনিতেই উগ্র। দু'জন বন্দী পালাবার পর তা' আরো উগ্র হলো। 'রোল-কল্' করতে এসে প্রায় রোজই খিটিমিটি লেগে যেত। বন্দীদের প্রতি তার ব্যবহারের ঔদ্ধত্যের মাত্রা বেড়ে গেল। অনুশীলন পার্টি তখন ঠিক করলেন, তাঁদের দলের একজন করে রোজ Slip দিয়ে কটামের সঙ্গে আফিসে দেখা করতে যাবে। এবং যদি নাগালের ভিতর পাওয়া যায়, তবে সাহেবকে জুতো পেটা করবে, আর তা' না পাওয়া গেলে জুতো ছুঁড়ে মারবে। অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য এই ব্যাপার চলবে এবং এর পরিণতি-তে যা' আসার তা' গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন।

প্রথমদিন পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত গেলেন এই কার্য্যভার নিয়ে। সকলেই আশঙ্কা করেছিলেন, আফিস থেকে তাঁকে আর ক্যাম্পে ফিরে আসতে হবে না। প্রহারে জর্জ্জরিত করে তাঁকে হয় কলকাতা, না হয় জলপাইগুড়ি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু দেখা গেল, কয়েক ঘন্টা পরে পূর্ণানন্দবাবুকে স্ট্রেচারে করে ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে আসা হয়েছে। সমস্ত অঙ্গ তাঁর সিপাইদের ব্যাটন-প্রহারে জর্জরিত। দু'একটা জায়গা কেটে-ও গিয়েছে। সেখানে সেলাই করা হয়েছে।

পরদিন-ও যথারীতি এই অভিযানে গেলেন-ধীরেন মুখার্জী। তিনিও দেহে প্রহারের চিহ্ন নিয়ে স্ট্রেচার-বাহিত হয়ে ফিরে এলেন। তবে পূর্ণানন্দবাবুর মত এতটা আহত তিনি হননি।

এরপর থেকে ডেটিনিউদের সঙ্গে কম্যাণ্ডেন্ট-এর সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। প্রয়োজন হলে দেখা করতেন লিওলিন।

কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ণানন্দবাবু ও ধীরেনবাবুকে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো জলপাইগুড়ি জেলে। কম্যাণ্ডেন্টকে আক্রমণের অভিযোগে উভয়েই আড়াই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

* * * *

কিছুদিন থেকেই কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল বাংলার বাইরে একটি বৃহৎ বন্দীশিবির তৈরী হচ্ছে। বেছে বেছে বাংলার কিছু রাজবন্দীকে ওখানে স্থানান্তরিত করা হবে। জেলের বাইরে তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল পুরোপুরি সক্রিয়। গভর্ণমেণ্ট তাদের দমন করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বহু যুবক প্রতিনিয়ত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের (B. C. L. A.) কবলে পড়ে রাজবন্দীরূপে বাংলার জেল ও বন্দীশিবিরগুলি ভরাট করছেন। যতই দিন যেতে লাগল, এই গুজব, অর্থাৎ বাংলার বন্দীদের একটা অংশকে বাংলার বাইরে নিয়ে আটক রাখা হবে—খুব বেশী করে আমাদের কানে আসতে লাগলো।

অবশেষে ১৯৩২ সালের মে মাসের শেষ দিকে বক্সা ক্যাম্প থেকে কুড়ি জনের একটি 'ব্যাচ'কে 'দেউলি ডিটেন্‌শান্ জেলে' স্থানান্তরিত করার আদেশ এলো। দেউলি রাজপুতানার (বর্ত্তমান রাজস্থান) অন্তর্গত একটি মরুভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত।

প্রথম ব্যাচের এই কুড়ি জনের নাম যখন টানিয়ে দেওয়া হলো,:দেখা গেল ব্যারাক নং VI-C-এর সুধাংশু অধিকারীর নাম-ও তার অন্তর্ভুক্ত।



স্মৃতি-মন্থন

গ) দেউলি বন্দী-নিবাস

(গ) দেউলি বন্দীশিবির

মে মাসের (১৯৩২) শেষাশেষি কুড়িজন বন্দীকে বক্সা বন্দী-শিবির থেকে দেউলির পথে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। যে-সশস্ত্র প্রহরাধীনে আমরা বক্সা থেকে কলকাতা প্রেরিত হয়েছিলাম তার নেতৃত্বে ছিলেন, আই, বি'-র দুই বড কর্ত্তা। একজনের নাম মনে আছে—হাড্‌সন। এই হাড্‌সন্‌-ই ১৯৩০ সালে ঢাকা শহরে বিনয় বসুর পিস্তলের গুলিতে দারুন আহত হন। তাঁর সঙ্গী 'আই-বি' র কুখ্যাত ডি, আই জি, লোম্যান* সেখানেই বিনয়ের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এই বিনয় বসুই কয়েক মাস পরে বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত সহ মহাকরণ অভিযান করেছিলেন এবং তদানীন্তন কারাবিভাগের প্রধান সিমসনকে হত্যা করে নিজেরাও শহীদের মৃত্যু-বরণ করেন। আজ সকলেই প্রায় জানেন যে, এই বিনয়, বাদল ও দীনেশের স্মৃতি রক্ষার্থেই মহাকরণের সম্মুখস্থ পূর্ব্বেকার ডালহৌসী স্কোয়ারের নামকরণ হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ বা সংক্ষেপে 'বি-বা-দী বাগ'।

প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা একরাত্রি ছিলাম পরদিন বক্সা থেকে আনীত কুড়িজন এবং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বাছাই করা আরো কুড়িজন—মোট চল্লিশ জনের একটি দলকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে দেউলির পথে পাঠান হলো।

ট্রেনে আমাদের গন্তব্যস্থল শুনলাম—কোটা ষ্টেশন। সেখান থেকে বাসে করে দেউলি বন্দী-নিবাসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেউলি যাওয়ার আরেকটা রাস্তা আছে—আজমীর হয়ে। আজমীর থেকে ৭৫ মাইল দূরে নাসিরাবাদ নামক স্থানে সে-সময় ইংরেজদের একটা বড সেনানিবাস ছিল। নাসিরাবাদ থেকে আরো ৪০ মাইল মত দূরে দেউলি। এখানেও ইংরেজ সরকারের সেনানিবাস ছিল, কিন্তু সে-সময়ে তা' পরিত্যক্ত অবস্থায় পডেছিল। সেই পরিত্যক্ত ব্যারাক ও ঘর-গুলিকেই বন্দী-নিবাসে পরিণত করা হয়েছিল।

দুপুরের দিকে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের 'সাইডিং'-এ আমাদের 'বগি'-টিকে রেখে দেওয়া হলো। সেখানে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে নিয়ে গাডী আবার রোয়ানা হবে।

* পরিশিষ্ট—১ দ্রষ্টব্য।

ঐ সাইডিং-এর কাছে একটা পাকা 'ওভার ব্রিজ' আছে। দেখা গেল বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ওভার-ব্রিজে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নেড়ে কী সব বলছে। বাংলা দেশ থেকে রাজবন্দীদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে. এ খবর ত' সরকার বিশেষভাবে গোপন রাখবে। তবে কি কোন প্রকারে এ খবর প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে বর্দ্ধমানের জনসাধারণ আমাদের অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা করেছেন?

একটু পরেই বোঝা গেল, তা' নয় ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। ওভার-ব্রিজে দাঁড়িয়ে যারা আমাদের উদ্দেশ্যে ঐ অঙ্গভঙ্গী ও বাক্য-জাল নিক্ষেপ করছে, তারা কেউই বাঙালী নয়। কতকগুলি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ছেলেমেয়ে নানা কুৎসিৎ ভাষায় আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ভিতর থেকে একদল যুবক ট্রেনের কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। লাইন থেকে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঐ বেইমানদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো। দেখে, আমাদের রক্ষী দলের অধিনায়ক ইউরোপীয়ান কম্যাণ্ডার কয়েকজন সিপাইসহ ছুটে এলেন।

"তোমরা গাড়ী থেকে নেমেছ কেন? এক্ষুনি উঠে পড়'।"

"ঐ কুত্তার বাচ্চার দল আমাদের গালি-গালাজ দিচ্ছে কেন?"

"তা' আমরা কী করবো? ওরা ত' পাব্লিক।"

"পাবলিক? ন্যাকামি পেয়েছ? আমাদের ট্রেন-যাত্রার খবর পাবলিক পেল কী করে? কতকগুলি ভাড়াটে বেজন্মা জোগাড় করে আমাদের বিরুদ্ধে demonstration দেখান হচ্ছে?

সাহেব কিন্তু চট্‌লো না। বললো—

যাই হোক, ওরা ত চলে গেছে। এইবার উঠে পড়।

আমাদের ছেলেদের নামতে দেখে এবং দু'একটা ঢিলের ঘা' খেয়েই কাপুরুষের দল ভাগতে শুরু করেছিল এইবার দেখা গেল ওভার-ব্রিজ একেবারে ফাঁকা। কাজেই, আমাদের-ও আর গাড়ীতে উঠতে কোন আপত্তির কারণ রইল না।

যথাসময়ে ট্রেন আবার চললো। স্পেশাল ট্রেন, সব স্টেশনে থামবার বালাই নেই। আমাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থাদির জন্য যে-যে ষ্টেশনগুলি আগে থেকে নির্দ্ধারিত হয়েছে, সে-গুলি ভিন্ন তার অবাধ গতি।

কোথাও দু'ধারে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কোথাও লতা ও গুল্মাচ্ছাদিত গৈরিক ভূখণ্ড, কোথাও কোন গ্রামের বা শিল্পাঞ্চলের পার্শ্বদেশ, কোথাও বা দূরে ছোট ছোট

শৈল শ্রেণী—এরই মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। মধ্যাহ্নের গ্রীষ্ম আমাদের দমাতে পারে নি। জানালার পাশে এসে উন্মুখ মুখগুলি একদৃষ্টে এই উন্মুক্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নিঃশেষে পান করতে লাগলো।

বক্সার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে মনোরম। কিন্তু সেখানে চারধারের শৈলশ্রেণীর ভিতর দৃষ্টির পরিধি আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতো। তাই আজ প্রকৃতির এই উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য ভিন্ন স্বাদে আমাদের হৃদয় ভরপুর করে তুললো।

তাকিয়ে তাকিয়ে বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। পাশের বন্ধুর ধাক্কায় সংবিৎ পেলাম।

"দেখুন দেখুন, বাচ্চাগুলি কী সুন্দর দৌড়াচ্ছে।"

একটি গ্রাম ঘেঁষে ট্রেন চলছিল। উলঙ্গ, অর্দ্ধ-উলঙ্গ কতকগুলি শিশু ট্রেনের শব্দ শুনে ছুটে আসছিল। ওদের ভিতর একেবারে ছোটরা থপ্ থপিয়ে।

শিশুর ধর্ম্ম ছোটাছুটি করা। এদের এই দৌড়ান'র ভিতর এমন কিছুই বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু, বছরের পর বছর যারা মানব-শিশুর দর্শন থেকে বঞ্চিত, তাদের নিকট শিশুর এই স্বভাব-সিদ্ধ আচরণও এক অপূর্ব্ব মনোরম রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

বক্সার একটা ঘটনার কথা মনে হলো। সকাল বেলা আটটা সাড়ে আটটা হবে। ঘরের ভিতর সবাই একসঙ্গে পড়তে বসেছি। "একটু আসছি", বলে হঠাৎ নলীন্দ্র সেন বেরিয়ে গেল। অস্বাভাবিক কিছু নয়; বাইরে যাবার অনেক কারণ থাকতে পারে। ভাবলাম, এখুনি কাজ সেরে চলে আসবে। কিন্তু, তা' নয়। দেখা গেল বেশী দূরেও সে যায়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তরমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাতের ঘড়ি দেখছে। দু'একবার ডাকা হলো। 'আসছি' বলে উত্তর দিল; কিন্তু আসার কোন লক্ষণ নেই। ব্যাপারটা একটু রহস্য জনক মনে হলো। আমি উঠে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বললাম, "কী ব্যাপার! একাগ্র দৃষ্টে সিদ্ধুলা দেবের ধ্যান হচ্ছে না কি?"

"যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"আমি-ও যাবো না। সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।"

"তবে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

কয়েক মিনিট পরেই দেখলাম, নলীন্দ্র সেনের দৃষ্টি যেখানে আবদ্ধ, সেখানে এক নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান। হাসিমুখে নলীন্দ্র ঘরে ফিরে

এলো এবং ত'র সঙ্গে আমি ও।

রহস্যটা এখানে ভেঙ্গে বলা যাক্।

ক্যাম্প সংলগ্ন উত্তর দিকস্থ একটি উচ্চ ভূখণ্ডে অফিসারদের একটি কোয়ার্টার আছে। একটি প্রাচীর ও তার উপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এটি ক্যাম্পের এলাকা থেকে পৃথকীকৃত। সম্প্রতি একজন তরুন ডাক্তার এখানে এসেছেন; তিনি সস্ত্রীক ঐ কোয়ার্টারে বাস করেন। ডাক্তারটি অত্যন্ত ভালমানুষ। ডেটিনিউদের সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল, বিশেষ করে নলীন্দ্র সেনের সঙ্গে। উভয়েরই বাড়ী ঢাকায়, এবং আলাপে সালাপে প্রকাশ পেল, উভয়ের পরিবার পরস্পর পরিচিত। নলীন্দ্র সেন একদিন ডাক্তারকে জানালো দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দুরবস্থার কথা। 'মনের কোমল বৃত্তি-গুলি চাপা পড়ে' গিয়ে আমরা বোধ হয় যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছি; কত দীর্ঘদিন পরে কোন বাঙালী মেয়ের মুখ দেখিনি। আপনি ইচ্ছা করলে এই আপশোষটা আমাদের ঘুচাতে পারেন, ডাক্তারবাবু।'

সহানুভূতির সঙ্গে ডাক্তার নলীন্দ্রের কথা শুনলেন এবং তার কথার ইঙ্গিত বুঝে একটা দিন ও সময় স্থির করলেন। সেদিন ডাক্তারের স্ত্রী একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়ার অন্তরাল থেকে ক্ষণেকের জন্য দর্শন দিবেন। কিন্তু কোন লোক জানাজানি যেন না হয় এবং কোন প্রকার অশালীনতা প্রকাশ না পায়। নলীন্দ্রের কাছে এ বিষয়ে আশ্বাস পেয়ে ডাক্তার তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন।

যাক্—কী কথায় কী কথা এসে গেল। কিন্তু মানুষ যে শুধু খাওয়া-পরার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, মনের কোমল বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরনের-ও উপযুক্ত পরিবেশের আকাঙ্খা করে—এ ঘটনা তারই একটি দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় দিনে ট্রেন চললো মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ঊষর ভূখণ্ড ভেদ করে। কিন্তু প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ-ও আমাদের চোখে এক স্বপ্ন-লোকের মায়াজাল বিস্তার করলো। গাড়ী ছুটেছে ত' ছুটেছে-ই। আঃ। এই গতির যদি আর বিরাম না ঘটতে।

হঠাৎ "ময়ূর, ময়ূর" বলে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন। তাইত, ঐ রুক্ষ প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের উপর লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে একটি ময়ূর। বাঙালী ছেলেদের নিকট প্রকৃতির বুকে মুক্ত ময়ূর দেখা সত্যিই আনন্দকর। কিন্তু একটি নয়, দেখা গেল লাইনের দুপাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বাবলা গাছের ছড়াছড়ি। তাদেরই কোন কোনটার উপর ময়ূর বসে আছে। কোথাও বা এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ তাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রুতি-কটু ধ্বনিতে আমাদের সম্ভাষণ জানাতে-ও কুণ্ঠা

করছে না।

অপরাহ্ন বেলায় একটি ষ্টেশনে ট্রেন থামলো। 'বীণা'—কি সুন্দর নাম! কোন 'পুর', 'গঞ্জ' বা 'নগর' নয়। একেবারে কাবিক নাম 'বীণা'। এই কঠোর শুষ্ক অঞ্চলে কে দিয়েছিলেন এমন একটি সুললিত নাম।

এরপরই গাড়ী থামবে আমাদের গন্তব্য ষ্টেশন—কোটাতে। আগেই জেনে-ছিলাম, কোটা ষ্টেশনে গাড়ী যখন পৌঁছুবে তখন হবে রাত আট-টা। দিনের আলোতে ষ্টেশনটা দেখা হবে না বলে, আপশোষ হয়েছিল। কিন্তু, গাড়ী যখন পৌঁছাল, কই-দিনের আলোত মিলিয়ে যায় নি। ঘড়ি দেখলাম, হাঁ, আটটা-ই ত বটে। এইবার মনে হলো, আমাদের কলকাতা থেকে এ অঞ্চল অনেক পশ্চিমে অবস্থিত। জুন মাসে কলকাতায় যখন রাত আট-টা, তখন এ অঞ্চলে সবে মাত্র সন্ধ্যা।

কোটা-তে রেলওয়ে ক্যাণ্টিনে আমাদের খাবার ব্যবস্থা ছিল। খেয়ে দেয়ে রোয়ানা হতে রাত ন'টা মতন হয়েছিল। আমাদের চল্লিশজন এবং সিপাই সান্ত্রী, লট-বহর ইত্যাদির জন্য মোট খান তিনেক বাস ছিল মনে হয়। কোটা বৃটিশের অধীনে দেশীয় রাজ্য। বাস যখন কিছু দূর এগিয়ে গেল, তখন রাস্তায় কোটারাজের এক সিপাহী দলকে মার্চ্চ করে যেতে দেখলাম। দেখে তালপাতার সিপাই-র কথা মনে হলো। অবশ্য, দেশীয় রাজারা ও বৃটিশের হাতের পুতুল ভিন্ন কিছুই নহেন।

কোটারাজের সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের যন্ত্রচালিত বাহন-ত্রয় বুন্দি রাজ্যে প্রবেশ করলো। 'বুঁদির কেল্লা' কথাটির সঙ্গে কবি-গুরুর কৃপায় আমরা সকলেই প্রায় পরিচিত। ওটা দেখবার জন্য সকলেরই মনে তাই, দারুণ ঔৎসুক্য। কিন্তু, কেল্লা দেখার সুযোগ হলো না; সুযোগ হয়েছিল মাত্র কেল্লার একটা তোরণের ভিতর দিয়ে যাওয়ার।

রাস্তা চলতে চলতে হঠাৎ একস্থানে এসে পর পর তিনটি গাড়ীই দাঁড়িয়ে গেল। কম্যাণ্ডার ছুটে গেলেন কী ব্যাপার দেখতে। বুন্দি শহরে ঢুকতে হলে যে ফটক দিয়ে ঢুকতে হয়, তার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। রাত দশটার পর এটা নাকি খোলা রাখার নিয়ম নেই। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে এসেছি। ফটকের দু'ধারে নগ্ন দেহ, ল্যাংগট পরিহিত একদল 'সিপাহী' খাটিয়ায় শুয়ে বা বসে তোরণ-দ্বার রক্ষার কাজে নিযুক্ত আছে। কারো কারো গলায় পৈতেও ঝুলছে। ছোট বেলা থেকে নানা বইয়ে রাজপুতদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী পড়ে' পড়ে' তাদের চেহারা সম্বন্ধে একটা কল্পিত ধারণা মনের ভেতর গেঁথে গিয়েছিল। সে ধারণাটা বেশ ধাক্কা খেল।

ইংরেজ মিলিটারী অফিসার দেখে সিপাহীর দল তটস্থ। সেলাম ঠুকে আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সাহেব গেট খুলে দিতে বললেন, 'চাবি কোথায়, চাবি কোথায়' বলে হুলুস্থুল পড়ে গেল। দেখা গেল, যাঁর নিকট চাবি থাকে, অর্থাৎ সিপাহীদের দলপতি, তিনি সেখানে নেই। সুখ-নিদ্রা ভোগের জন্য নিজের বাড়ীতে গিয়েছেন। একজন ছুটে গেল সেখানে চাবি আনতে। সেই অবসরে আমরা গাড়ীতে বসে বসেই "বুঁদির কেল্লা" তথা রাজপুতদের অতীত গৌরবের কাহিনী এবং বর্ত্তমান পরিণতির কথা ভেবে মানসিক অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়লাম।

চাবি এলো। দলপতি নিজে এসে সাহেবকে সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিলেন।

আমাদের বাহিনী ছুটে চললো। রাত যদিও জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, তবু শহরের কিছুই দেখতে পেলাম না। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলিতে কোথাও আলোর রেশমাত্র নেই। শহরবাসী বোধ হয় ঘুমে অচেতন। কিন্তু শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন মুক্ত আকাশের তলায় আমাদের গাড়ী পৌঁছাল, তখন নৈশ প্রকৃতির শোভা দেখে নয়ন জুড়িয়ে গেল। দু'ধারে ঘন অরণ্যাবৃত অনুচ্চ শৈল-শ্রেণী। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সাপের দেহের ন্যায় মসৃণ, কালো পিচের রাস্তা। গাড়ীর হেড্‌লাইটের উজ্জ্বল আলো সেই রাস্তায় প্রতিফলিত হয়ে, সামনের দিকে এক আলোকিত কুয়াশার জাল সৃষ্টি করেছিল। শুনেছিলাম, ঐ শৈলারণ্যে চিতাবাঘের আনাগোনা নাকি হামেশাই হয়। বন্ধুরা অনেকে সতৃষ্ণ নয়নে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যদি দৈবক্রমে গাড়ীর জোরালো আলোতে বিভ্রান্ত হয়ে কোন একটি চিতা রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায়। চিতার দেখা অবশ্য পাওয়া গেল না। তবে হঠাৎ বন্ধুদের চীৎকার শুনে সামনে তাকালাম। গোটা তিন চার খরগোস দ্রুতবেগে রাস্তা পার হয়ে গেল। তাদের গায়ের উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ গাড়ীর আলোকপাতে উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল। আরণ্য পারিবেশ ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে গাড়ী যখন ছুটে চললো—দূরে চন্দ্রালোকিত অস্পষ্ট ছোট ছোট পাহাড়-সন্নিবিষ্ট সেই প্রান্তর আমাদের চোখে এক মায়াপুরীর কুহেলিকাময়রূপ নিয়ে দেখা দিল। তন্দ্রা-বিহ্বল অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে কতক্ষণ এই কল্পলোক দর্শনের সুখানুভব করেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ সমস্ত অনুভূতিতে বিষম নাড়া দিয়ে ব্রেক-কশার কর্কশ ধ্বনি কানে এলো। দেউলি বন্দীশালার দ্বারে এসে আমাদের গাড়ী থেমেছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত 'ফিনে' সাহেব।

রাত তখন প্রায় বারোটা। বাংলার রাজবন্দীদের প্রথম 'ব্যাচ' রাজপুতানার দেউলি বন্দীশিবিরে প্রবেশ করলো। তারিখটা মনে আছে, '২রা জুন, ১৯৩২।



দেউলি (২)

পূর্ব্বের অধ্যায়ে লিখেছি, ১৯৩২ সালের ২রা জুন তারিখে মধ্যরাত্রে বাংলার রাজবন্দীদের প্রথম ব্যাচ দেউলি বন্দীশিবিরে প্রবেশ করে। কিন্তু এককভাবে দু'জন রাজবন্দী ঐ তারিখেই দিনের বেলায় দেউলি শিবিরে আসেন। তাঁদের একজন ময়মনসিংহের সৌরভ ঘোষ, অন্যজন খুলনার মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী।

সৌরভ ঘোষ ময়মনসিংহ জেলে B.C L.A য়্যাক্টে বন্দী ছিলেন। দেউলিতে তাঁর বদলির আদেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই জেল-কর্ত্তৃপক্ষ রক্ষীসহ তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দেউলি শিবিরে বন্দী রাখার মত সব ব্যবস্থা তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তাই তাঁকে আজমীর জেলে কিছুদিন কাটাতে হলো। পরে ২রা জুন তারিখে যেদিন দেউলি ক্যাম্প চালু হলো, সেদিন দিনের বেলায়-ই তাঁকে আজমীর জেল থেকে দেউলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী হিজলী বন্দীশালায় আটক ছিলেন। সেখানে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায় বলে প্রকাশ। তাঁকে বদলী করে প্রহরাধীনে একাকীই দেউলিতে পাঠান হয়। তিনিও ২রা জুন তারিখে দিনের বেলায় দেউলি বন্দীনিবাসে আসেন।

আমরা রাত্রে বন্দীশালায় ঢুকেছিলাম। বিজলীবাতির ব্যবস্থা ছিল না। তাই স্বল্পালোকে ভিতরকার বিশেষ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয়নি। একটি বড় ব্যারাকের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সারি সারি লোহার খাটিয়া পাতা ছিল। পরিচারকদের সাহায্যে সেগুলিতে নিজ নিজ বিছানা পেতে রাত্রের মত নিদ্রার ব্যবস্থা হলো। গ্রীষ্মকালে ঘরের ভিতর সেখানে শোওয়া সম্ভব হতো না। তাই, গ্রীষ্মকালে দেউলিতে বরাবরই পরিচারকেরা সন্ধ্যার পর খাট বাইরে বের করে দিত, আবার সকালবেলা ঘরে তুলতো।

এখানে বক্সা ও দেউলি, এই দুই স্থানের বন্দীনিবাস-দু'টির একটু পার্থক্যের কথা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বক্সা ছিল সরকারী আখ্যায় 'Detention Camp' এটা জেলের পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল না। তাই, এখানে রান্না-বান্নার জন্য বা ওয়ার্ড-

গুলিতে পরিচারক হিসাবে কাজ করার জন্য যে-সব লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা কেউ-ই জেলের কয়েদী ছিল না। বেতন দিয়ে নিযুক্ত করা লোক ছিল, পরিচারকেরা অধিকাংশই নিকটস্থ ভুটিয়া-পল্লী তাসিগাঁও-এর অধিবাসী। পাচকেরা কিছু ছিল, হিন্দুস্থানী, কিছু বাঙালী। এরা ইচ্ছা হ'লে নিজেদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারতো।

কিন্তু, দেউলি বন্দীনিবাসকে সরকার আখ্যা দিয়েছিলেন—**Deoli Detention Jail**। এখানে জেলের নিয়ম কানুন প্রচলিত করা হয়েছিল। রান্নার জন্য বাংলার জেল থেকে বাঙ্গালী কয়েদী আনা হয়েছিল। আজমীর বা ঐ অঞ্চলের অন্য জেল থেকে এসেছিল ঐ অঞ্চলের কয়েদীরা পরিচারকের কাজ করবার জন্য।*

পরদিন সকাল বেলা বন্দীশালার অভ্যন্তর ভাগটা ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। একটি বড় ব্যারাক এবং এধার ওধার ছড়িয়ে থাকা কিছু ছোট ছোট ঘরের সমষ্টি সহ একটি নাতি-বৃহৎ ভূখণ্ডকে দুই প্রস্থ কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা হয়েছে। এই কাঁটা তারের বেড়া উচ্চতায় ১০/১২ ফুট হবে। দুই প্রস্থ বেড়ার মাঝে চার-পাঁচ ফুট চওড়া রাস্তা। সেন্ট্রিদের ও অফিসারদের 'রাউণ্ড' দিবার জন্য এই রাস্তা ব্যবহৃত হতো। কাঁটা তারের বেড়ার সঙ্গেই আলকাতরা মাখান দরমা দিয়ে ১০/১২ ফুট উঁচু আরেক প্রস্থ বেড়া দেওয়া ছিল। এই বন্দীশিবির যেহেতু জেলের মর্য্যাদা পেয়েছে, তাই বন্দীদের দৃষ্টির পরিধি যাতে জেলের মতই সীমাবদ্ধ থাকে সেইজন্য ইঁটের বদলে এই দরমার পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। কাঁটা তারের বেড়ার নীচের দিকে আবার সোজা টানা দুই প্রস্থ কাঁটাতারের ভিতর দিয়ে স্প্রিং-এর মত গোলকরে কাঁটা তারের রোল টেনে নেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু সেন্ট্রি-বক্স (**Sentry-Box**)। সশস্ত্র সিপাই সেখানে দিনরাত পাহারায় মোতায়েন। এই চতুঃ সীমানার মাঝে মাঝে কাঠের লাইট-পোস্ট। রাত্রে সেখানে 'ডে-লাইট' জ্বালিয়ে আলোকিত রাখা হয়। এই জেলখানায় রূপান্তরিত সেনানিবাসে সরকার বাংলার একশত রাজবন্দীকে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ক্যাম্পের হাতার ভিতরে বেশ কয়েকটি উঁচু নিমগাছ আছে। সেগুলি রুক্ষ আঙ্গিনাটাকে খানিকটা ছায়া-স্নিগ্ধ করে রেখেছে। গাছের উপর ছোট বড় অনেক কাঠ-বেড়ালি ছুটাছুটি করছে দেখতে পেলাম। তাদের কিচিরমিচির শব্দে স্থানটা মুখরিত।

---

* সরকারীভাবে যদি-ও এই বন্দীশালা 'জেল' আখ্যা পেয়েছে। তথাপি কেন জানিনা, **'Censored and Passed'** এই শিলমোহরে **'Deoli Detention Camp'** কথাটাই অঙ্কিত রয়েছে।

আমাদের পূর্ব্বাগত মৃণালকান্তি রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাঁর ঘরে গেলাম। সৌরভ ঘোষ আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। সে-ই মনে হয় আমাকে মৃণালবাবুর কাছে নিয়ে গেল। তিনি বড় ব্যারাকে আশ্রয় না নিয়ে, প্রাঙ্গণের ভিতর খুব ছোট্ট একটি ঘরকে একক বাসগৃহ হিসাবে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। আলাপে সালাপে মনে হলো, **melancholia** বা ঐ জাতীয় কোন রোগের শিকার হয়েছেন। একেবারে যন্ত্র-চালিতের মত আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেলেন। কিন্তু তখন কে বুঝতে পেরেছিল যে আর মাত্র ২/৩ দিনের ভিতরই তাঁর এমন দুঃখজনক পরিণতি হবে।

পাঁচ তারিখে তিনি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-কে চিঠি দিয়ে জানান যে, তাঁকে ক্যাম্প-থেকে আলাদা করে রাখা হোক, কারণ, তাঁর ভয় হচ্ছে, ডেটিনিউরা তাঁকে মেরে ফেলবে। [এই কথাটা অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর আফিস থেকে আমাদের জানানো হয়েছিল।] ক্যাম্প-সংলগ্ন কিন্তু তার বাইরে গোটা কয়েক 'সেল' মত কুঠুরি নির্মিত হয়েছিল। কোন কারণে কোন বন্দীকে আলাদা করে রাখবার প্রয়োজন হলে, এগুলি ব্যবহৃত হবে, এটা উদ্দেশ্য করেই কর্তৃপক্ষ এগুলি নির্ম্মাণ করেছিলেন। মৃণালবাবুকে সঙ্গে সঙ্গেই একটি কুঠুরিতে স্থানান্তরিত করা হলো। পরদিন (৬ তারিখ) আফিস থেকে আমাদের জানানো হলো যে, মৃণালবাবু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করার জন্য কয়েক জন ডেটিনিউকে বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো। দেউলির শ্মশানে এই প্রথম রাজবন্দীর দেহভস্ম মিলিত হলো।

ছয় তারিখে বাংলা থেকে আরেক 'ব্যাচ' রাজবন্দী দেউলিতে আসেন। রাত প্রায় বারোটায় তাঁরা এসে পৌঁছান। গেটে এসেই এই শোকসংবাদ পেয়ে এক বিষন্ন পরিবেশে তাঁরা বন্দীশালায় প্রবেশ করেন।

দিন কয়েকের ভিতরই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বন্দীতে ক্যাম্প ভরে গেল। বড় ব্যারাকটি এবং ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ঘরগুলিতে যে-যার খুশীমত আস্তানা নিলেন। যে-কয়দিন কম্যুনিষ্ট দলের একমাত্র আমি ছিলাম, বড় ব্যারাকের একটি কোণে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পরে আমাদের আর দুইজন, জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ বাগচী বক্সা থেকে এলেন। তিনজনে মিলে তখন একটি ছোট ঘর দখল করে নিলাম। চারজনের মত ঐ ঘরে স্থান ছিল। খুলনার নির্মল দাস আর একটি 'সিট' নিলেন।

যে-ঘরটিতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার পূর্বদিকে ছোট একটি বারান্দা ছিল। বারান্দায় দেখা গেল, কয়েকটি মাটির টব রয়েছে। টবের গাছগুলি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কী করে জানিনা, একটি টবে একটি তুলসী গাছ সম্পূর্ণ মরে যায় নি। ডালপালাগুলিতে কিছু কিছু পাতা তখনও বর্ত্তমান। মনে হয়, অল্পদিন আগেও কেউ

ওখানে বাস করতেন। বারান্দার নীচের জমিটাতে সবুজের রেশ মিলিয়ে যায়নি। জল পেলেই এমন থাকবার কথা। বারান্দাটার দক্ষিণ দিকে একটা ঝাপড়া নিমগাছ জায়গাটাকে ছায়া-সঙ্কুল করে রেখেছে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ও আমাদের নিকট আনন্দের বিষয় হলো—টবের ঐ তুলসী গাছে ছোট্ট একটি মৌচাক। মৌমাছিরা চাকটি ঢেকে বসে আছে। এগুলি ছোট জাতের মৌমাছি বলে কামড়ায় না। দেখে আমাদের কী উল্লাস! ঘিরে বসে বেশ কিছুক্ষন মন দিয়ে দেখা গেল। খবর পেয়ে অন্যান্য ঘরের ডেটিনিউরা-ও ছুটে এলেন দেখতে। মনু-বংশীয়দের নিকট এত সাদর অভ্যর্থনা বোধ হয় মধু-মক্ষিকাদের সহ্য হলো না। দিন কয়েক পরেই দেখা গেল, চাক খালি, মৌমাছিরা পালিয়ে গেছে।

কিছুদিন পর বর্ষা-সমাগমে এই বারান্দায় একটি উৎসব হলো। মণ্ডুক-মাংস-ভোজনোৎসব। অমূল্য লাহিড়ী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। বাইরে থাকতেই তিনি নাকি এই বিশেষ প্রাণীটির মাংসল পদযুগলের আস্বাদ লাভ করেছেন এবং রন্ধন পদ্ধতি-তেও অভিজ্ঞ।

বর্ষা শুরু হতেই দেখা গেল, ক্যাম্পের আনাচে কানাচে, বিশেষ করে আমাদের স্নানাগার সন্নিহিত একটি জলাবদ্ধ স্থানে সোনালী রঙের হৃষ্ট-পুষ্ট বড় বড় ব্যাঙ্ তাদের ঐকতানে চারদিক মুখরিত করে তুলেছে।

"ওঃ! এরূপ ব্যাঙ্ পেলে ফরাসীরা কী খুশীই না হতো! চলুন না, একদিন ফিস্ট্ করা যাক"—অমূল্যবাবুর সাগ্রহ প্রস্তাব।

আমাদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। 'ব্যাঙ্ খায় ফরাসীরা, খেতে নয় মন্দ'—কথাটা সুকুমার রায়ের দৌলতে ছোটবেলা থেকে শুধু জেনেই এসেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা হবে কখন-ও ভাবিনি। সে-সুযোগ যদি পাওয়াই গেল তবে ছাড়ি কেন?

একদিন রাত প্রায় এগারোটা হবে, ক্যাম্পের বেশীর ভাগ ডেটিনিউ-ই নিদ্রায় মগ্ন। শুরু হলো আমাদের মণ্ডুকাসুর-নিধন অভিযান। সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন যতদূর মনে পড়ে, মাদারীপুরের কালীপদ ব্যানার্জী আর ঢাকার শচীশ সরকার। এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে অভিযান শুরু হলো। স্থানীয় অধিবাসী মণ্ডুক-দল বহিরাগত মনুজ-কুলের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। তাই, আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাবার পূর্ব্বেই লগুড়াঘাতে হতাহত বেশ কিছু দাদুর-দাদুরীতে আমাদের ছোট ছোট কয়েকটি থলে ভর্তি হয়ে গেল। পরে

আততায়ীদের বিভিন্ন গ্রুপের মিলিত অভিযান হলো স্নানাগার-সন্নিহিত ভেকদের প্রধান আড্ডাস্থলে। দু'একটা ধরার পরই একজনের ভয়ার্ত চীৎকার —

'আরে, সাপ, সাপ' —

'হি-স্' শব্দ করে বেশ বড় আকৃতির গাঢ় কাল রঙের একটি নাগ-রাজের বিদ্যুৎ গতিতে অন্তর্ধান কারো চোখ এড়ালো না।

অভিযান এইখানেই সাঙ্গ করা সকলের সমীচীন মনে হলো, দর্দুর নিধনে এসে বিষধরের দংশনে প্রাণ দেওয়াটা কেউ-ই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন না।

পরদিন ভোজ পর্ব। সকালবেলা টিফিন ও রোল কল শেষ হয়ে যাওয়ার পরই, প্রধান হোতা অমূল্য লাহিড়ী স-সরঞ্জাম এবং উৎসাহী সহকারীদের নিয়ে আমাদের বারান্দায় এসে হানা দিলেন। বিনা কালব্যয়ে সকলেই যথাযথ কাজে লেগে গেলাম। ছাল ছাড়িয়ে শুধু পিছনের 'ঠ্যাং' দুটো রেখে দাওর দেহের বাকী অংশটুকু বাতিল করতে হবে।

এই প্রাথমিক কাজ শেষ হবার পর, স্বচ্ছ প্রায় রক্তাভ মাংসল পেশীগুলি একটি পাত্রে যখন সাজিয়ে রাখা হলো, সেগুলির সংকোচন প্রসারণ তখন-ও থেমে যায়নি। একজন বলে উঠলেন—'কী মৎকার। এ যে রান্না না করেই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

সমারোহ সহকারে লাহিড়ী মশায় রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করলেন। উদ্যোক্তারা ভিন্ন, বয়স্ক ডেটিনিউদের ভিতর-ও কয়েকজন ভোজন পর্ব্বের শরিক হয়েছিলেন। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাধারণভাবে সকল বন্দীদেরই অবহিত করা হয়েছিল যে, '.. নং ঘরে ব্যাঙের মাংস রান্না হচ্ছে, যদি কেউ স্বাদ নিতে ইচ্ছুক হন, তবে নাম পাঠিয়ে দেবেন।' ফলে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়েছিল। এই মাংস নাকি হাঁপানি রোগের উপশমকারী, তাই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন।

সবশুদ্ধ জনা পনর এই মহাভোজের শরিক হয়েছিলাম। ধৃত ভেকদের সংখ্যা-ও একরূপই ছিল। তাই, মোটামুটি প্রত্যেকের ভাগে একজোড়া করে আহার্য্য বস্তুটি পড়েছিল।

শেষ পর্য্যন্ত অমূল্য লাহিড়ী মশায়কে দক্ষ সূপকার বলে স্বীকার করতে হয়েছিল এবং সুকুমার রায়ের কবিতার লাইনটির শেষাংশের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করার উপায় ছিল না।

* * * *

বক্সাতে বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন কিচেন থাকাতে দলগত হিসাবে অন্তর্কলহ দেখা দেওয়ার বিশেষ সুযোগ ছিল না। এখানে সবার জন্যই একটি কিচেন। তাই, নানান আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নীতি-নির্দ্ধারণ নিয়ে বা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন দলের ভিতর মাঝে মাঝে খিটিমিটি দেখা দিত। অনুশীলন ও যুগান্তর দুইটি প্রধান দল। তা' ছাড়া 'থার্ড'-পার্টি। আমরা মুষ্টিমেয় কয়জন কম্যুনিষ্ট ঠিক করেছিলাম, এইসব ক্যাম্প পলিটিক্সে আমরা মোটেই নিজেদের জড়াবো না। আমাদের প্রধান কাজ হবে নিবিষ্টভাবে পড়াশোনা করে ভবিষ্যৎ রাজনীতিক জীবনের জন্য নিজেদিগকে তৈরী করা, মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা। তবে ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যাপারে যদি আমাদের কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তা' প্রকাশ করবো, 'থার্ড-পার্টি' মারফৎ। যতদূর মনে পড়ে মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ছিলেন থার্ড-পার্টির মুখপাত্র।

এক বৎসর বা তার-ও কিছু বেশী কাল দেউলিতে একটি মাত্র বন্দী-নিবাসই ছিল। প্রথম দিকে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার মত কোন বড় মাঠ আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। ক্যাম্পের হাতার ভিতরই বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস ও ব্যাড্‌মিন্টন খেলার ব্যবস্থা ছিল। বড় মাঠ পাওয়া যায় বেশ কিছুদিন পর। তখন ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি খেলার সুযোগ হলো।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও প্রথম দিকে খিটিমিটি লেগে থাকতো। বাংলার ছেলে; মাছ আমাদের অপরিহার্য্য খাদ্য। কিন্তু মাছ সেখানে দুষ্প্রাপ্য বললে ঠিক হবে না; প্রথম দিকে অপ্রাপ্য-ই ছিল। মাছের দাবীতে এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যাপার নিয়েও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বাধতো। একবার কী কারণে. মনে হচ্ছে না—ক্যাম্পের ভিতর এসে সিপাহীরা লাঠি চার্জ করে। বাস্কেটবল খেলার মাঠে ডেটিনিউদের সঙ্গে সিপাইদের মারামারি হয়। অনুশীলনের অন্যতম নেতা জ্ঞান মজুমদার মাথায় বেশ আঘাত পেয়েছিলেন।

একটা হাস্যকর কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো। একদিন হরিপদ বাগচী এসে আমাকে বললেন, একজন প্রবীন বিপ্লবী নেতা হরিপদবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে (তিনি একাই একটি ছোট কুঠরি-তে থাকতেন) বলেন, 'দেখুন, 'মাছ-মুভমেন্ট' (**Mass movement**) আমরাও 'সাপোর্ট' (**Sutport**) করি। এই যে আমাদের মাছ দিচ্ছে না, চলুন না, এরজন্য একটা 'মুভমেন্ট' করি।'

আমি হেসে বললাম···"·······বাবু আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন।"

হবি গদবাবুও হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে বা ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে ত আমার কোন রসিকতার সম্বন্ধ হতে পারে না।"

মৎস্য-সমস্যা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মিটেছিল এইভাবে। করাচী থেকে সামুদ্রিক মৎস্য সপ্তাহে দিনতিনেক আমাদের জন্য আনানো হবে। বাকী কয়দিন মাংস বা ডিমের ব্যবস্থা থাকবে।

টিনে করা 'Preserv.d fish' একদিন কি দু দিন আমাদের পরিবেশন করা হয়েছিল। কিন্তু এটা আমাদের নিকট একেবারে অখাদ্য মনে হয়েছিল।

* * * *

শ্রীসংঘের অনিল রায় একটি ঘরে একাকী থাকতেন। একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। তাঁকে উর্দ্দু পড়াতে হবে। আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "সে কি! আমি পড়াবো উর্দ্দু আপনাকে?"

অনিলবাবু বললেন, "দেখুন, উর্দ্দু আমি কিছু কিছু শিখেছি। তবে বই পড়তে পারিনে। আপনি বক্সা'তে ভাল উর্দ্দু শিখেছেন, শুনেছি। কিছু বই-টই-ও পড়েছেন। দু'জনে মিলে কোন বই পড়বো। যা' বুঝবো না, বুঝিয়ে দেবেন।'

বক্সায় খাঁ-সাহেবের কাছে গদ্য ও কাব্য মিলিয়ে খানকতক বই পড়েছিলাম। তার মধ্যে একখানার নাম 'ভেনিস্ কা সইযা' (ভেনিসের পর্য্যটক)। এটা মার্কো-পোলোর আত্ম জীবন কাহিনী। বইখানা অনিলবাবুকে দিলাম। রোজ সকালে আটটা সাড়ে আটটার সময় অনিলবাবুর ঘরে গিয়ে দুজনে মিলে বইখানা পড়া হতো। কোন দিন আমি যেতে গাফিলতি করলে অনিলবাবু এসে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন।

আমরা যখন পরে এক নং ক্যাম্প থেকে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে যাই, তখন পাশা-পাশি ঘরে থাকতাম। অনিলবাবু পরিচারকরূপে পেয়েছিলেন একজন ভাল উর্দ্দু-জানা কয়েদীকে। ভদ্রলোকের বাড়ী পিলিভিতে। পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তহবিল তছরূপের দায়ে কয়েক বছর জেল হয়েছে। অনিলবাবু তার সাহায্যে অনেক উর্দ্দু কবিতা ও গান আয়ত্ত করেছিলেন। পরে আমি অনিলবাবুর কাছ থেকে ওগুলি নিজের খাতায় লিখে নিই।

৫নং ক্যাম্পে থাকতে কন্‌ট্রাকটারের কাছে একদিন 'রিকুইজিশন' দিতে গিয়ে আমার উর্দ্দু বিভ্রাট ঘটেছিল। অনিলবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই বিভ্রাট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বন্ধুবর নিকুঞ্জ সেন তার লেখা বইয়ে এর একটি রসপূর্ণ

('যদিও অতিরঞ্জিত') চিত্র এঁকেছেন

*　　　　　*　　　　　*　　　　　*

এক নম্বর ক্যাম্পে থাকতে 'প্রলেতারিয়েত' নামে একখানি হাতে লেখা পত্রিকা বের করা হতো। আমরা তিনজন- জ্ঞান চক্রবর্তী, হরিপদ বাগচী ও আমি এক ঘরে থাকতাম বলে কাগজটি নিয়মিত বের করতে সুবিধা হয়েছিল. সাতটি কি আটটি সংখ্যা বের হয়েছিল। পরে বন্ধ হয়ে যায়। লেখক ছিলাম মূলত: আমরা তিনজনই। তবে সরোজ আচার্য্য আমাদের কিছু কিছু সাহায্য করতেন। সরোজ আচার্য্য ভাবধারার দিক থেকে তখন ষোলআনাই কম্যুনিষ্ট। কিন্তু নিজের পূর্ব্বতনদলের বন্ধন পুরাপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সুশীল চ্যাটার্জী তাঁকে বন্দীদশায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দিচ্ছিলেন বলে তিনি আমাকে বলেছিলেন।

যাইহোক্, 'প্রলেতারিয়েত'-এ কম্যুনিজম প্রচার করা হচ্ছে বলে অন্য দলের লোকেরা সেটাকে কীভাবে নিচ্ছিলেন জানি না, তবে বাহ্যত: কারো কাছ থেকে কোন বিরূপ আভাস পাইনি। তা' পেলাম শুধু দু'জন 'বি, ভি,' র লোকের কাছ থেকে— রেবতী বর্ম্মণ ও নেপাল নাগ। রেবতী বর্ম্মণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। যেমন পড়াশোনায় তেমনি লেখায়ও দক্ষহস্ত। বাইরে থাকতে 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন বলে মনে হচ্ছে। ক্যাম্পের ভিতর কম্যুনিষ্টরা 'Unchallenged' ভাবে মার্ক্সবাদ প্রচার করে যাবে—এ হতে দেওয়া যায় না।—ইহাই ছিল রেবতীবাবু ও নেপাল-বাবুর বক্তব্য। মার্ক্সবাদ যে ভুল তত্ত্ব. ইহা প্রমাণ করতে তাঁরাও কাগজ বের করবেন।

সরোজ আচার্য্য রেবতী বর্ম্মণেরও ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁর মারফৎ-ই এসব খবর জানলাম। মার্ক্সবাদকে ভুয়া প্রমাণ করতে হবে, তাই মার্ক্সবাদটা কী, সে সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। একটি একটি করে বই তাঁরা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে পড়তে লাগলেন। আমরাও অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম. কবে তাঁদের কাগজ বেরোবে। আমাদেরও ত' প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

কিন্তু তাঁদের কাগজ আর বেরোল না। জানতে পারলাম, যতই মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে তাঁরা অধ্যয়ন করছেন, ততই সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। অবশেষে একদিন নেপাল নাগ এসে আমায় জানালেন যে, তিনি ও রেবতীবাবু 'বি-ভি' র সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে পুরাপুরি মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছেন। সে-সময় আমরা এক নং ক্যাম্প ছেড়ে পাঁচ নং ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছি। সেই থেকে রেবতী বর্ম্মণ ও নেপাল নাগ, কি জেলের ভিতরে, কি বাইরে দু'জন একনিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী হিসাবে আজীবন কাজ করে

গেছেন। আজ তাঁরা উভয়েই মৃত। *

* * * *

দেউলি জেলের প্রথম সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট্‌ ছিলেন আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ফিনে সাহেব। বক্সা থেকে তিনি দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে দেশে যান এবং পরে দেউলির সুপার হয়ে কাজে যোগ দেন। ইতিমধ্যে দেশে থাকতেই O.B E. উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন। বক্সাতে ফিনের সঙ্গে বন্দীদের বিশেষ কোন সংঘর্ষ বেঁধেছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু দেউলিতে তাঁর মেজাজটা একটু দাম্ভিকতাপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। সদ্য-প্রাপ্ত Order of British Empire খেতাবের ইহা ফলশ্রুতি কিনা জানিনা। ডেটিনিউদের সঙ্গে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে এই দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছে এবং একবার ত' জেলের ভিতর লাঠি চার্জ করান-ও তাঁর কীর্ত্তি।

ফিনের নীচের কর্ত্তা ছিলেন, মুরারী অধিকারী, এ্যাঃ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। D.S P. র‍্যাঙ্কের পুলিশ অফিসার। অতি ধুরন্ধর লোক। ক্যাম্পের ভিতর তাঁকেই সাধারণতঃ আসতে হতো—ডেটিনিউদের অভাব অভিযোগ শোনবার জন্য এবং নৈমিত্তিক জেল পরিদর্শনের জন্য।

বন্দীদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন বহুদিন তাদের কোন চিঠিপত্র না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত আছেন—এই মর্মে একাধিক বন্দী বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছেন। মুরারীবাবুকে ঘিরে ধরা হলো—"কি মশাই, আমরা ত বাড়ীতে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, তবে তা' বাড়ীতে পৌঁছাচ্ছে না কেন? আপনারা কি অফিসে আটকিয়ে রাখছেন নাকি?"

অমায়িক হাসি হেসে মুরারীবাবু বললেন, "আরে না, না। আমরা সব চিঠি তৎক্ষণাৎ পোস্ট করে দেই। এসব হলো পোস্টাফিসের কাণ্ড। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনুন।

আমার বদলির আদেশ হয়েছে এক মফস্বল শহরে। প্রথমেই পরিবার নিয়ে সেখানে যেতে একটু ইতস্ততঃ ভাব এলো। তাই, কলকাতা মুসলমানপাড়া লেনে একটি বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রী, ছেলেপুলেকে রেখে গেলাম। কাজে যোগ দিয়ে, মাইনে পেয়ে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে স্ত্রীর নামে টাকা পাঠালাম। আমার স্ত্রীর নাম ঊষাঙ্গিনী। T.M.O. ফেরৎ এলো। মন্তব্য—'There is no Usman Gani at.........No. Mussalman Para Lane' বুঝলেন ত? মুসলমানপাড়া লেন যখন, তখন সেখানে

* পরিশিষ্ট ২ দ্রঃ

উস্‌মান গণিই হবে। উষাঙ্গিনী নয়, এই ত' পোষ্টাফিসের কাণ্ড।"

বাগ্‌জাল দ্বারা উদ্ভূত উত্তেজনা প্রশমনের এই প্রকার চাতুর্য্যের পরিচয় তাঁর আরো পাওয়া গিয়েছিল।

*   *   *   *

এক নম্বর ক্যাম্পে থাকতেই অনেক বই কেনবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। অবশ্য পরে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে যাওয়ার পর এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং বলা চলে যে, আমরা তখন ছোটখাট একটি মার্ক্সিষ্ট লাইব্রেরীর মালিক। শুধু ক্লাসিকেল মার্ক্সিজমের বই-ই নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহজ বোধ্য অনেক নতুন নতুন বই সংগৃহীত হয়েছিল। এগুলি একটু ধারাবাহিকভাবে পড়লে মার্ক্সীয় তত্ত্বের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সুবিধা হয়েছিল এ জন্য যে, আমরা কয়েকজন ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়েকটি প্রগতি-পন্থী বুক-ক্লাবের সদস্য-ভুক্ত হয়েছিলাম। তাদের মারফৎ নিয়মিতভাবে নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান পেতাম এবং তার ভিতর থেকে আমাদের পছন্দমত বই তাঁরাই সরবরাহ করতেন। এই ব্যাপারে লণ্ডনের **W H. Smith & Son** এবং **C. A Watts & Co.** আর নিউ ইয়র্কের **Literary Guild of America'**-র নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি সংস্থার নিকটই আমরা কিছু টাকা জমা দিয়ে রেখেছিলাম। এরা নিয়মিতভাবে আমাদের নিকট জমা-খরচের হিসাব-ও পাঠাত। **Literary Guild of America** থেকে বৎসরে একটা ন্যূনতম টাকার বই কিনলে ওরা একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের বই দিত বোনাস হিসাবে। দুই বৎসর এই বোনাস বই পেয়েছিলাম। এক বৎসর বোনাস হিসাবে পেয়েছিলাম—**H G Wells**-এর **Science of Life** নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ।*

এছাড়া তখনকার দিনের নামকরা বামপন্থী পুস্তক প্রকাশক **'Lawrance & Wishart', 'Victor Gollanz'** এবং **'Collet'** প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও আমরা নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। **Martin Lawrence** নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক কর্তৃক মার্ক্সীয় অর্থনীতি ও দর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকা নিয়মিত ভাবে আমাদের নিকট প্রেরিত হতো। বইগুলিতে এত সহজভাবে ঐ কঠিন বিষয়গুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে, অনেকেই এই পুস্তিকাগুলি পাঠ করে লাভবান হয়েছেন।

Censor করে বই আটকাবার সঠিক পদ্ধতি তখনও মনে হয়, 'আই, বি' পুলিশ স্থির করতে পারেনি। বিশেষতঃ মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে তাদের ধারণা যথেষ্ট সীমিত ছিল।

* পরিশিষ্ট—৩ দ্রষ্টব্য।

আর সোজা লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে বই আসছে, এগুলিতে আপত্তিকর কিছু থাকতে পারে—এ ধারণা অন্তত ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের না থাকাই স্বাভাবিক। একটা ঘটনা মনে পড়ে। 'Germany puts the clock Back'—নামে একখানা বই আনিয়েছিলাম। লেখকের নামটা মনে নেই। বইখানা অনেকদিন থেকে আফিসে পড়েছিল। ভাবলাম, বোধ হয় আটকাবে, আফিসে তাগিদ দিয়ে কোন ফল না হওয়াতে, একদিন সুপারিন্-টেণ্ডেন্ট্ ফিনে সাহেবকে ক্যাম্পের ভিতর পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতদিন যাবৎ আমার বইটা আটকে রাখা হয়েছে কেন?"

ফিনে একটু উৎফুল্ল ভাবে জবাব দিলেন, "মিঃ অধিকারী, তুমি চমৎকার এক-খানা বই কিনেছ। বইটি আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়ছি। যতই পড়ছি, ভাল লাগছে। আমার পড়া শেষ হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেব।"

দুই তিন দিন পরই বইটি পেয়েছিলাম। হিটলার ক্ষমতায় এসে জার্ম্মানীকে কী ভাবে দ্রুত অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে—বইটিতে তাহাই দেখান হয়েছিল।

আরেকখানা বই—"The Kaiser Goes; The Generals Remain।" বইখানা ফ্রান্স ও জার্মানীর সমসাময়িক কাগজের খবরের উপর ভিত্তি করে নভেলের মত করে লেখা। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর রুশ-বিপ্লব সম্পন্ন হবার কিছুদিন পরেই জার্ম্মানীতেও অনুরূপ গণ-বিপ্লব হয়েছিল। সেই স্রোতে কাইজারকে সরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-কাঠামোর পরের স্তর বড় বড় সেনানী, ভূস্বামী, ধনপতির দল নানা ছলে শাসনযন্ত্র নিজেদের দখলে রেখে দিলেন। তাদের উচ্ছেদ না করার জন্যই ১৯১৮'-র এই জার্মান বিপ্লব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। অবশ্য, জার্ম্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংস্কার-পন্থী নেতৃবৃন্দ নোস্কে, শাইডেমান, এবার্ট-প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতাই জার্মানীর এই গণ-বিপ্লবের বিফলতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

কিন্তু এইসব বই যে মার্ক্সীয় তত্ত্বের সত্যতাকে ঐতিহাসিকরূপে জাজ্বল্যমান করে তোলে—এরূপ জ্ঞান সরকারী কর্ম্মচারীদের থাকবে—এ আশা করা যায় না।

আরো একখানা বই-এর কথা লিখছি। 'Moscow has a plan'-নামে এক খানা বই কিনেছিলাম। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুছে ফেলবার জন্য যে আপ্রান চেষ্টা করবে, ইহা সহজেই বোধগম্য। সোভিয়েত রাশিয়াকে সূতিকাগারেই বিনষ্ট করার জন্য পৃথিবীর চৌদ্দটি ধনতান্ত্রিক দেশ বিপ্লবের পর মুহূর্ত্তেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু সোভিয়েতের 'লাল সেনা' ও জন-গণের শৌর্য্য এবং নিজেদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রক্তচক্ষু তখন তাদের সরে যেতে

বাধ্য করেছিল। তবে, এটাই যে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের শেষ অভিযান নয়, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তা' ভালভাবেই জানতেন। আর পরের আক্রমণ যে আরো ভয়াবহ হবে এবং প্রথম ধাক্কাতেই সোভিয়েতের ইউরোপীয় অংশ আক্রমণকারী-দের কবলে চলে যাবে—এই সম্ভাব্য আশঙ্কার কথা মনে রেখে সোভিয়েত-রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে এবং উন্নয়নমূলক শিল্প সংস্থাপনার বিষয়ে পরিকল্পনা-মূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। অবস্থা যদি আশঙ্কা-অনুযায়ী দাঁড়ায়, তা'হলে ইউরাল পর্ব্বতের আড়ালে থেকে শক্তি সংহত করে প্রতি-আক্রমণ দ্বারা তাঁরা নিজেদের সোভিয়েত-ভূমি হামলাকারীদের কবল থেকে মুক্ত করবেন। বইটির বিষয়বস্তু ছিল এই প্রকার এই বইটি-ও কিন্তু আটকানো হয়নি।

এই প্রসঙ্গে বহুদিন পরের একটি কথা মনে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। নাৎসী জার্ম্মানীর অতর্কিত আক্রমণে সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমাগত পিছু হটছে। আমাদের দেশের অন্যান্য অনেকের কথা ছেড়ে দিলাম। কিছু কিছু পার্টি কম্‌রেড-ও তখন বিভ্রান্ত হয়ে সোভিয়েতের পরাজয় অবধারিত মেনে নিয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। আমি তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে। কিন্তু এই কমরেডদের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি—সোভিয়েতের পরাজয় হতে পারে না। তাঁদের বলেছি, দেউলিতে (তাঁদের কেউ কেউ দেউলিতে বন্দী ছিলেন) যদি তাঁরা **'Moscow has a plan'**-বই-খানা পড়ে থাকেন, তা' হলে তাঁদের এই হতাশার ভাব আসে কী করে? যুদ্ধের ফল দেখে পরে অবশ্য তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

Censor-এর খামখেয়ালির কথা বলছিলাম। যে-সব বই আটকানোর সম্ভা-বনা থাকে, অনেক সময় তা' পার পেয়ে যায়। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তের-ও অভাব নেই।

'Philosophers on Holiday' নামক একখানা বই। ইংলণ্ডের কয়েকজন বুদ্ধিজীবি তখনকার দিনে রহস্যময় দেশ বলে বিবেচিত সোভিয়েত রাশিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছেন! এঁদের ভিতর কেউ প্রবল কম্যুনিজম-বিদ্বেষী, কেউ নিরপেক্ষ, কেউ কম্যু-নিজম সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষী। যাবার রাস্তায় জাহাজে যে কয়টা দিন তাঁরা ছিলেন, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও চিন্তাধারার আলোচনা ও বিতর্কে তাঁদের সময় কেটেছে। বার্কলে, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি ভাববাদীদের মতবাদ বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে; বস্তুবাদ-ও বাদ যায়নি। কিন্তু দ্বন্দ্ব-মূলক বস্তুবাদ **(Dialectical Materialism)** সম্বন্ধে তখনও তাঁদের জ্ঞানলাভ হয়নি, তাই, তাঁদের আলোচনার বাইরে ছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়া পরিভ্রমণের পর তাঁরা যখন নিজেদের দেশে ফিরে আসছিলেন,

তখন একই জাহাজে আবার দেখা হলো। নিজেদের ভিতর আলাপে বুঝতে পারলেন যে তাঁরা যে যে-প্রকার মনোভাব নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, সেই মনোভাবেই আরো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ফিরে আসছেন। কম্যুনিজম-বিদ্বেষীর বিদ্বেষ আরো বেড়েছে, সংশয়-বাদীর সংশয় দূর হয়নি, আর কম্যুনিজমে সহানুভূতিশীল ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দ্বন্দ্ব-মূলক বস্তুবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং নিজে কম্যুনিজমেরর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থাশীল হয়েছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সুলভ দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। দিনগত পাপক্ষয়ের জীবনযাত্রা সম্পন্ন করা ভিন্ন আর কিছু তাঁর করার আছে বলে মনে করেন না।

এই বইখানা নিষিদ্ধ করার মত এমন কিছু নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্যাম্পের ভিতর নিষিদ্ধ পুস্তকের যে তালিকা টানিয়ে দেওয়া হতো এবং কারো কাছে তা' থাকলে আফিসে জমা দেওয়ার নির্দ্দেশ থাকতো—এইরূপ একটি তালিকায় এই বইখানার নাম ছিল। বইটির বাহ্য-রূপ তাড়াতাড়ি পাল্‌টিয়ে দিলাম। 'The Country-man'-নামে ইংলণ্ডে প্রকাশিত একখানা সাময়িক পত্রিকা ছিল। ঐ পত্রিকার কলেবরেব ভিতর 'Philosophers on Holiday' স্থান পেল।

বই censor করা সম্বন্ধে নানা প্রকার কৌতুকপ্রদ ঘটনাব কথা বন্ধুদের মুখে শুনতাম। তবে এর কিছু কিছু নিশ্চয়ই বানানো গল্প। কিন্তু দেউলির একটি ঘটনার কথা জানি। Laski-র লেখা 'Grammar of Politics' নামে একখানা বই কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত। একজন রাজবন্দী পরীক্ষার্থী বইখানি কেনেন। কিন্তু আফিসে তা' আটকানো হলো। কারণ জানা গেল, যে—বাঙ্গালী অফিসারের রিপোর্টের উপর সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ বই দেওয়া বা না দেওয়ার নির্দ্দেশ দেন, সেই অফি-সারটি এই বই সম্বন্ধে সুপারকে নোট দিয়েছেন, "Sir, Grammar can be allowed, but not Politics." খবরটি আমাদের দিয়েছিলেন, আফিসেরই অন্য একজন কর্ম্মচারী A.S I. আশু লাহিড়ী।

পরে অবশ্য অনেক দরবার করার ফলে বইটি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিল।

* * * *

ক্যাম্পের চারধারে দুই প্রস্থ কাঁটা তারের বেড়ার মাঝখানে স্বল্প পরিসর রাস্তার অল্প দূরে অবস্থিত লাইট-পোষ্ট ও সেন্ট্রি-বক্সের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। ঐ লাইট-পোষ্টের 'ডে-লাইট'-গুলির পরিচর্য্যার জন্য রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাতিওয়ালা

আসতো। সেন্ট্রিরা তাকে নিয়মমাফিক চ্যালেঞ্জ করতো—"Halt, who comes there ?" বাতি-ওয়ালা উত্তর দিত—"বাতিয়ালা।" "Pass বাতিয়ালা, All's Well" —বলে সেন্ট্রি তাকে যেতে দিত। এই কথোপকথন প্রতি রাত্রে শুনে শুনে আমাদের গা' সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা কুমিল্লার বীরেন ভটাচার্য্য গম্ভীরভাবে আমাদের জানালেন—"কাল একটু গভীর রাতে বাথরুমে গিয়েছিলাম। একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। একটা কুকুর ক্যাম্পের ভিতর থেকে কাঁটা তারের ভিতর দিয়ে গলে' গিয়ে রাস্তায় হাজির। অমনি সেন্ট্রির চীৎকার—'Halt, who comes there ?' কিন্তু সারমেয় প্রবর তা' গ্রাহ্য না করে, ওধারের কাঁটাতারের ভিতর ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রির সরব ঘোষণা—'Pass কুত্তা, all's well."

বলাবাহুল্য, "Pass বাতিয়ালা, all's well"—সেন্ট্রির এই ধ্বনিকে কটাক্ষ করেই বীরেনবাবুর এই বানানো গল্পের অবতারণা। "All's Well" বা "All Safe" কথাটা ঊর্দ্ধতন অফিসারদের পরিদর্শনে আসার বেলায়-ই সেন্ট্রির পক্ষে ঘোষণা করাটা খাটে। বাতিয়ালাকে এটা জানানোর কোন অর্থ হয় না।

বীরেনবাবুর রঙ্গরসের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তবে তা' বেশীর ভাগই হয়েছিল আমরা পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে যাওয়ার পর। দু'একটা পরে উল্লেখ করবার ইচ্ছা রইল।

*   *   *   *

দেউলিতে এসেছিলাম, ভর গ্রীষ্মকালে। রাজপুতানার এই মরু-সন্নিহিত অঞ্চলের গরমের তুলনা হয় না। তবু-ও ক্যাম্পের হাতায় এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু নিম গাছ গ্রীষ্মের স্বাভাবিক প্রাখর্য্য একটু লঘু করে দিয়েছিল। আর বড় ব্যারাকটির ছাদ ছিল খুব উঁচু এবং মাটির টালির। টানা পাখার ব্যবস্থাও সেখানে ছিল। পরে যখন পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে আমাদের স্থানান্তরিত করা হলো, তখন টের পেয়েছিলাম রাজপুতানার গরম কাকে বলে। টিনের ছাউনি দেওয়া ব্যারাকঘরে যদিও কয়েদীদের দিয়ে টানা পাখা চালাবার ব্যবস্থা ছিল, তবু গ্রীষ্মের দুপুরটা আমাদের কাটাতে হতো ভিজে মোটা তোয়ালে দিয়ে মাথা ও শরীর সম্পূর্ণভাবে চাপা দিয়ে।

গ্রীষ্ম গিয়ে ক্রমে শীত এলো। শীতের দাপট-ও কম ছিল না। বক্সা ক্যাম্প পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাই, সেখানে শীতের প্রখরতা স্বাভাবিক। কিন্তু, দেউলির শীতের কাছে বক্সাও হার মানে। আমরা তবু বক্সায় থাকতে উপযুক্ত শীতবস্ত্রের যোগাড় করেছিলাম এবং দেউলিতে তা' সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু যারা আমাদের পরিচর্য্যার

কাজে নিযুক্ত ছিল, সেই সাধারণ কয়েদীদের দুর্দশা অসহনীয় ছিল। রাত তিনটে নাগাদ আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কুচকাওয়াজের শব্দ শুনতে পেতাম। শীতে যাতে এই কয়েদীরা জমে না যায়, তাই শেষ রাত্রি থেকে ভোর পর্য্যন্ত তাদের প্যারেড করানো হতো—শরীর গরম রাখার জন্য। ইশাক্ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ছিল, কয়েদীদের সর্দ্দার-মেট। এই ইশাক তাদের সারা ক্যাম্পের হাতা জুড়ে প্যারেড করিয়ে নিয়ে বেড়াতো। এক বছর পর অবশ্য তাদের শীতের কম্বলের ব্যবস্থা বাড়ান হয়। পরের শীতকালগুলিতে আর তাদের এই নৈশ প্যারেডের প্রয়োজন ছিল না।

দেউলির শীতের প্রথম বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম যে, আমাদের ঊর্দ্ধাঙ্গকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করার উপযুক্ত শীতবস্ত্র থাকলেও, ধুতিপরে' নিম্নাঙ্গের উষ্ণতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমার আবার কটিবাত ও উরু-দেশের বাতের একটু প্রকোপ মাঝে মাঝে দেখা দিত। তাই, শীতকালে গরম ট্রাউজার ব্যবহার করবো ভাবলাম। প্রথম শীত ত' কেটেই গেল। পরের শীতে যা'তে ট্রাউজার কিনে ব্যবহার করতে পারি, সেজন্য আফিসে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম। কিন্তু আফিস থেকে আমাকে জানানো হলো যে, যেহেতু এটা **Detention Jail, Camp** নয়, সেইজন্য ট্রাউজার পরতে দেওয়ার নিয়ম নেই।

তখন আমার **lumbago** ও **Sciatica**-র অজুহাত দেখিয়ে মেডিকেল অফিসারের নিকট লিখলাম যে, মেডিকেল গ্রাউণ্ডে আমাকে গরম ট্রাউজার ব্যবহারের অনুমতি দিতে তিনি যেন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট-এর নিকট সুপারিশ করেন। মেডিকেল অফিসার তখন **Dr. Garrod** নামে একজন শ্বেতাঙ্গ। তিনি আমার দরখাস্তে সুপারিশ করে লিখে দিলেন যে, ট্রাউজার নয়, তবে আমাকে গরম পায়জামা ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে। ঐ সুপারিশের উপর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ফিনে আমাকে সাদা রং-এর গরম পা'জামা ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। যথারীতি কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে পা'জামা তৈরী করান হ'লো। কিন্তু কথায় বলে বাবুর চেয়ে পেয়াদার বিক্রম বেশী। অধস্তন বাঙালী অফিসারেরা পা'জামা আটক করলেন। এদিকে আমরা ততদিনে (১৯৩৩ এর শেষভাগ) ১নং ক্যাম্প ছেড়ে ৫নং-এ চলে গেছি। শীত-ও এসে গেছে। ৫নং ক্যাম্প থেকে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে সব বিষয় জানিয়ে একটি স্লিপ দিলাম। তারই ফলস্বরূপ অবশেষে পা'জামা পাওয়া গেল।

* * * *

বছরখানেক দেউলির একটি মাত্র ক্যাম্পে বাংলার একশত বিপ্লবী এইভাবে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন। এমন সময় বেশ কানাঘুষা শোনা যেতে লাগলো যে,

সরকার আরো অনেক রাজবন্দী বাংলা থেকে দেউলিতে নিয়ে আসবেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান-ও তৈরী হচ্ছে। ক্রমে আফিসের লোকজনের কাছ থেকে গুজব-টার সমর্থন-ও পাওয়া গেল এবং আমাদের ক্যাম্পের পূর্ব্বদিকস্থ সীমানার বাইরে চাটাইয়ের বেড়ার-ও পাশে যে ঘর-দোর উঠ্‌ছে তা'ও টের পেলাম।

১৯৩৩-এর মাঝামাঝি সময়ে দুই নম্বর ক্যাম্প খোলা হলো। নীরদ চক্রবর্ত্তী এলেন, প্রমথ ভৌমিক এবং কালী সেন এলেন। প্রথম প্রথম দুই ক্যাম্পের লোকদের মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল না। কাঁটা তার ও কালো চাটাইয়ের দু'পাশে পরস্পরের দৃষ্টির আড়ালে থেকে কথাবার্ত্তা হতো। সেন্ট্রিরা কোন বাধা দিত না। একদিন শুনলাম হিজলী থেকে একজন ডেটিনিউ ২নং ক্যাম্পে এসেছেন; তিনি মাতৃভাষা বাংলা ভুলে গেছেন। হিন্দীতে কথা বলেন। একজন সাধক পুরুষ-ও নাকি তিনি। হিজলী ক্যাম্পে লাল কাপড় পরতেন, লম্বা চুল ছিল, নিজ হাতে কালীমূর্ত্তি তৈরী করে পূজা করতেন। পরে নাকি নিজেই একদিন লাথি মেরে কালীমূর্ত্তি ভেঙে দিয়েছিলেন। সাধকেরা এরূপ করেই থাকেন। অনুসন্ধান করে নাম জানলাম, নগেন ধর, ময়মনসিংহ জেলার বাড়ী।

নগেন ধর কিশোরগঞ্জের লোক, আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। আমাদের ইয়ং কম্‌রেড্‌স্‌ লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে পাগল হয়ে গেল। মনটা একটু খারাপ হলো। একদিন কে একজন এসে আমায় বললেন, "আপনাকে ২নং ক্যাম্প থেকে ডাকছে। একটু বেড়ার পাশে যান।"

গেলাম। ওধার থেকে নগেন ধর হিন্দিতে আমায় সম্ভাষণ জানালেন। কিছু-ক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো। ওপাশ থেকে নগেন ধর হিন্দীতে, এপাশ থেকে আমি বাংলায়। কথাবার্ত্তায় কোন পাগলামির লক্ষণ পেলাম না।

পরে দুই ক্যাম্পে যখন মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হলো, সেই সময় নগেন ধরকে একদিন নিরালায় জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর এই প্রকার অবস্থা হওয়ার কারণ কি? সরলভাবে তিনি সব জানালেন। আর হিন্দীতে নয়, বাংলাতেই তিনি তাঁর কাহিনী বলে গেলেন।

"র‍্যারেস্টের পর ময়মনসিংহের আই, বি, আফিসে নিয়ে গিয়ে আমাকে খুব মারধোর করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার গালিগালাজ ও হুমকি—'মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব; মাতৃভাষা ভুলিয়ে ছাড়বো—' ইত্যাদি। ডেটিনিউ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা Practical joke করার মতলব এলো। যেন পুলিশের

মার খেয়েই মাতৃ-ভাষা ভুলে গিয়েছি—এই ভান করে হিন্দিতে কথাবার্তা বলা শুরু করলাম।

'আরেকদিন কী করলাম জানেন? বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখলাম। ঠিকানা লিখতে গিয়ে থ' মেরে বসে রইলাম, তারপর কাঁদতে শুরু করলাম। পাশের বন্ধুরা ছুটে এলেন—"কী ব্যাপার?"

বললাম—'পিতাজীকা নাম ভুল গিয়া। কেইসে চিঠ্ঠি ভেজেগা।'

'বন্ধুদের একজন আফিসে স্লিপ্ দিলেন, আফিস থেকে আমার বাবার নামটা জানাবার জন্য। কারণ, চিঠি লিখতে গিয়ে তাঁর নাম আমি স্মরণ করতে পারছি না। আফিস থেকে নাম এলো এবং সেখানেও রেকর্ড হয়ে রইল, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

কালী সাধনার ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। নগেনবাবু বললেন—"আমার মাথায় বরাবরই একটু ছিট আছে, জানেন ত? বাইরে থাকতে একবার এক কালী-সাধকের আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। লম্বা চুল রাখা, লাল কাপড় পড়া—ভড়ং সবই আমার জানা ছিল। বন্দীশালায় যখন মাথা খারাপ বলে রটেই গেছে, তখন ভাবলাম, আরেক ধাপ এগিয়ে যাই না কেন? ক্যাম্পের ভিতরই মাটি দিয়ে কালীমূর্ত্তি গড়লাম। অমাবস্যা রাত্রে পূজা, ধ্যান ইত্যাদি চলতে লাগলো। শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে চুলের মুঠি ধরে কালীমূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন। একদল ডেটিনিউ এবং সিপাই সান্ত্রীর নিকট একজন বড় সাধক বলে বিবেচিত হলাম।"

"আচ্ছা, এসব কি তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে করেছিলেন?" জিজ্ঞাসা কবলাম।

"তা'ত বুঝতেই পারছেন। এ উদ্দেশ্য একটু ছিল বৈ কি!" —একটু মুচকি হেসে নগেন ধর বললেন।

এর পর থেকে নগেন ধরের মুখে আর হিন্দী কথা শোনা যায় নি। বাংলাতেই কথাবার্তা বলতেন।

নগেন ধর বেশী দিন দেউলিতে ছিলেন না। পরে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বোধ হয় ভিলেজইন্‌টার্নমেন্টে পাঠান হয়।

* * * *

দুই নম্বর ক্যাম্পের ডেটিনিউরা স্থির করলেন, তাঁদের ক্যাম্পে দুর্গাপূজা হবে। আফিসে জানানো হলে আফিস থেকে কোন আপত্তি করা হলো না। বরং সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। আমাদের ক্যাম্পের (১নং) রুনুবাবু (শৈলেন দাশগুপ্ত) একদিন উত্তেজিত ভাবে এসে বললেন, "মশায়, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত ডেটিনিউরা মূর্ত্তিপূজা করবে এ'কি ভাবা যায়? এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা দরকার। আপনাবা ত' কম্যুনিষ্ট; কিন্তু এই পূজা আর্চ্চার বিরোধী হওয়ার জন্য কম্যুনিষ্ট হওয়ার-ও দরকার করে না। **Intellectually advanced** সব লোকই এর বিরোধিতা করবে। আমি এর বিরুদ্ধে ইস্তাহার লিখবো, আপনারা তাতে সই করবেন কি?"

শৈলেনবাবুকে বলা হ'লো, 'দেখুন পূজা আর্চ্চা বা ধর্ম্ম সম্পর্কে আমাদেব মত সুস্পষ্ট—সবারই তা' জানা। কিন্তু, অন্যেরা তা' করলে তাব বিরুদ্ধে প্রচারে নামবো কিনা—বিশেষতঃ এই বন্দীশালায়, তা' বিবেচনা সাপেক্ষ। আমাদের অন্য ক্যাম্পেব বন্ধুদেব সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ কববো।"

রুনু বাবু বললেন, "সাধারণ লোকদেব দ্বারা বা বাইরেব সমাজে এই পূজা অনুষ্ঠিত হলে, কিছু বলতাম না। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দলগুলির ছোট বড নেতারা যেখানে একসঙ্গে রয়েছেন, সেখানে এই আরণ্যযুগীয় ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হবে, আর আমরা বিনা প্রতিবাদে তা' মেনে নেব, এ'তে মন সায় দিচ্ছে না। যা' হোক, আপনারা এই নিয়ে আলোচনা করুন।"

অন্য ক্যাম্পের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হলো। (তখন পর্য্যন্ত ১নং ও ২নং এই দু'টো ক্যাম্পই মাত্র ছিল, মনে হচ্ছে।) ঠিক হলো, পূজা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে আমরা নিজেদের জড়াবো না। তবে ওর বিরোধিতা করে কোন প্রচারপত্র বের করা আমাদের উচিত হবে না। পূজা উপলক্ষে নাটকাদি যে-সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, তাতেও যোগদান না করা অধিকাংশের অভিমত হলো। কিন্তু কালীদা' ভিন্ন মত ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। এ'তে ত' আমরা পূজা বা ধর্ম্মের সঙ্গে কোন আপোষের মনোভাব দেখাচ্ছি না। অন্যদের অভিমত এ বিষয়ে অনেকটা শৈলেনবাবুর মতের অনুরূপ। বাইরে জনসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদের আপত্তি থাকতো না। কিন্তু, বাংলার সেরা সেরা বিপ্লবী নেতারা ভাবধারার দিক থেকে আজ-ও মানব সভ্যতার বিবর্ত্তনের এক সুদূর অতীত যুগের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখবেন—এ ব্যাপারটা আমরা কী চোখে দেখি, তা' তাঁদের বুঝতে দেওয়া দরকার।

যাইহোক, এ বিষয়ে প্রত্যেকে নিজের অভিমত অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন এই ঠিক হলো।

কালীদা' ঐসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, আমরা অন্যেরা কেহ দেই নাই বলে মনে হচ্ছে। তবে, সে-সময় আমরা কম্যুনিষ্ট বলতে ক'জনই বা ছিলাম! সব শুদ্ধ জনা দশেক-ও হবে না বোধহয়।

আমাদেব সঙ্গে কালীদা'র এই মতানৈক্যের ব্যাপারটা পরে আমরা বাইরের তদানীন্তন পার্টি-ইউনিটেব গোচরে আনি (গুপ্ত উপায়ে) এবং তার অভিমত জানতে চাই। কালীদা'র মতকেই পার্টি সমর্থন জানিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পবেব একটি ঘটনাব উল্লেখ করছি। আমরা তখন ৫নং ক্যাম্পে চলে গেছি। নেপাল নাগ বি, ভি'ব সঙ্গে সব সংশ্রব কাটিয়ে আমাদেব সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছেন। দোলের সময় বি, ভি'ব অন্যতম নেতা সত্যবক্সী নেপাল নাগকে এলেন আবীব দিতে। নেপাল গম্ভীরভাবে বললেন—'দেখুন, এই জিনিসটাকে এখন আমি অনেক নীচু স্তরেব সংস্কৃতি বলে মনে কবি।'

সত্যবক্সী থ' মেরে গেলেন। নেপাল তাঁব মত একজন লোকের মুখের উপর এমন কথা বললো' একজন বন্ধুব নিকট নাকি সত্যবক্সী পরে বলেছিলেন—**"I felt myself so small !"**

* * * *

আমবা প্রথম যখন এলাম, তখন ক্যাম্পেব ডাক্তার ছিলেন, একজন মাদ্রাজী—ডঃ জগন্নাথন্। আর ছিলেন একজন বৃদ্ধ হেকিম, দিল্লীব অধিবাসী। প্রসিদ্ধ দেশনেতা হাকিম আজমল খাঁ র আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেন। ওষুধপত্তর বিশেষ কিছুই ছিল না। পেটে ব্যথা হয়েছে। ডাক্তাবকে ডাকা হলো। জগন্নাথ (আমরা শেষের 'ন'-টা উচ্চাবণ করতাম না।) এসে দেখে শুনে বললেন, পেটে গ্যাস হয়েছে। **'Take Plenty of water ; water will go down wards and the gas will come up wards.'** ডাক্তারের এই কথাটা কারো অসুখ হলেই, আমরা ঠাট্টাচ্ছলে ব্যবহার করতাম।

হেকিম সাহেব বেশী দিন ছিলেন না। পরে এলেন চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার হয়ে একজন ইংরেজ—**Dr. Garrod**। আর তাঁর অধীনে—**Dr. Khan**। ডঃ গ্যারড বিশেষ সুচিকিৎসক ছিলেন না। নামের পাশে কোন ডাক্তারী খেতাব-ও দেখিনি। ডঃ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী—**M. B. B. S**। করাচীর অধিবাসী। চিকিৎসক-ও মন্দ ছিলেন না। কিন্তু প্রথমদিকে ডেটিনিউদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন না। বাংলার

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তাঁর কোন পূর্ব্ব-কল্পিত ভীতি-জনক ধারণা ছিল কি না, জানিনা। তবে তিনি ক্যাম্পে ঢুকতেন সঙ্গে একটি রিভলবার নিয়ে। ডেটিনিউদের চোখে এটা ভাল ঠেকেনি। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর নিকট এ সম্বন্ধে জানানো হলো: ডাঃ খান কি ডেটিনিউদের কোন হিংস্র প্রাণী বলে মনে করেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে ক্যাম্পে রিভলবার নিয়ে ঢুকতে হয়! আর যদি তাই তাঁর ধারণা হয়ে থাকে, তবে একটি রিভলবার দিয়ে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন বলে মনে করেন কী করে?

এরপর থেকে ডঃ খান আর সশস্ত্রভাবে ক্যাম্পে আসতেন না।

চিকিৎসকের অভাব কিছুটা দূর হলো বটে, কিন্তু ওষুধ-পত্র বা চিকিৎসার অন্যান্য সুব্যবস্থা হতে তখনও অনেক দেরী ছিল। মামুলি অসুখের বেশী কোন রোগ হলে ডেটিনিউদের সুদূর আজমীর হাসাপাতালে পাঠান হতো।

চিকিৎসা ব্যাপারে প্রথম আমলের এই অব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন, আমাদের কমরেড হরিপদ বাগচী। দেউলি বন্দী নিবাসের দ্বিতীয় বলি। হরিপদবাবু কয়েকদিন ধরে পেটে ব্যথা অনুভব করছিলেন। ডাক্তার এসে দেখে 'এপিণ্ডিসাইটিস্' বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। চিকিৎসার জন্য আজমীর হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে ব্যবস্থাদি করতে কর্ত্তৃপক্ষের সাত আট দিন লেগে গেল। ইতিমধ্যে তাঁর ব্যথা অনেকটা কমে গিয়েছে। যেদিন বিকালের দিকে তাঁকে আজমীরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ এলো, সেদিন তিনি মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছেন। মাঠ থেকে আমিই তাঁকে ডেকে আনলাম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি গেলেন। মনে মনে শঙ্কা অনুভব করলেও আমরা তাঁকে যেতে উৎসাহিত করেছিলাম।

কয়েকদিন পর শুনলাম, তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। পেট কাটার পর নাকি দেখা গিয়েছিল, এপেন্‌ডিক্স বাদ দেওয়ার মত এমন কোন অবস্থা হয়নি। তবু-ও তা' কাটা হলো। তদুপরি তাঁকে রাখা হয়েছিল এমন একটি স্থানে, যে জায়গাটা স্যাঁৎসেঁতে, আলো-হাওয়া বিহীন এবং একেবারে বাথরুম-সংলগ্ন। পাশেই নর্দমা দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে। যথোচিত সেবা-যত্নের ও খুবই অভাব ছিল।

অপর একজন ডেটিনিউ খুলনার নির্মল দাস সে-সময় অন্য কোন রোগের চিকিৎসার জন্য আজমীর হাসপাতালে ছিলেন। তিনি ছাড়া পেয়ে এসে এইসব খবর আমাদের জানান। আসবার আগে হরিপদবাবুকে তিনি দেখে এসেছেন; খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থা। হরিপদবাবু তাঁকে করুণভাবে জানিয়েছেন, এই নরক থেকে যেন তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যাম্প কমিটি থেকে সুপারি-টেন্‌ডেন্টকে সব লিখে জানিয়ে অবিলম্বে হরিপদ বাগচীর উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখবার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করা হলো। কিন্তু, 'কাকস্য পরিবেদনা', কয়েকদিন পরেই ক্যাম্পের ডেটিনিউদের জানানো হলো যে, আজমীর হাসপাতাল ডেটিনিউ হরিপদ বাগচীর মৃত্যু হয়েছে।

স্বভাবতঃই ক্যাম্পের ডেটিনিউরা দুঃখে ও রাগে অভিভূত হলেন। সুপারকে বেশ কড়াভাবে একখানি চিঠি দেওয়া হলো। কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও শৈথিল্যের জন্যই যে এভাবে একটি মূল্যবান প্রাণ বলি হলো, ডেটিনিউরা দৃঢ়ভাবে ইহাই বিশ্বাস করে।

সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট ফিনে ডেটিনিউদের চিঠির উত্তর দিলেন। উত্তরের প্রতিছত্রে শাসক-সুলভ ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছিল। প্রথম ছত্রের বয়ানটা মোটামুটি মনে আছে। 'তোমাদের চিঠি পেয়ে প্রথম ভেবেছিলাম, ওটা Waste-paper-basket-এ ফেলে দেব। কারণ, ও'টাই 'ওর উপযুক্ত স্থান। কিন্তু, দ্বিতীয়বার ভেবে দেখলাম, এ'র উত্তর দেওয়া দরকার। তাই, এই চিঠি দিচ্ছি—'

পরের অংশে কী লেখা ছিল, আজ আর তা' মনে করতে পারছিনা। কিন্তু, ফিনের চিঠিতে ক্যাম্পের বন্দীরা যে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম, সেটা বেশ মনে আছে। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এই অপমান নিষ্ফল আক্রোশে হজম করা ভিন্ন উপায় ছিল না।

পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন সময়ে আরো তিনজন ডেটিনিউ দেউলিতে মারা গেছেন। তখন অবশ্যি চিকিৎসার হালচাল অনেক বদলে গেছে। ক্যাম্পের বাইরে হাসপাতাল উঠেছে। আট দশজন Indoor Patient রাখার মত 'বেড' হয়েছে। অস্ত্রোপচার করার মত-ও ঘর তৈরী হয়েছে। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডারের সংখ্যা বেড়েছে।

দেউলির তিন নম্বর বলি হলেন, সাতকড়ি ব্যানার্জী। তাঁর অবশ্য বয়স হয়েছিল। Stroke হ'য়ে বা অন্য কী রোগে মারা যান, মনে হচ্ছে না। তবে তিনি বিশেষ ভুগে মরেননি। হঠাৎ-ই প্রাণ ত্যাগ করেন।

চতুর্থ বলি শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়। এর মৃত্যু-ও খুবই দুঃখজনক। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, একজন নিপুনক্রীড়াবিদ্ মাত্র বাইশ বৎসর বয়স্ক শৈলেশ চ্যাটার্জী ছিলেন অনুশীলন দলের লোক। কুমিল্লা শহরে ছিল তাঁর বাড়ী। দেউলিতে তিন নম্বর ক্যাম্পে থাকতেন।

প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শৈলেশবাবু হাসপাতালে প্রেরিত হন। সেদিন সকাল বেলা তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। রাত্রে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। তিনি বারান্দায়

দাঁত মাজতে মাজতে অন্য রোগী বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার ডঃ গ্যারড এলেন ইনজেকশন দিতে। শৈলেশবাবু তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গেলেন। ইনজেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন; মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগলো। ডঃ গ্যারড ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—**"He is sinking; he is sinking Call Dr Khan."**

ডাক্তার খানকে ডাকতে সিপাই ছুটলো। কিন্তু, তাঁকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। সেদিন তাঁর ছুটি ছিল। সকালেই কোথাও বেড়াতে চলে গিয়েছেন। কিছুই আর করার ছিল না। একটি তরতাজা প্রাণ এইভাবে ভুল চিকিৎসার শিকার হলো।*

দেউলির পঞ্চম এবং শেষ বলি অনুশীলনের সন্তোষ গাঙ্গুলী। আমরা তখন পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের অধিবাসী। সন্তোষবাবু ও ঐ ক্যাম্পের এক নম্বর ঘরে থাকেন। ঐ ঘরটিতে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা সকলেই অনুশীলন দলের লোক। একদিন বিকালে ক্যাম্পের প্রায় সকলেই ফুটবল মাঠে গিয়েছেন, কেহ খেলতে, কেহ বেড়াতে। ক্যাম্প প্রায় খালি। হঠাৎ অনুশীলনের কয়েকজনকে ছুটে ক্যাম্পে ফিরে আসতে দেখা গেল। মাঠ বন্ধ হওয়ার তখনও সময় হয়নি। আমরাও কিছু একটা ঘটেছে ভেবে ক্যাম্পে ঢুকলাম। এসেই শুনলাম, ১নং ঘরের দরজা জানালা সব ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সন্তোষ গাঙ্গুলী গলায় দড়ি দিয়েছেন। জগদীশ চ্যাটার্জী পিছনের কাঁচের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন। কাঁচ ভাঙ্‌তে গিয়ে তিনিও হাতে দারুণ জখম হয়েছেন। দড়ি কেটে সন্তোষবাবুকে নামানো হলো। কিন্তু প্রাণ তাঁর পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেছে। কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো তা' আমাদের নিকট রহস্যই রয়ে গেল।

১৯৩২-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৩৭-এর শেষ অবধি এই সাড়ে পাঁচ বছর কাল দেউলির পাঁচটি ক্যাম্পে পাঁচশতাধিক বাঙ্গালী বন্দী বিভিন্ন সময়ে আটক ছিলেন। তাঁদের সবাই পরে আবার বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এই পাঁচজন রাজপুতানার ঊষর ভূমিতেই নিজেদের দেহ-ভস্ম মিলিয়ে দিলেন।

---

* পরিশিষ্ট ৪ দ্রঃ





খেলার মাঠ

CV

1 2 3 4 5 6 7 8

CIV

CIII

CII

CI

M

সেঠৌলি বন্দী নিবাসের ছক [মোটামুটি]

CI – ১নং ক্যাম্প
CII – ২নং "
CIII – ৩নং "
CIV – ৪নং "
CV – ৫নং "
১নং ক্যাম্প ভিন্ন অন্য চারটি ক্যাম্প একই ছাঁচে তৈরী।

M – প্রধান আবাস
S – ছোট ছোট ঘর
A – পাহারাদারদের ব্যারাক
B – স্নান ঘর
L – পায়খানা
K – রান্না ঘর
CL – নির্জন সেল

C – কমন রুম
H – হাসপাতাল
O – অফিস
G – গেট
⊙ – সেন্ট্রি বক্স
□ – কন্ট্রোল রুম
D –

দেউলি (৩)

১৯৩৩ এর শেষ দিকে আমাদের এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। শুধু বয়স্ক কয়েকজন এক নম্বরেই রয়ে গেলেন। এঁদের ভিতর ছিলেন, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিকুমার চক্রবর্ত্তি, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী, জ্ঞান মজুমদার, আশু কাহিলী প্রমুখ। বি, ভি-র বর্ষীয়ান নেতা হেম ঘোষকে কিন্তু পাঁচ নম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বেই দুই, তিন এবং চার নম্বর ক্যাম্প পুরোপুরি ভরতি হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশ থেকে বন্দী এনে এক নম্বর ক্যাম্পও ভরতি করতে বেশী দেরী হলো না। দেউলি বন্দী-নিবাসের পাঁচটি ক্যাম্পে এখন মোট রাজবন্দীর সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচশ-তে।

এক নম্বর ক্যাম্প ভিন্ন অন্য চারটি ক্যাম্প একই প্ল্যান-এ তৈরী হয়েছিল। কাঁটা তার ও আলকাতরা মাখান চাটাইয়ের বেড়া দ্বারা ঘেরা একটা সুপরিসর স্থানে পরস্পর সমান্তরাল দুটি ব্যারাক। ইটের দেওয়াল, টিনের ছাউনি এবং সামনে লম্বা এক-টানা বারান্দা বিশিষ্ট এই ব্যারাক-দুটির প্রত্যেকটিতে চারটি করে কামরা ছিল। দুই প্রান্তের দুটি কামরায় তের জন করে এবং মাঝের দু'টিতে বার জন করে—মোট পঞ্চাশ জনের স্থান ছিল এক একটি ব্যারাকে। একটি ক্যাম্পে তাই, একশ জনের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। [প্রদত্ত ছক দ্রষ্টব্য।]

প্রত্যেকটি ব্যারাক আবার আলাদা করে কাঁটা তার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। রাত দশটা নাগাদ প্রত্যেকটি ব্যারাক তালাবন্ধ করে দেওয়া হতো এবং ভোরে খুলে দেওয়া হতো। এই সময়ের ভিতর দুই ব্যারাকের বন্দীরা পরস্পর মেলামেশা করতে পারতেন না।

এক নম্বর ক্যাম্পে কতকগুলি বড বড় নিমগাছ থাকাতে ক্যাম্পটি একটু ছায়াছন্ন ছিল। কিন্তু পাঁচ নম্বর ক্যাম্প বৃক্ষাদি বর্জিত মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত ছিল বলে শীত ও গ্রীষ্মের উভয়েরই দাপট তীব্রতরভাবে অনুভূত হতো। শীতের প্রাক্কালেই আমরা সে ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম, তাই দেউলির প্রকৃত শীত সেবারই প্রথম অনুভব করি। রাত্রে বাইরে কোন অগভীর পাত্রে জল রাখা থাকলে, সকালে দেখা যেতো সেই

জলের উপর একটা পাতলা আবরণ জমাট বেঁধে আছে।

আমাদের থাকাকালীন এক নম্বরে বিজলী বাতির ব্যবস্থা ছিল না। অন্য চারটি ক্যাম্পে কিন্তু প্রথম থেকেই সে ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্যাম্পের মেন-গেটে অবস্থিত সেন্ট্রিদের ঘরে তার 'সুইচ' থাকতো, রাত এগারটায় সেই 'সুইচ' বন্ধ করে দেওয়া হতো।

জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ও আমি দুই নম্বর ব্যারাকের আট নম্বর ঘরে আস্তানা নিলাম। ঐ ঘরে অন্য যাঁরা আগা-গোড়া বা বিভিন্ন সময়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম মনে করতে পারছি ; পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ; অমলেন্দু দাশগুপ্ত , প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (ট্যানা) ; ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী ; জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ; রবি রায় ; সৌরভ ঘোষ ; ত্রিপুরা সেন ; সুশীতল রায়-চৌধুরী ; কালু ব্যানার্জি ; নগেন সরকার ; হরিনারায়ন চন্দ্র।

ফুটবল মাঠের পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক ঘিরে এই ক্যাম্প পাঁচটির অবস্থান ছিল। সকালে একঘণ্টা ও বিকালে ঘণ্টা দুই বা তিন পাঁচ ক্যাম্পের বন্দীরা একত্রিত হয়ে, এই মাঠে খেলাধূলা বা ভ্রমনাদি করতে পারতেন। তখন ক্যাম্পগুলির মাঠের দিকের দরজা এবং মাঠের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হতো। এই সময় বিভিন্ন ক্যাম্পে যাওয়া-ও বারণ ছিল না। মাঠের দরজা বন্ধ হওয়ার মিনিট পনের আগে প্রথম ওয়ার্নিং হুইশেল পড়তো এবং পাঁচ মিনিট আগে দ্বিতীয় হুইসেল। তখন সকলকেই নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে আসতে হতো। ক্যাম্পের এবং মাঠের দরজাও তখন আবার বন্ধ করে দেওয়া হতো। সকাল বেলা খেলার মাঠ বন্ধ হবার পর বেলা আটটা নাগাদ রোলকল করতে আফিসের কর্ম্মচারীরা ক্যাম্পের ভিতর আসতেন। যদি কেউ নিজ ক্যাম্পে ফিরে না আসতেন, তবে রোলকলের সময় ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

অনুশীলনের অমূল্য মুখার্জি দেরীতে ফিরে আসার ব্যাপারে নাম করেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের-ই অধিবাসী। সকাল বেলা মাঠের দরজা খুলে দিলে এক নম্বর ক্যাম্পে যেতেন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। এক নম্বরের অবস্থান মাঠ থেকে একটু দূরে বলে, ওয়ার্নিং হুইসেল অনেক সময় শোনা যেত না। ফিরবার বেলায় অমূল্যবাবু প্রায়ই এসে দেখতেন, মাঠের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সিপাই চাবি নিয়ে আফিসে ফিরে যাচ্ছে, সিপাইকে একটু তোয়াজ করে অমূল্যবাবু বলতেন, "হাবিল-দারজী, থোরা খুল্ দিজিয়ে।" সিপাই আপত্তি করতো না ; অমূল্যবাবু ক্যাম্পের বন্ধুদের হৈ চৈ অভ্যর্থনার ভিতর হাসি মুখে ক্যাম্পে ঢুকতেন।

একাধিক দিন এমনি হওয়ার পর, সেদিন অমূল্যবাবু যখন একই অবস্থায় সিপাইকে' 'হাবিলদারজী' সম্বোধন করে গেটটা খুলে দিতে অনুরোধ জানালেন, সিপাই

গম্ভীর ভাবে বললো, "আজ 'সুবাদারজী' বল্‌নে সে ভি নেই খুলেঙ্গে। আফিস মে চলিয়ে।" অগত্যা অমূল্যবাবুকে আফিসে যেতে হলো। মামুলি ওয়ার্নিং দিয়ে সিপাইসহ তাঁকে যেন গেট দিয়ে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেদিন বন্ধুদের কাছ থেকে অমূল্যবাবুর সরব অভ্যর্থনা একটু জোরালো হলো। হাস্‌তে হাস্‌তে অমূল্যবাবু নিজেই সিপাই'র রসপ্রিয়তার আখ্যানটি বললেন।

* * * *

আমরা পাঁচ নম্বরে আসার অল্পদিন পরেই সুপারিনটেণ্ডেন্ট ফিনে এখান থেকে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন একজন মিলিটারী অফিসার **Major Crastor** বেশ দিল খোলা মানুষ ; ফিনের মত **Shrewd**······ছিলেন না। শাসক-সুলভ ঔদ্ধত্যেরও কোন পরিচয় দেননি। ডেটিনিউদের সঙ্গে বন্ধুর মতই আচরণ করতেন, বরং বলা চলে, নিজেকে এতগুলি লোকের গার্জিয়ান বলে মনে করে খুশী হতেন। তাদের আব্দার রক্ষা করতে যথাসম্ভব যত্নবান হতেন। অন্নদা দাশ অতি অল্প বয়স্ক একজন ডেটিনিউ। বোধহয় তখন সাবালকত্ব-ও প্রাপ্ত হয়নি। একদিন সুপারিনটেনডেন্টকে ধরলো—'সাহেব, আমি একটা হরিণ পুষবো। ব্যস। কয়েকদিনের ভিতর এক হরিণ-শাবক এসে হাজির। অন্নদার হরিণ দেউলি ক্যাম্পে বিখ্যাত ছিল। সকালে বিকালে যখন ডেটিনিউদের জন্য খেলার মাঠ খুলে দেওয়া হতো। অন্নদার হরিণ-শাবক-ও তখন অবাধে খেলার মাঠে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াত। সকলের আদর কুড়িয়ে এবং নানা জনের দেওয়া ফল ও বিস্কুট খেয়ে অল্প-দিনের ভিতরই সে বেশ প্রিয়দর্শন হয়ে উঠলো। একদিন দেখা গেল, হরিণ শাবকটি যথারীতি মাঠে ও ক্যাম্পগুলিতে বিচরণ রত, আর তার গলায় একটি প্ল্যাকার্ড ঝুলছে—'আজ আমায় কেউ কিছু খেতে দেবেন না। আমার পেটের অসুখ করেছে।'

রাজপুতানা ময়ূরের দেশ। কিন্তু ক্যাম্পে আমরা ময়ূর দেখতে পাইনা। সাহেবকে বলা হলো—'আমরা ময়ূর পুষবো : ব্যবস্থা করে দাও।' কিছুদিনের ভিতরই প্রত্যেক ক্যাম্পে কতকগুলি করে ময়ূরের ডিম এসে গেল। মুরগী দিয়ে ডিমে তা' দিয়ে ময়ূরের ডিম ফোটান হলো। ছোটবেলা ময়ূরের বাচ্চাগুলি দেখতে অতি কুৎসিত। তবে মাস ছ'য়ের ভিতরই সুন্দর লেজ গজিয়ে যায় এবং তাদের মনোহর রূপের প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ক্যাম্পেই কয়েকটা ময়ূর ছিল। এই উপলক্ষে একজন সিপাই একদিন এক ডেটিনিউকে বলেছিল—'বাবু, আপনাদের জন্য আমাদের পরেশানির অন্ত নেই। পাগলা সায়েব আমাদের হুকুম দিয়েছে—চারধারের বিশাল মাঠে যত ঝোপঝাড় আছে, সেগুলি খুঁজে দেখতে হবে, ময়ূরের ডিম আছে কি না ; পাওয়া গেলেই সাহেবকে এনে দিতে হবে।'

ময়ূরেরা নাকি ঝোপেঝাড়ে মাটিতেই ডিম পাড়ে।

একদিন দেখা গেল, ক্যাম্পের ভিতর এক উট এসে হাজির। ক্র্যাস্টার সাহেব তার পিঠে বসে এবং চালক উট চালিয়ে আনছে। পিঠ থেকে নেমে সাহেব সবাইকে জানালো—'যার ইচ্ছে হয়, সে এসে উটের পিঠে চড়তে পার'। অনেকেই চড়লেন। তবে বাঙালীদের উটে চড়া অভ্যাস নেই। তাই একা একা কেউ উঠতে সাহস করেনি। চালকের পিছনে বসে সাহেব, তার পিছনে সাহেবের কোমর জড়িয়ে ধরে এক একবারে এক একজন ডেটিনিউ উষ্ট্রারোহণের আনন্দ উপভোগ করছেন। সাহেব আবার মাঝে মাঝে ভয় দেখাবার জন্য ডাইনে বাঁয়ে নিজের শরীরটাকে ভীষণভাবে দোলাতে থাকে। পিছনে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত দুটি তখন সাহেবের কোমরে আরো দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। এইভাবে ক্যাম্পের হাতায় বেশ কিছুক্ষণ উট-দৌড় চললো। যাঁরা উটের পিঠে চড়লেন না, তাঁরা সমবেত হয়ে এই কৌতুকাবহ দৃশ্য উপভোগ করলেন। কিন্তু, কেউ কেউ আবার এই ব্যাপারটাতে সায় দিলেন না। আমাদের বিদেশী শাসকের প্রতিনিধির সঙ্গে এতটা মাখামাখি ভাল নয়।

পরে জেনে ছিলাম, উটটি আনা হয়েছিল রামপুরের নবাবের কাছ থেকে।

একদিন কোন একটা কারণে সুপারিন্টেনডেন্ট-এর কাছে একজন অফিসারের নামে নালিশ করেছিলাম। একদিন বা দু'দিন পরে আমাকে 'স্লিপ্' দিয়ে জানানো হলো যে, সেই অফিসারের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফিনে সাহেবের আমলে এমনটা কখানো আশা করা যেত না।

আরেকদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল, তিন নম্বর ক্যাম্পে। ঘটনাটা বলবার আগে ক্র্যাস্টার-এর একজন বিশ্বস্ত অনুচরের একটু পরিচয় দিয়ে নেই। **Wiggins** নামে একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট ছিল। লম্বা, ছিপ্‌ছিপে; বোধহয় বহুদিন যাবৎ এদেশে আছে। জল হাওয়ার গুণে তাই তার দেহের শুভ্রকান্তি প্রায় তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ক্র্যাস্টারের সে ছিল সর্ব্বক্ষণের অনুগামী। ক্যাম্পের ভিতর উইগিন্‌স্—বিহীন ক্র্যাস্টারকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ক্র্যাস্টারের একটা পোষা বাঘ ছিল। উইগিন্‌স তার শিকল ধরে ক্র্যাস্টারের পিছু পিছু বহুদিন ক্যাম্পে এসেছে।

সেদিন রাত প্রায় এগারটায় অনুচর উইগিন্‌স-কে সঙ্গে নিয়ে ক্র্যাস্টার এসেছেন তিন নম্বর ক্যাম্পে 'রাউণ্ড' দিতে। একটি ঘরে ঢুকে দুই সারি বিছানার মাঝের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন পর্দ্দা আবৃত একটি শয্যা থেকে উচ্চ নাসিক-গর্জন বেরুচ্ছে। সাহেব বোধহয় একটু পানমত্ত ছিলেন। পর্দ্দাটা একটু ফাঁক করে বেশ

হাসিখুশীভাবে কিছু একটা বলে হাতের লাঠির অগ্রভাগ দিয়ে নিদ্রিত ব্যক্তির গায়ে এক খোঁচা দিলেন। বাস্, আর যায় কোথায়। আশেপাশে যে সব ডেটিনিউ তখন-ও নিদ্রা যাননি, তাঁরা লাফিয়ে উঠে সাহেবকে ঘিরে ধরলেন।

"ওকে খোঁচা দিলে কেন?"

"ও কেমন গর্জন করছিল, তাই জাগিয়ে দিলাম"—হাসিভাবেই সাহেব বললেন।

"ইয়ার্কি পেয়েছ? তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।"

এইবার সাহেবের-ও মেজাজ গরম হ'লো। চেঁচিয়ে উঠলো—"What! you want to fight? you will have it"

পরক্ষণেই উইগিন্সের দিকে তাকিয়ে বললো—"Wiggins, what do you say, War or Peace?"

উইগিনস্ ভ্যাবাচেকার মত উত্তর দিল—"Peace, Sir, Peace"

সাহেব তখন ডেটিনিউদের দিকে তাকিয়ে বললো—Wiggins says, Peace, so there will be peace. I regret the incident".

ব্যাপারটা আর গড়ালো না। সাহেব যে ভাল মানুষ সবাই জানতো।

* * * *

গাছপালা

এই রুক্ষ মরু অঞ্চলের ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি কিন্তু কম ছিল না। এক নম্বর ক্যাম্পে বেশ কয়েকটি নিমগাছ ছিল; ক্যাম্প কম্পাউণ্ডটি তাই খানিকটা ছায়া স্নিগ্ধ ছিল। ঐ ক্যাম্প থেকে খেলার মাঠে যাবার রাস্তার দু'ধার কতকগুলি ছোট ছোট গুল্মে আবৃত ছিল। জানলাম যে, সেগুলি চিরতা-গাছ। ডাল ছিঁড়ে মুখে দিয়ে তার সত্যতায় নিঃসন্দেহ হয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। সন্নিকটে একটি লতাচ্ছাদিত রাবিশের স্তূপ ছিল। শীতের প্রাক্কালে সুন্দর গোলাপী রং-এর ফুলে লতাটি ছেয়ে গিয়ে এক অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করতো। কে একজন বললেন, এটা কোন বন্য লতা নয়। পুষ্প বিলাসীদের বাগান ও গৃহের শোভাবর্দ্ধনে এই লতা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী নাম—এন্টিগনন। মনে হলো ক্যাম্পটি যখন পূর্ব্বে সেনানিবাস ছিল, তখন হয়ত কোন সৌন্দর্য্য-প্রেমিক এই লতাটি এনে লাগিয়ে ছিলেন। সেনানিবাস উঠে যাওয়ার পর, প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও লতাটি একেবারে মরে যায়নি।

পরে আমরা ৫নং ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হলে ওখানকার এক নম্বর ব্যারাকের জনৈক বন্ধু বসরা গোলাপের একটি চারা কিনে এনে লাগিয়ে নিয়মিত জল প্রদানে তার পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। অল্পদিনের ভিতর-ই গাছটি এমন সজীব ও বর্দ্ধিত হয়ে উঠলো যে, ওকে আর গুল্মের পর্যায়ে না রেখে বৃক্ষের পর্য্যায়ে গণ্য করাই আমাদের নিকট সঙ্গত মনে হলো। অজস্র গোলাপে গাছটি যখন ছেয়ে থাকতো, সে-দৃশ্য দাঁড়িয়ে থেকে চোখে দেখার মত।

জল পেলে এই মরুর বুকেও ফুলের ফসল ফলানো চলে, এই চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখে অনেকেই ফুলের বাগান করার উৎসাহে মেতে উঠলেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে বেশ কয়েকটি পুষ্পোদ্যান গড়ে উঠলো। প্রভাস লাহিড়ী (ছোট) ত' grafting করে একই গাছে বিভিন্ন রং-এর গোলাপফুল ফোটাবার এক্সপেরিমেন্ট করতে লাগলেন। আমিও খানিকটা অবসর সময় ফুলের চাষে কাটাবো বলে মনস্থ করলাম। আমাদের কামরার সন্নিহিত কাঁটা তারের বেড়া সংলগ্ন খানিকটা জমি তারের জাল দিয়ে ঘিরে নিলাম। ভিতরে নানা প্রকার ফুলের চারা লাগানো হলো। এলাইসাম, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট্‌, এ্যামারান্থাস, কার্ণেশান, প্যান্সি, ফ্লক্স, ভারবেনা, পিটুনিয়া, গিলার্ডিয়া—ইত্যাদি বহু মরশুমী ফুলের বীজ সাটনের ক্যাটালগ দেখে আনানো হতো। চারা করে লাগানোর পর গাছগুলিতে যখন ফুল ফুটতে থাকতো, নানা বিচিত্র রং-এর সমাবেশে বাগানটি তখন নয়নাভিরাম হয়ে উঠতো। এছাড়া, গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেল প্রভৃতি দেশী সুগন্ধি ফুলের চারাও বাগানে স্থান পেয়েছিল।

বাগানের একপ্রান্তে একটি লতা-বিতান তৈরী করা হয়েছিল। চামেলী লতায় ছাওয়া তারের জালের এই কুটীরটি মনোরম নিভৃত আবাসরূপে ব্যবহার করা যেত। নীল পর্দায় ভিতর দিকটা আবৃত ছিল। ভিতরে একখানি ডেক্-চেয়ার পেতে নিরিবিলি বই পড়ায় বা লেখায় মনঃ-সংযোগ করা যেত। আর প্রয়োজন হলে চেয়ারটি সরিয়ে মাটিতে সতরঞ্জি পেতে চার-পাঁচ জন বন্ধুবান্ধব মিলে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হতো। আমাদের সেল কমিটির মিটিং সাধারণতঃ এই লতাকুঞ্জেই অনুষ্ঠিত হতো। একদিন নেপাল নাগ ঠাট্টা করে বললেন—"যদি আমরা বেঁচে থাকতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে এখানে একটি স্মৃতি-ফলক বসাতে হবে। কারণ, এইখানে বসে আমরা ভাবী ভারতের স্বপ্ন দেখেছি।"

* * * *

জীবজন্তু

উদ্ভিদের কথা বললাম। দেউলিতে বন্দী থাকাকালীন যে-প্রাণী-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তার একটু উল্লেখ করছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় একটি পতঙ্গের কথা। এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল, বলা চলে, দেউলির প্রথম রাত্রেই। তখন অবশ্য পরিচয়টা প্রত্যক্ষ হয়নি, তবে ফলটা অনুভূত হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবেই।

গ্রীষ্মকালে রাত্রে আমরা বাইরে ঘুমাতাম, সেকথা আগেই বলেছি। মশারি টানান' হতো না, তার প্রয়োজন-ও ছিল না। মুক্ত আকাশের তলায় একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুম ভালই হতো

সকালে উঠে অনেকেই লক্ষ্য করতেন, তাঁদের গায়ে বেশ বড় বড় ফোস্কা পড়েছে। ডাক্তার এসে ফোস্কা কেটে জল বের করে দিয়ে কিছু ওষুধ লাগিয়ে দিতেন। বিশেষ কিছু জ্বালা যন্ত্রণা না থাকলেও, কয়েকদিন যেত ঘা শুকোতে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই দেখা যেত, কেউ না কেউ এই অস্বস্তিকর ব্যাপারের শিকার হয়েছেন।

স্পষ্টই বোঝা যেত, কোন বিষাক্ত কীট বা পতঙ্গের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগ রয়েছে। কিন্তু অপরাধীর হদিশ পেতে কিছুদিন লাগলো। খুব লক্ষ্য রেখে রেখে অবশেষে দেখা গেল, একপ্রকার উড়ন্ত পোকা গায়ে যেখানে এসে বসে, সেখানেই এই ফোস্কা পড়ে। পোকাগুলি দেখতে অনেকটা বোলতার ন্যায়। তেমনই বড়, তবে হুল নেই, কামড়ায়-ও না। গায়ের রং বাদামী। দিনের বেলায় বড় একটা দেখা যায় না। সন্ধ্যার পর উড়ে এসে নিঃশব্দে গায়ে বসে এবং নিজ দেহের পিছন দিক থেকে একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। এ রসটা যেখানে লাগে, সেখানেই ফোস্কা পড়ে।

আসামীকে যখন চেনা গেল, তখন হিড়িক পড়ে গেল ওদের খতম করার। সন্ধ্যার পর হ্যারিকেন সামনে রেখে (আমাদের তখন বিজলীবাতি ছিল না, তা' আগেই বলা হয়েছে) অনেকেই ওৎ পেতে বসে থাকতেন কখন পোকাগুলি উড়ে আসবে। আলোর প্রতি ওদের একটু আকর্ষণ আছে, লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উড়ে আসা মাত্র ছোট লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওদের যমালয়ে প্রেরণ করা হতো।

কয়েক মাসের ভিতরই ওদের উৎপাত কমে গিয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে

নিধনের ফলেই হউক, বা অন্য কোন অজানা কারণেই হউক, ওদের বংশ প্রায় লোপাট হয়ে গিয়েছিল। পরের কয় বছর ওদের উৎপাত কদাচিৎ হয়েছে।

পোকাটার নামকরণ করেছিলাম আমরা—ফোস্কা পোকা বা **Blister Fly**

এইবার অন্য প্রাণীদের কথায় আসা যাক্। অম্বদার হরিণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি এবং কীভাবে ক্যাম্পে ময়ূর পোষা শুরু হলো তার-ও উল্লেখ করেছি। এছাড়া আরো কতকগুলি জীব আমরা ক্যাম্পে পুষবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মুরগী ত' প্রত্যেক ক্যাম্পেই বেশ কয়েকজন পুষতেন। 'লেগ হর্ন', 'ব্ল্যাক মিনর্কা', 'রোড আয়ল্যাণ্ড' জাতীয় মুরগীই ছিল প্রধান। 'টার্কি'-ও কোন কোন ক্যাম্পে ছিল। গিনি ফাউল ও হাঁস কেউ কেউ পুষতেন বলে মনে হচ্ছে। এইসব ভক্ষ্য জীব ভিন্ন আর ছিল, সাদা খরগোশ, টিয়া পাখী এবং কাঠবেড়ালি।

এক নম্বর ক্যাম্পের নিমগাছগুলি ছিল প্রচুর কাঠবেড়ালির বিচরণ-ক্ষেত্র দু' একটা বাচ্চা কাঠবেড়ালি মাঝে মাঝে গাছের উঁচু ডাল থেকে 'ধপ্' করে মাটিতে পড়ে যেত। পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ তারা নড়তে চড়তে পারতো না। ঐ সময় ছুটে গিয়ে ওদের ধরা আমাদের এক আনন্দময় খেলা ছিল। মুঠো করে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওদের দু'টি শুভ্র দাঁত আঙ্গুলে বসিয়ে দিত। ঐ পর্য্যন্তই; ওটা সহ্য করে ধরে নিয়ে আসা হতো। দিন দুই তিন একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বিস্কুট ইত্যাদি খেতে দিয়ে পুষলেই ওরা পোষ মেনে যেতো। এক নম্বর ক্যাম্পে থাকতে আমারও এমনি একটি পোষা কাঠবেড়ালি ছিল। টেবিলের উপর একটি ছোট কার্ড-বোর্ডের বাক্সে তুলো দিয়ে বাসা করে দেওয়া হয়েছিল। সকালবেলা বিস্কুট ও বাদাম খেয়ে সে বেরিয়ে যেত সন্ধ্যেবেলা ঐ বাক্সে এসে আশ্রয় নিত। দিনের ভিতর আরো দু'একবার যে আসতো না, তা' নয়। এলেই যথারীতি বাদাম ও বিস্কুট খেতে পেত।

আমাদের কাঠবেড়ালি পোষার শখ্ দেখে হিন্দুস্তানী পরিচারকেরা মাঝে মাঝে 'গিলৃহরী কা বাচ্চা' ধরে এনে দিত এক নম্বর ক্যাম্পে তাই পোষা কাঠ-বেড়ালির সংখ্যা সে সময় বেশ কিছু ছিল। শীতকালের সকালবেলা দেখা যেত, বাইরে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ডেটিনিউরা অনেকেই 'পৃষ্ঠেন সেবয়েৎ অর্কং'-কার্য্যে রত আছেন। আর তাঁদের কারো কারো পিঠে হাত পা, লেজ ছড়িয়ে দিয়ে এক একটি কাঠ-বেড়ালি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। মনে হতো, জামার উপর যেন একটা সুন্দর নক্সা কাটা রয়েছে।

টিয়া পাখীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে, আমার একটি অদ্ভুত

পোষমানা টিয়ে পাখীর কথা। আমাদের স্নানের ঘরের পাশে খানিকটা জমিতে কিছু মটরের দানা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ওখানে জল পাবার কোন অসুবিধা না থাকায় মটর ক্ষেতটি অল্পদিনেই সবুজের সমারোহে ছেয়ে গেল। গাছগুলি যখন শুঁটিতে ভরে গেল, তখন টিয়ে-পাখীর ঝাঁক এসে বসতে লাগলো মটর-শুঁটির লোভে একদিন সকালবেলা আমাদের রুমের ট্যানাবাবু (প্রফুল্ল চ্যাটার্জি—ম দাবীপুর) বাথরুম থেকে মুখ ধু'য়ে বেরিয়ে মটর ক্ষেতের পাশে নরম রোদ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। একদল টিয়ে পাখীকে ক্ষেতে বিচরণ করতে দেখে, তিনি তাদের ধরতে চেষ্টা করলেন। সব পাখীই উড়ে গেল. একটি ভিন্ন। সে পাখীটা পালিয়ে ত' গেলই না, বরং সেধে এসে যেন ট্যানাবাবুর হাতে ধরা দিল। ট্যানাবাবু বিজয় গর্ব্বে পাখীটাকে নিয়ে ঘরে এলেন। ইতিমধ্যে পাখীটা তার নিজের ভাষা ছেড়ে মানুষের গলায় নানা কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। বারবার উচ্চারিত 'মিঠ্ঠু' কথাটা শুনে বোঝা গেল পাখীটার নাম 'মিঠ্ঠু', এবং এটি স্থানীয় কোন লোকের পোষা পাখী ছিল।

কী করে জানি, 'মিঠ্ঠু'কে পুষবার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। তারের জাল দিয়ে বেশ একটা বড় খাঁচা তৈরী হলো এবং নানা উপাদেয় ফলমূল খেয়ে 'মিঠ্ঠু' বর্দ্ধিত হতে লাগলো।

কয়েকদিনের ভিতরই বোঝা গেল মিঠ্ঠুকে সব সময় খাঁচায় বন্দী করে না রাখলেও চলে। আমার কাঁধে চড়ে সে ঘুরে বেড়াতো। আমার লতা-বিতানে ডেক্-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে যখন কোন বই পড়তাম, তখন মাঝে মাঝে তাকে সেখানে ছেড়ে দিতাম। সে চেয়ার বেয়ে বা আমার গা বেয়ে উপরে উঠতো। আমার ঘাড়ের কাছে বসে মনের আনন্দে আমার শক্ত কলার ঠোঁট দিয়ে কেটে যেত। সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেত, আমার বোতামগুলি তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে 'কটাস্' কটাস্' করে কেটে দিতে। আরেকটা কাণ্ড সে যা' করতো, তা' যদি বন্ধুরা দেখতে পেতেন তবে আমাকে ঠাট্টা করে নাজেহাল করতেন। আমার কাঁধে বসে, গলাটি মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে আমার ছোট করে ছাঁটা গোঁফ-রাজি ঠোঁট দিয়ে কট্ কট্ করে কেটে আরো ছোট করে দিত। বেশী উৎপাত করলে আঙ্গুলের নখ দিয়ে তার ঠোঁটে জোরে টোকা দিতাম। সে মুখ ঘুরিয়ে নিত, কিন্তু কামড়াতো না। একটি পা' তুলে গ্রীবা বাঁকিয়ে "মিঠ্ঠু, মিঠ্ঠু" বুলি ছাড়তো। আর একটা বুলি যা হামেশাই তার মুখ থেকে বেরোত, তা আমাদের কানে 'চিত্রকুটে', 'চিত্রকুটে' বলে শোনাত। কিন্তু এ কথাটার কোন মানে বুঝতে পারতাম না। রাজস্থানী ভাষায় কোন শব্দ হবে কিনা জানি না।

একাধিক দিন সে অবশ্য উড়ে চলে গিয়েছে; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরে এসেছে। এইভাবে একদিন ফিরে না আসায় পরদিন এ ক্যাম্পে ও ক্যাম্পে খোঁজ করলাম। চার নম্বরের একজন পরিচারক জানালো যে, আগের দিন সন্ধ্যেবেলা তাদের ক্যাম্পের পাখীর খাঁচার উপর একটি টিয়েপাখী এসে বসেছিল। একজন বাবু তাকে ধরে খাঁচায় পুরে রেখেছেন। গেলাম সেই খাঁচার কাছে। সে ত' খাঁচা নয়, তারের জালের ছোট খাট একখানা ঘর। ভিতরে পনের কুড়িটি টিয়েপাখী দাঁড়ে বসে আছে। সবাই দেখতে একরকম। মিঠ্ঠু আছে কি না, বুঝবো কী করে? কিন্তু বুঝতে দেরী হলো না। 'মিঠ্ঠু' বলে ডাকতেই একটি পাখী ঘাড় বাঁকিয়ে "মিঠ্ঠু মিঠ্ঠু" "চিত্রকূটে চিত্রকূটে" বলে ডাকতে লাগলো। ধরে আদর করতে করতে নিয়ে এলাম। চার নম্বরের ডেটিনিউ বন্ধুরা সস্মিত বদনে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। আমাদের ক্যাম্পের বন্ধুরা-ও উচ্চৈঃস্বরে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

একদিন ঘটেছিল এক নাটকীয় ব্যাপার। প্রায় সিনেমা দেখানোর মত। 'মিঠ্ঠু' একদিন উড়ে গিয়েছে। কিন্তু একদিন নয়, দু'দিন নয়; প্রায় চারদিন সে নিরুদ্দেশ। ইতিমধ্যে কয়েকদিন বেশ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আশা ছেড়ে দিলাম। হয়, কারো হাতে ধরা পড়েছে। নয়ত' প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের বলি হয়েছে। কারণ, ছোট থেকে মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে সে তার সহজাত আত্মরক্ষার বৃত্তিগুলি ভুলে গিয়েছিল। একটু দুঃখ হলো বটে, কিন্তু এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মেনে নিলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে মাত্র ফিরে এসেছি। মাঠের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'শম্ভু' ছুটে এলো আমার কাছে। শম্ভু-র ভাল নাম শান্তি-স্বরূপ। আমাদের ক্যাম্পের ক্ষৌরকার। 'বুদায়ুন' শহরে বাড়ী। কোন একটা অপরাধে জেলে এসেছে। একটু উর্দু লেখাপড়া জানে বলে আমার সঙ্গে একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

শম্ভু বললো—'বাবু, কমনরুমের চালের উপর একটা টিয়েপাখী বসে আছে। দেখুন ত' আপনার মিঠ্ঠু কি না।'

কাল বিলম্ব না করে শম্ভুর সঙ্গে ছুটলাম। মিঠ্ঠুকে চিনতে-ও দেরী হলো না। নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার অভ্যাসমত সাড়া দিল। "আয়, আয়, মিঠ্ঠু" বলে ডাকতে লাগলাম। ধীরে ধীরে পা' ফেলে সে চালের কিনারা পর্য্যন্ত এলো, কিন্তু নীচে নামার কোন সুবিধা করতে পারলো না। ঘরের দেওয়াল ছিল চালের প্রান্ত থেকে অনেক ভিতরে। অথচ, উড়ে-ও এলো না। মনে হলো যেন উড়তে অক্ষম।

সময় বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে কিছুই করা যাবে না। যা' করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেকেই সেখানে জুটে গিয়েছেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন আমাকে গিয়ে চালে উঠে পাখীটাকে ধরে আনতে। কারণ, আমি ভিন্ন আর কাউকে মিঠ্‌ঠু ধরা দেবে না।

কিন্তু উঠি কী করে? চাল মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। মই বা অন্য কিছু নেই যে, বেয়ে উঠে যাবো। ছোটে সিং এগিয়ে এলো—'বাবু, আমার কাঁধে ওঠ।' কিন্তু সেই বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ-কায় ছোটে সিং-এর কাঁধে ওঠা-ও আমার কর্ম নয়। তারপর পোষ্ট-বক্স্‌ নিকটেই। সন্ধ্যেবেলা এতগুলি লোকের জটলা। সিপাই সমনোযোগে দেখছে। ঘরের চালে ওঠা সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। নেপাল নাগ সিপাইকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বললেন—'পাখীটাকে ধরে আনতে বাবুদের একজন ঘরের চালে উঠবেন।'

সিপাই জবাব দিল—হুকুম নেই। তবে যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারি, সে কিছু বলবে না। তার উপরওয়ালারা যদি দেখে ফেলে, তবে সে বিপদে পড়বে।

এদিকে ছোটে সিং উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আমায় বলছে, বাবু, আমার পিঠে উঠে পড়; কাঁধের উপর পা' দিয়ে দাঁড়াও। আমি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবো, তুমি দেয়াল ধরে নিজেকে ঠিক রাখবে।

এইভাবে তার কাঁধে উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ছোটে সিং তখন আমার পায়ের পাতা দু'টো মুঠো করে ধরে আমাকে আরো উঁচু করে তুলে ধরলো। ঘরের চালে উঠতে তখন আর কোন অসুবিধে হলো না। মটকায় উঠে মিঠ্‌ঠুর কাছে যেতেই সে ধরা দিল। কিন্তু তাকে নিয়ে নামি কী করে? উঠবার সময়ে দু হাত দু পা ব্যবহার করেছি; নামতেও হবে সেই ভাবে। পাখীটাকে নিয়ে কী উপায়ে নামবো, ভাবছি, এমন সময় ছোটে সিং তার কোমরে বাঁধা গামছাখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, বাবু, এক প্রান্তে পাখীটাকে বেঁধে গামছাখানা ঝুলিয়ে দাও।

তাই করা হলো। গামছার একপ্রান্তে মিঠ্‌ঠুকে পোটলার মত করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। ছোটে সিং ধরে নিল। এদিকে সাত্রী তাগিদ দিচ্ছে— বাবু তাড়াতাড়ি কর, অন্ধকার হয়ে এলো।'

আমার নামতে আর তখন বিলম্ব হলো না। এইভাবে 'মিঠ্‌ঠু'র উদ্ধারকার্য্য সমাপন হওয়াতে শুধু আমি-ই নয়, ক্যাম্পের সকলেই খুব আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

তোতাকাহিনীর সমাপ্তি-পর্ব্বটাও এখানেই টেনে রাখি। সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে-ও তাই হলো। তারপর একদিন—

"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী, উড়ে গেল, আর এলো না।"

কার পিঞ্জর-বন্ধন ছিন্ন করে একদিন এখানে এসেছিল। বছর খানেক থেকে হয়ত আবার কার স্নেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হতে গিয়েছে। নিজের মুক্ত স্বাধীন জীবনের আস্বাদ ভুলে গিয়ে পরাধীনতার আরামকে-ই হয়ত সে বেছে নিয়েছে।

অনেকেই খরগোস পুষতেন, সে কথা বলেছি। এই 'ধবধবে বর্ণ, তুলতুলে গা' টক্‌টকে লাল চোখ, শশকের ছা'-কে পুষতে গিয়ে একবার যে একজন যম-দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলেন, সে কাহিনীটা বলছি।

নামটা আজ আর মনে করতে পারছি না। থাকতেন আমাদের ক্যাম্পের-ই চার-নম্বর ঘরে। একদিন বিকালে তার পোষা শশক-ছানাটিকে ঘাস খাওয়াবার জন্য খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এলেন। তাদের ঘরের সামনেই ব্যাডমিন্টন কোর্ট। তার পাশে বর্ষার জল নিকাশের জন্য একটি সরু নালা ছিল। নালাটির একটা অংশে এক টুকরো মোটা পাইপ পেতে তার উপর মাটি ফেলে চলাচলের পথ তৈরী করা হয়েছিল। এই নালা সংলগ্ন স্থানটি সতেজ দুবাঘাসে পরিপূর্ণ ছিল। খরগোসটাকে সেইখানে ছেড়ে তিনি নিকটেই বসে রইলেন। ঘাস খেতে খেতে খরগোসের বাচ্চাটা পাইপের মুখে গিয়ে হাজির হয়েছে। ভিতরে যাতে ঢুকে না পড়ে, সেইজন্য তিনি পিছন থেকে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাত দিয়ে ধরেছেন। ব্যস্। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি তীক্ষ্ণ দাঁত তাঁর হাতের আঙ্গুলে ঢুকে গেল। ভাল করে কিছু বুঝতে না বুঝতেই দেখলেন, পাইপটির অন্য মুখ দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে একটি সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। যাঁরা ব্যাড্‌মিন্টন খেলছিলেন, তাঁরা ছুটে এসে সব দেখে শুনে, গোটা দুই শক্ত বাঁধন দিলেন হাতে। হাসপাতালে খবর দিতেই তাঁকে ক্যাম্প থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা ক্ষত স্থানটি চিরে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে মামুলি চিকিৎসা করে কয়েকদিন হাসপাতালে অব্‌জারভেশনে রেখে দিলেন।

এদিকে পরদিন সকালবেলা ঐ রুমেরই আরেকজন ডেটিনিউ (তাঁর নামটাও আজ আর মনে নেই) ব্যাড্‌মিন্টন কোর্টের কাছে পায়চারি করতে করতে আগের দিনের ঘটনার কথা মনে মনে ভাবছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, ড্রেনের পাইপটার ভিতর খুঁচিয়ে দেখলে কেমন হয়। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। ব্যাড্‌মিন্টনের জাল-

বাঁধার বাঁশের পোলটি তুলে নিয়ে পাইপের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুখ দিয়ে একটি সাপ বেরিয়ে তীর বেগে ছুট দিল। চোখ বুঁজে তিনি বংশদণ্ড দিয়ে সাপ-টাকে লক্ষ্য করে আঘাত হানলেন। ভাগ্য ভাল, বাঁশের ঘা গিয়ে পড়লো সাপের পিঠে। সর্পরাজের গতি রুদ্ধ হল। পরে কয়েকজনে মিলে সাপটাকে পিটিয়ে মার-লেন। দেখা গেল, অতি বিষাক্ত জাতীয় সাপ। মাথার ফণার উপর জোড়া পায়ের চিহ্নের মত দাগ রয়েছে।

দিন আট দশ পর আর বিষ নেই বলে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকে ক্যাম্পে ফেরৎ পাঠান হলো। এরূপ একটি বিষাক্ত সর্পের দংশন থেকে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য ডাক্তাররা কর্তৃপক্ষের নিকট খুব বাহবা পেলেন। আমাদের অর্থাৎ ক্যাম্পের ডেটিনিউদের ধারণা হলো কিন্তু অন্যপ্রকার।

সাপটির লক্ষ্য ছিল খরগোস ছানাটি। সে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল ছানাটির জন্য। যেই না পাইপের মুখে ছানাটিকে পেয়েছে, সাপটা তাকে গিলবার জন্য কামড় দিয়েছে। কিন্তু সে-মুহূর্তে ডেটিনিউবাবুর হাত গিয়ে পড়েছিল ছানাটির গায়ে এবং সাপের কামড়টা তার হাতের উপর দিয়েই গিয়েছে। পাইপের ভিতর থেকে সাপটা মাথা উঁচু করে বিষ ঢালবার সুযোগ-ই পায়নি। সে উদ্দেশ্য-ও হয়ত, তার ছিল না। তাই, মামুলি চিকিৎসায় বিষহীন দংশনের ক্ষত নিরাময় হতে মোটেই সময় লাগে নি। কিন্তু টুর্নিকেট বন্ধনের জের থেকে তাঁর হাত ভাল হতে প্রায় মাসখানেক সময় লেগেছিল।

অন্য ক্যাম্পের খবর জানিনা, আমাদের পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে কিন্তু এই জাতীয় বিষধর সাপ আরো দুইটি মারা হয়েছিল। এই চার নম্বর ঘরেই একজন 'ইনসোম্‌নিয়ার' রোগী থাকতেন। একদিন রাত্রে তিনি প্রতিদিনের মত শুয়ে শুয়ে নিদ্রাদেবীর বৃথা আরাধনা করছেন, এমন সময় একটা খস্‌ খস্‌ শব্দ তাঁর কানে বাজতে লাগলো। ইঁদুরে কাগজ বা অন্য কিছু টানাটানি করছে ভেবে তিনি 'ডিম্‌' করে জ্বালিয়ে রাখা হ্যারিকেন-টাকে* বাড়িয়ে দিয়ে ইঁদুর খুঁজতে লাগলেন। একটা বাক্সের পিছনে দেখতে পেলেন—ইঁদুর নয়, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছেন এক সর্প-মহারাজ। ঘরের অন্যদের ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো। সাপটিকে পরপারে পাঠাতে-ও আর বিলম্ব হলো না।

---

* রাত ১১টায় মেন গেটে অবস্থিত ইলেকট্রিক লাইনের সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হতো। পরিবর্তে প্রতি ঘরে একটা করে জলন্ত হ্যারিকেন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে ডিউটি-রত সেন্ট্রিকে ডেকে বললে ইলেকট্রিক বাতিও জ্বালিয়ে দিত।

তৃতীয় সাপটিকে মারা হয়েছিল আমাদের-ই ব্যারাকের পাঁচ নম্বর ঘরে। এক-দিন সকাল বেলা ঐ ঘরের বাসিন্দা ফণী দত্ত এবং কালীপদ মুখার্জি (উভয়েই মাদারী-পুরের) দেখলেন, একটি সাপ একজনের খাটের উপর উঠবার চেষ্টা করছে। খাটে যিনি থাকেন, তিনি তখন সেখানে ছিলেন না, বিছানা খালি ছিল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে ঝাড়ুদারের ঝাঁটা দিয়ে একজন সাপটাকে চেপে ধরলেন, অন্যজন একটি লাঠি সংগ্রহ করে এনে সাপটির ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

বাংলাদেশে অপরিচিত একটি প্রাণীর দেখা পেয়েছিলাম, দেউলিতে। নীলগাই। আমাদের খেলার মাঠের চৌহদ্দীব বাইরে, কাঁটাতার ও দরমার বেড়ার ওপাশ দিয়ে একটা প্রাণী ছুটাছুটি করতো। বেড়ার সামান্য ফাঁক দিয়ে এই অচেনা প্রাণীটি কারো কাবো নজরে পড়ে। সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ওটা নীলগাই। নীলগাই নামের সঙ্গে অনেকের পবিচয় ছিল, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয়টা এ পর্য্যন্ত কারো বড় হয় নাই। তাই বেডা ফাঁক কবে ওকে দেখবার একটা হিড়িক পডে গেল। কিন্তু দেখা গেল, ও'ব রং-ও নীল নয়, কিম্বা গরুর সঙ্গে-ও কোন সাদৃশ্য নেই। হরিণের সঙ্গে বরং সাদৃশ্য আছে বলা চলে। উচ্চতায় বেশ বড, একটা বাছুরের মত। ওদের শিং থাকে কিনা জানি না। আমরা যেটাকে দেখেছিলাম, তার শিং ছিল না। নীল-গাইকে বিস্কুট ও আপেল খাওয়াবার ধুম পডে গেল। অনেকেই পকেটে করে বিস্কুট নিয়ে আসতেন, বেডা ফাঁক করে ওর মুখে তুলে দেওয়া হতো। প্রাণীটা-ও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। মাঠেব দরজা খুলতেই সে বেড়ার পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে চলতো, যেখানে দু'টো আঙ্গুল বেরিয়ে বিস্কুট বা ফল ধরে আছে, দেখতে পেত, সেখানে একটু থেমে আনন্দে সেগুলি মুখ বাড়িয়ে আহরণ করতো।

আরেকটা প্রাণী দেখেছিলাম। সেটাও আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ আছে বলে জানি না। একদিন বিকেলবেলা ঘরের বাইরে বসে কয়েকজন মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম, শম্ভু কি একটা জিনিস তার হাতের চেটোর উপর রয়েছে দেখালো। বললে—"বাবু, এই জানোয়ার কখন-ও দেখেছেন?"

এটা আবার জানোয়ার নাকি! তার হাতে ত বলের মত গোলাকার একটা জিনিষ দেখছি। গায়ে যেন কতকগুলি সূচ ফুটানো রয়েছে। একটা কালো কদমফুল বলা চলে। জিজ্ঞাসা করলাম—'এটা আবার কী জানোয়ার?'

"এর নাম 'ঝাউ-চুহা'। এর গায়ে হাত দিলে, কিম্বা এ যদি কোন কারণে ভয় পায়, তা হ'লে এমনি গোল হয়ে পড়ে থাকে, গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া হয়ে যায়। কোন কিছুতে ওকে কামড়াতে পারে না। এমনিতে ছোট্ট একটি জানোয়ার। বেশ

ছুটে চলে।"

জানোয়ারটাকে শম্ভু মাটিতে একপাশে নামিয়ে রাখলো। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তার স্বরূপ দেখতে পেলাম না। সে নিথর ভাবে একটা কাঁটার বল হয়েই পড়ে রইল। একটু নিরিবিলি হলে হয়ত সে তার জড়সড় ভাব ত্যাগ করে স্বাভাবিক ভাবে চলতে শুরু করবে—এই মনে করে আমরা একটু আড়ালে গিয়ে দূর থেকে তার উপর নজর রাখলাম। যা' ভেবেছিলাম, তাই হলো। বলটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। এবং একটি প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে দ্রুতবেগে আমার ফুলবাগানে ঢুকে গেল। প্রাণীটা দেখতে অনেকটা বড় গেছো ইঁদুরের মতো। পিঠের উপর সজারুর ন্যায় কাঁটা। দৌড়ে গিয়ে ধরাতে আবার সে বলে পরিণত হলো। সম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সজারুর বাচ্চা নয়ত?' সে বললো—"না বাবু, এটা বাচ্চা নয়, এরা এর চেয়ে আর বড় হয় না।"

যাক্—ঝাউ চুহাকে আমার বাগানের ভিতরই একটা আশ্রয় স্থল তৈরী করে দিলাম। তিন চার দিন ছিল; পরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাগানে আশ্রয় দিয়েছিলাম আরেকটি প্রাণীকে। 'বটের' নামক একটি ছোট্ট পাখীকে। এরা বোধ হয় তিতির জাতীয় পাখীর পর্য্যায়ে পড়ে। উড়তে বড় পারে না। খুব দ্রুত দৌড়ায়। মাটিতে একটি গুহা মতন তৈরী করে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বাগানের তারের জালের গণ্ডীর বাইরে যাবার উপায় ছিল না। ভিতরেই ছুটাছুটি করে পোকামাকড় ধরে খেত। একদিন কোথা থেকে এক বেজী এসে ওর বাসায় ঢুকে ওকে খেয়ে গেল। বেজীটা বেরিয়ে যাবার বেলায় আমাদের নজরে পড়েছিল।

খানা তল্লাসী

প্রত্যেক ক্যাম্পেই মাসে একবার করে 'সার্চ্চ' হতো। ডেটিনিউদের কারো কাছে কোন 'আপত্তিকর' বই, কাগজপত্র বা অন্য কিছু পাওয়া গেলে তা' বাজেয়াপ্ত করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে সেজন্য সাজা দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল।

এই মাসিক খানাতল্লাসীর সময় আমাদের পরিচারকদের নিকট খুব সাহায্য পেয়েছি। গরমের দিনে দুপুর বেলা ঘরে টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ঘরে

ছোটে সিং-এর কথাই মনে পড়ছে, যে সারাটা দুপুর বসে বসে পাখা টানতো। সিপাই লস্কর নিয়ে আফিসের কর্ম্মচারীরা ঐ সময়ই আসতেন তল্লাসী করতে। আটটি ঘরের জন্য এক একজন অফিসারের অধীনে আট দল সিপাই দ্রুত মার্চ করে একই সঙ্গে ঢুকে পড়তো এবং প্রত্যেকটি দল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলে যেতো।

এ সময়ে আমরা সাধারণতঃ একটু ঘুমাতাম। গেট খোলার শব্দ পেয়েই ছোটে সিং যখন চেয়ে দেখতো যে সিপাইর দল ভিতরে ঢুকছে, অমনি সে আমাদের তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিযে বলতো "বাবু, সব কুছ্ মুঝে দে দেও'। তার পরিস্থিত কয়েদীর জাঙ্গিয়া আমাদের কাগজপত্রে ভরে উঠ্‌তো।

মাসে একবার করে 'সার্চ্চ' হতো বলে, যে ক্যাম্প 'সার্চ্চ' হয়ে গেল, একমাসের জন্য সেই ক্যাম্প নিরাপদ বলে বিবেচিত হতো। তখন অন্যান্য ক্যাম্প থেকে সব 'আপত্তিকর' জিনিস সেই ক্যাম্পে চলে আসতো। বন্ধু-বান্ধবের জিম্মায় সেগুলি রেখে দেওয়া হতো। একবার কিন্তু 'মাসে একবার সার্চ্চ'—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল একমাত্র আমাদের রুমের বেলায়ই। ঘটনাটা বলছি।

সেদিন এই মাসিক সার্চ্চের মুখে আচমকা পড়ে গিয়েছিলাম। সময়টা গ্রীষ্মকাল ছিল না। তাই, টানা পাখা বন্ধ ছিল এবং দুপুরবেলা আমাদের সচেতক ছোটে সিং-এর উপস্থিতি থেকেও বঞ্চিত ছিলাম। 'সার্চ্চ-পার্টির' আগমন টের পেলাম, যখন তারা একেবারে দরজার সামনে উপস্থিত। আমার টেবিলের উপর বেশ কিছু 'আপত্তিকর' কাগজ-পত্র ছিল। সরাবার কোন সুযোগই পেলাম না। যিনি তল্লাসী চালাচ্ছিলেন, তাঁকে নতুন লোক মনে হলো। ক্যাম্পের ভিতর আগে কখনও দেখিনি। অল্প বয়েস, মনে হলো দেউলিতে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন।

টেবিলের উপরকার বইগুলি একনজর দেখে, টাইপ করা একতারা কাগজে হাত দিলেন। খুলেই শিরোনামায় নজর পড়লো—"**What is C.P ?**"

'এটা কী মশায় ?'—তাঁর প্রশ্ন।

বললাম, 'C P. মানে Central Provinces' আমি এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকনমিক্‌স্-এ B. A. (Hons.) পরীক্ষা দিচ্ছি।* ভারতবর্ষের বিভিন্ন

---

* বন্দী-নিবাস থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যেতো। অনেকেই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে Matriculation থেকে M.A. পর্য্যন্ত পাশ করেছেন। সরোজ আচার্য্য দেউলি ক্যাম্প থেকে ইংরেজীতে M A. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর (1st Class) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকরা যে বক্তৃতা দিয়েছেন, এগুলিতে তাই লেখা আছে। পরীক্ষায় সুবিধা হবে বলে বাড়ী থেকে এগুলি সংগ্রহ করে আমাকে পাঠান হয়েছে।'

ব্যস্। আর কিছু বলার প্রয়োজনে হলো না। ভদ্রলোক বাকী কাগজগুলি আর খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। মামুলিভাবে তল্লাসী কার্য্য সমাধা করে চলে গেলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাচলাম। বন্ধুরা যাঁরা দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিলেন—সার্চ্চ-পার্টি চলে যাওয়ার পর হাসিতে ফেটে পড়লেন—'সাবাস্ আপনার উপস্থিত বুদ্ধি, সুধাংশুবাবু।'

আমিও নিজের গাফিলতির হাত থেকে এত সহজে রেহাই পেয়ে গেলাম দেখে আনন্দিত হলাম। গাফিলতি এইজন্য যে, এইভাবে Smuggle করে আনা কাগজপত্র টেবিলের উপর রেখে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। পড়া বা আলোচনা শেষ হলেই এগুলি গুপ্ত স্থানে রেখে দেওয়াটাই নিয়ম। আর এই গুপ্ত স্থান খুব দূরেও নয়। খাটের উপর বাংকেতে আমারই একটি সুটকেশ এ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সুটকেসের তলা এবং পার্শ্বদেশে গোপন কক্ষ তৈরী করা আছে। এই কক্ষগুলির হদিশ পাওয়া খুব সহজ নয়। বহু তল্লাসীর হাত এই সুটকেসটি সফলভাবে অতিক্রম করেছে।

যাই হোক, রাত্রি বেলাতেই টেবিলের কাগজগুলি সুটকেসে যথাস্থানে রেখে দিলাম। কিন্তু স্ক্রু লাগিয়ে এবং সুটকেসের লাইনিং ঠিক করে দিয়ে কক্ষগুলি একেবারে বন্ধ করে দিলাম না। কারণ, আমাদের ক্যাম্পের মাসিক তল্লাসী হয়ে যাওয়াতে আগামী কাল অন্যান্য ক্যাম্প থেকে আরো কাগজপত্র এখানে আসবে। সেগুলিও যথাস্থানে রেখে কক্ষগুলি বন্ধ করবো ভাবলাম।

কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্যপ্রকার। পরদিন সকালবেলা রোলকল হয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, একদল সিপাই একজন অফিসারের নেতৃত্বে যেন গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে! ব্যাপারটা কী, ভাল করে বুঝবার আগেই তারা দ্রুতপদে এসে আমাদের ঘরে ঢুকলো। বাংক থেকে সুটকেস, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি সব চটপট নামিয়ে বারান্দায় এনে একধারে সার করে রেখে দিল। ঘরের ভিতর সার্চ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বারান্দার জিনিসগুলি তল্লাসী শুরু হলো। একটি একটি করে বাক্স বা সুটকেস ভাল করে সার্চ্চ করে অন্যদিকে সরিয়ে রাখা হতে লাগলো। আমার সুটকেসের পালা যখন আসবে, তখন ব্যাপারটা কী হবে ভেবে একটু শঙ্কিত

হলাম। পাশের ঘরে নেপাল নাগ থাকতেন। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও বারান্দায় হাজির হয়েছিলেন, কী কাণ্ড হচ্ছে দেখবার জন্য। তাঁকে পাশে ডেকে নিয়ে আমার সুটকেস্-কাহিনী বললাম। শুনে, তিনি সেখানে পাহরা-রত সিপাইর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। নির্দিষ্ট সুটকেসটি সিপাইকে দেখিয়ে চুপি চুপি বললেন যে, ঐ বাক্সটি যদি সিপাইজী সার্চ্চ হয়ে যাওয়া বাক্সের সারিতে দয়া করে সরিয়ে দেয়, তবে তাকে একটি মূল্যবান ঘড়ি উপহার দেওয়া হবে—বলে নিজের হাতের ঘড়িটি দেখালেন। কিন্তু নেপালী সিপাই রাজী হলো না। আর কিছু করার ছিল না। তল্লাসী শেষ করে সার্চ্চ-পার্টি 'ট্রফি' (trophy) নিয়ে আফিসে চলে গেল। স্পষ্টতই বোঝা গেল, ওদের আগের দিনের ব্যর্থ অভিযান নিয়ে আমরা যে হাসাহাসি করেছিলাম, সে-খবর আফিসে যেতে বিলম্ব হয়নি। তারই ফলস্বরূপ দ্বিতীয় দিনের অভিযান।

পরদিন আফিসে যাওয়ার জন্য নগেন সরকারের তলব এলো। সেখান থেকে তাঁকে আজমীর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সাজাটা নগেন সরকারের উপর দিয়েই গেল। কারণ, সুটকেসটা নগেন সরকারের খাটের উপরে বাংকে ছিল এবং আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি নিজেও কবুল করেছিলেন যে, এটা তাঁর সুটকেস। আজমীর থেকে নগেন সরকারকে দেউলিতে আর ফিরিয়ে আনা হয় নি। বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

* * *

খেলাধূলা

পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি এক নম্বর ক্যাম্পে টেনিস্, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল ও ভলি-বল খেলার ব্যবস্থা ছিল। অন্য ক্যাম্পগুলিতে ফাঁকা জায়গা অনেক কম থাকাতে একমাত্র ব্যাড্-মিন্টন ভিন্ন অন্য কোন আউট-ডোর খেলার ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য পাঁচটি ক্যাম্পেরই সাধারণ খেলার মাঠ খোলা হওয়ার পর থেকে প্রতিটি ক্যাম্পে আলাদাভাবে 'আউট্-ডোর' খেলার প্রয়োজন ও রেওয়াজ একরকম উঠেই গিয়েছিল। এই সাধারণ খেলার মাঠেই ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—তিনটি খেলাই বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হতো।

পাঁচটি ক্যাম্পের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্পোর্টস কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রতি বছরই কমিটি পুনর্গঠিত হতো। এই কমিটিই খেলাধূলা পরিচালনা

করতো এবং আফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে খেলার সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন-মত আদায় করতো।

এক ক্যাম্পের সঙ্গে অন্য ক্যাম্পের বন্ধুত্ব সূচক প্রতিযোগিতা প্রায় লেগেই থাকতো। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পই খেলায় বিশেষ করে ফুটবলে-সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। পাঁচ নম্বরের অধিবাসী সুধীর আইচ ছিলেন ফুটবলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড—এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। ডেটিনিউ হবার পূর্ব্বে তিনি কলকাতার একটি প্রথম ডিভিশন দলের খেলোয়াড ছিলেন বলে শুনেছি। শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেটে-ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

একদিন অন্য একটি ক্যাম্পের সঙ্গে ম্যাচ খেলায় (ফুটবল) পাঁচ নম্বরের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়েরা কিছুতেই বিপক্ষ দলকে গোল দিতে পারছিলেন না। সুধীরবাবু খেলতেন সেন্টার হাফ্-এ (তখনকার ধারা অনুযায়ী)। সুবিধাজনক ভাবে বলের যোগান দেওয়া সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড দলের এই ব্যর্থতা পাঁচ নম্বরের অধিবাসীদের নিরুৎসাহী করে দিচ্ছিল। এদিকে বিপক্ষ দল একটি গোল দিয়ে বসেছে। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকী। জেতা ত' দূরের কথা, গোল শোধ দিয়ে সমতা আনার সম্ভাবনায়-ও যখন সন্দেহ দেখা দিল, তখন সুধীরবাবু নিজের হাফ্-ব্যাকের পজিশন ছেড়ে দিয়ে ফরওয়ার্ডে খেলতে এলেন এবং শেষ হুইসেল পড়ার আগেই দু'টি স্কোর করে পাঁচ নম্বরের বিজয়ীর সম্মান অটুট রাখলেন। সুধীর আইচের উপর সেদিন পাঁচ নম্বরের লোকেরা এত খুশী হয়েছিলেন যে বি. ভি'র নেতা বর্ষীয়ান হেম ঘোষ মহাশয় সুধীরবাবুকে পিঠে তুলে মাঠ থেকে ক্যাম্পে নিয়ে এলেন।

এই খেলার ব্যাপারে 'ক্যাম্প শভিনিজ্‌ম' (camp chavinism)-এর শিকার একবার আমিও হয়েছিলাম। সেবার চার নম্বর ক্যাম্পের দেবেন দে ছিলেন গেম-সেক্রেটারী। ইন্টার ক্যাম্প ফুটবল কম্পিটিশন হবে। স্পোর্টস্ কমিটিতে ঠিক হলো পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে তিনটি টিম করতে হবে এবং ভাল খেলোয়াড়দের তিনটি টিমেই যথাসম্ভব সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। অবশ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অন্যায় ছিল না। কারণ, তা' না হলে অসম প্রতিযোগিতার দরুন অন্য ক্যাম্পগুলির কোন উৎসাহ থাকবে না। তবে পাঁচ নম্বরের বক্তব্য ছিল, তিনটে নয়, দু'টো টিমে তারা খেলোয়াড়দের ভাগ করে দেবে। কিন্তু অধিকাংশের মতে তা অগ্রাহ্য হয়।

স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় একটি ফুটবল কম্পিটিশন উপলক্ষে এক কবিতা লিখে বিপদে পড়েছিলাম। (অন্যত্র এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।) এবার-ও একটি কবিতা লেখার ইচ্ছা হলো। মধ্যমকে বাদ দিয়ে পঞ্চ পাণ্ডবের অন্য চার ভাই পরামর্শ করলেন —মধ্যম ভ্রাতা ভীমকে কী ভাবে জব্দ করা যায়। কারণ, ভীমের প্রতাপে অন্য ভাইয়েরা

১শে মানে হীনপ্রভ হয়ে আছেন। ইন্দ্র-তনয় ('দেবেন্দ্রকুমার' অর্থাৎ দেবেন দে) অর্জুনের পরামর্শে এঁরা একত্রে গিয়ে ভীমকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু যেহেতু ভীম 'হেভিওয়েট' (heavy weight)-এর পর্য্যায়ে পড়েন, এবং এঁরা সব 'লাইট ওয়েট' (light weight) সেইজন্য সমতার খাতিরে ভীমের দেহকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে লড়তে হবে। যুদ্ধে আহ্বান গ্রহণ করাই ক্ষত্রিয়ের রীতি। 'তথাস্তু' বলে ভীম সংগ্রাম শুরু করলেন।

বিষয়-বস্তু এই করে একটি কবিতা লিখে ফণী দত্ত এবং কালীপদ ব্যানার্জির কাছে নিয়ে গেলাম। ওরা উভয়েই আমাদের ব্যারাকে পাঁচ নম্বর ঘরে পাশাপাশি থাকতেন। ফণী দত্ত ছবি আঁকতে পারতেন। কবিতাটি পড়ে উভয়েই উৎসাহিত হলেন। এবং এটি ভাল করে লিখে ছবিসহ অন্যের অগোচরে খেলার মাঠের নোটিশ-বোর্ডে লাগিয়ে দিবার ভার নিলেন।

নোটিশ-বোর্ডে ছবি ও কবিতা আঁটা রয়েছে দেখে পাঁচ ক্যাম্পের লোকের ভিড জমে গেল। পড়ার পর অন্য ক্যাম্পের কয়েকজনকে পরস্পর বলাবলি করতে শোনা গেল,—"পাঁচ নম্বরকে খুব একহাত নিয়েছে রে—"

সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে অমলেন্দু দাশগুপ্ত আমার করমর্দন করে কবিতার শেষ চারটি লাইন মুখস্থ বললেন—

তিনভাগে করি ছেদ আপনার দেহ
আরম্ভিলা রণ ভীম ; যদি চাও কেহ
দেখিবারে এই নব কুরুক্ষেত্র রণ,
সন্ধান করিয়া লহ করিয়া যতন।

কবিতাটি যে আমার লেখা কারো জানবার কথা নয়। তবে, ফণী দত্ত, কালীপদ ব্যানার্জী, অমলেন্দু দাশগুপ্ত সবাই মাদারীপুরের লোক এবং পরস্পরের ঘনিষ্ট। তাই অমলেন্দু বাবুর পক্ষে বেনামী লেখকের সন্ধান পাওয়াটা কিছু কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। কবিতাটি শুরু হয়েছিল পয়ার ছন্দে, এইভাবে—

"বৃকোদরে ছাড়ি অন্য পাণ্ডু পুত্রগণ।
হইলেন সুগভীর মন্ত্রণা-মগন ঃ—"

মাঝের লাইনগুলি আর মনে নেই।

অমায়িক মিষ্টি হাসি ফণী দত্ত সম্বন্ধে আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়লো।

ফণীবাবু একদিন ফুটবল খেলতে নেমেছেন। ভারিক্কি শরীরের দরুণ তিনি কদাচিৎ খেলতে নামতেন। তবে প্রত্যহ ডন, বৈঠক করার অভ্যাস বজায় ছিল। খেলা চলছে, একবার একটা বল এসে ফণীবাবুর সামনে অল্প একটু দূরে পড়লো। অন্য একজন খেলোয়াড় সেটা কিক্ করে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন সময় তাঁর পায়ে এক সশব্দ পদাঘাত, বা গদাঘাত-ও বলা চলে, কারণ ফণীবাবুর 'পা' গদার মতই সুগোল, দৃঢ়। মুখ ফিরিয়ে ফণীবাবুকে দেখে তিনি বললেন "এ কি দাদা, বল নেই, কিছু নেই, আপনি শুধু শুধুই আমাকে মেরে বসলেন।"

অমায়িক হাসি হেসে ফণীবাবু জবাব দিলেন, "আরে চটেন কেন ভাই, বল থাকতেই আমি start নিয়েছিলাম।" অপরজনও হাসলেন। ফণীবাবুর ধীর গতির কথা তিনিও জানতেন।

রবি রায় কালীঘাটের ছেলে। কালীঘাট টিমে তিনি গোল-কিপারে খেলতেন—এ কথা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। কিন্তু ফুটবল খেলায় নামতে তিনি কখনো রাজী হতেন না। বলতেন, 'খেলা ছেড়ে দিয়েছি।" অনেকেরই তাই. ধারণা হলো নিজের কদর বাড়াতে রবিবাবুর এই মিথ্যা আত্ম-প্রচারের প্রয়াস।

একদিন গোলরক্ষকের স্থানে অন্য কোন খেলোয়াড় যোগাড় না হওয়াতে রবিবাবুকে অনেক ব'লে ক'য়ে পাঁচ নম্বরের 'বি' টিমের গোল-কিপার হিসাবে নামানো হলো। তাঁর খেলা দেখে সকলেই অবাক। বিপক্ষদল চার নম্বর বেশ শক্তিশালী ছিল। পাঁচ নম্বরের গোলে তাঁদের মুহুর্মুহু আক্রমণ রবিবাবু অনায়াসে ব্যাহত করে দিচ্ছিলেন। কোন বল লুফে ধরে নিয়ে, কোনটা বারের উপর দিয়ে তুলে দিয়ে, কোনটা বা স্রেফ মুষ্ট্যাঘাতে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে অনবরত গোল বাঁচাচ্ছিলেন। খেলাটা বলতে গেলে পাঁচ নম্বরের গোল-কিপার এবং চার নম্বরের ফরওয়ার্ডদের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল বলা চলে। এমন উপর্য্যুপরি গোলে 'সট' আটকানো দেখে দর্শকেরা বেশ আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তখনকার দিনে গোলকিপারকে চার্জ করার নিয়ম ছিল। সেই আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতেও রবিবাবু অপারগ হননি।

খেলা শেষে সরোজ আচার্য্য—যাঁকে খেলাধূলা বিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহ বলেই সকলের ধারণা ছিল—রবিবাবুকে এসে বললেন, "ফুটবল খেলায় গোলকিপারের একটা ভূমিকা আছে বলে আমি জানতাম না। কাউকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেই হলো বলে ভাবতাম। আজ আপনার খেলা দেখে বুঝলাম, নাঃ। গোলকিপারকেও খেলতে হয়।"

ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রবোধ গুপ্ত এমন

এমন বিশিষ্ট কিছু খেলোয়াড় ছিলেন না। একদিন একটি ম্যাচে তিনি ফিল্ডিং করছিলেন। একটা বল বেশ জোরে তাঁর মাথার উপর দিয়ে শন্‌শন্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রবোধবাবু ডান হাতটি তুলে একটি লাফ দিলেন। বলটি তাঁর হাতের চেটোয় যেন আঠা দিয়ে লাগার মত লেগে রইল। সমস্ত মাঠ জুড়ে দর্শকদের সে কী করতালি। একদিনেই প্রবোধবাবুর নাম হয়ে গেল।

ক্রিকেট-খেলার কথায় একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। দুপুর বেলা ; দুটো আড়াইটে হবে। ঘরের বাইরে কোন জনপ্রাণী নেই। সকলেই নিজ নিজ শয্যায় নিদ্রিত, বা শায়িত অবস্থায় পুস্তকাদি পাঠে রত। আমিও শুয়ে শুয়ে কোন একটা বই পড়ছিলাম। এমন সময় রেবতী বর্মন এসে হাজির। বললেন, "চলুন না, একটু ক্রিকেট খেলা প্র্যাকটিস্‌ করে আসি।" বেশ অবাক হলাম। রেবতীবাবু, যাকে কোনদিন কোন খেলাধূলার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি, যাঁর অবসর-বিনোদন-ও ঘটে থাকে পড়াশোনা দ্বারাই, তাঁর হঠাৎ এ শখ হলো কেন? এবং এই অসময়ে? যাক্‌—কোন প্রকার আপত্তি তুলে তাঁর এই আকস্মিক উৎসাহকে দমিয়ে না দিয়ে, তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

এক নম্বর ব্যারাকের পাশে ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য নেট পোতা ছিল। অন্যান্য সরঞ্জাম-ও কাছেই থাকতো। ঠিক হলো পর্য্যায়ক্রমে উভয়েই এক 'ওভার' করে বল ও এক ওভার 'ব্যাট' করবো। প্রথম বল করবার পালা আমার। রেবতীবাবু দৈবক্রমে বার দুই ব্যাটকে বলের সংস্পর্শে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যাট সঞ্চালন বল চলে যাওয়ার পর ঘটতো। আমার যখন ব্যাট করবার পালা এলো আমি কিন্তু একটিবার-ও ব্যাটকে বলের সংস্পর্শে আনতে পারলাম না। কারণ, রেবতীবাবুর বল একবারও 'নেট'-এর ভিতরে ঢোকেনি। ওভার শেষে স্নিগ্ধ হাসি হেসে রেবতীবাবু বললেন, "চলুন, আর খেলে কাজ নেই।"

সুধীর আইচের নাম করেছি। ভাল খেলোয়াড় হিসাবে আর যাঁরা নাম করেছিলেন অথবা যাঁরা নিয়মিত খেলতেন, তাঁদের ভিতর ছিলেন—যোগেশ চক্রবর্ত্তী, সুধীর দত্ত, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (ট্যানা), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, জ্ঞান চ্যাটার্জি, নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমথ চক্রবর্ত্তী, শৈলেশ চ্যাটার্জি, সুবোধ মুখার্জি, শৈলেন দাশগুপ্ত (হকি), কোহিনুর ঘোষ, কালু ব্যানার্জি (ক্রিকেট), বীরেন ভট্টাচার্য্য। আরো অনেকে নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু, তাঁদের নাম আজ আর স্মরণ করতে পারছি না। কারো কারো চেহারা মনে ভাসছে, কিন্তু নাম স্মরণ হচ্ছে না। অনিল রায় দু'একদিন হকি খেলায় নেমেছেন। এক সময়ে এই খেলা যে খেলতেন, তার পরিচয় তাঁর খেলা দেখে পাওয়া যেত।

টেনিসে অমূল্য মুখার্জি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর সার্ভিস্ ফেরান দুঃসাধ্য ছিল। অমূল্য অধিকারী ও সুধাংশু অধিকারীর জুটি 'অধিকারী ব্রাদার্স' নামে পরিচিত ছিল। শৈলেন দাশগুপ্ত ও ট্যানা চ্যাটার্জির জুটির বিরুদ্ধে অধিকারী ব্রাদার্সের একটি ম্যাচ দর্শনীয় হয়েছিল। অন্য সব খেলায়-ও আমি অংশগ্রহণ করতাম। তবে নিয়মিত নয়, বা কোনোটাতেই দক্ষতা ছিল না। **'Jack of all trades'**—আর কি।

'ইনডোর গেমসের' ভিতর তাস, ক্যারম, মাজং খেলা হতো। মাজং যাঁরা খেলতেন, তাঁরা খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে এতে মত্ত হয়ে থাকতেন। আমাদের ঘরের ট্যানাবাবু এই মাজং প্রেমিকদের অন্যতম ছিলেন।

ভবানীপুরের বিভূতি ব্যানার্জির ছোটখাট রোগাটে ছিপ্‌ছিপে দেহ। কিন্তু ক্যারম খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। 'সেঞ্চুরি' করাটা তাঁর পক্ষে কোন একটা ব্যাপার ছিল না। এক নম্বর ক্যাম্পে থাকাকালীন বড় ব্যারাকটির বারান্দায় বসে একদিন চারজনে মিলে ক্যারম খেলছি। কয়েকজন পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমি একবার মন্তব্য করলাম, 'বিভূতিবাবু কেমন অনায়াসে যে সেঞ্চুরী করে বসেন, আশ্চর্য্য।' পিছন থেকে একজন (সুধীর আইচ বা শচীশ সরকার এই দুইজনের মধ্যে একজন) বলে উঠলেন, "আপনি সেঞ্চুরী করতে চান? তবে আমি যেখানে বলে দেব, ঠিক সেই জায়গায় স্ট্রাইকার মারতে হবে। তাঁর কথামত স্ট্রাইক করতে লাগলাম, একের পর এক ঘুঁটি পকেটে যেতে লাগলো। কোন কোন সময় দুটি একসঙ্গে, দু'একবার তাঁর নির্দ্দেশে আমি প্রশ্ন তুলেছি, "এখানে মারলে কী করে ঘুঁটি পকেটে যাবে?" তিনি শুধু বলেছেন, "মেরেই দেখুন না।"

তাঁর নির্দ্দেশমত খেলে একে একে লাল সমেত একটি ভিন্ন সমস্ত ঘুঁটি পকেটে তুলেছি। সবাই আমার আঙ্গুলের তাকের প্রশংসা করছেন। একটু-ও এদিক ওদিক না গিয়ে স্ট্রাইকার ঠিকমত জায়গাটিতে গিয়ে আঘাত করছে। শেষ ঘুঁটিটা এখন বাকী। সেটা সোজা পকেটের দিকে মুখ করে আছে।

"এবার এ'টা ফেলে দিন"—নির্দ্দেশকারী আমায় বললেন। সহজ কাজ। স্ট্রাইকার মারলাম। কিন্তু ঘুঁটিতেত লাগলোই না, বরং স্ট্রাইকার চলে গেল পকেটে। সবাই 'হৈ-হৈ' করে উঠলেন। আমি-ও নিজের কেরামতিতে আনন্দ পেলাম।

আমার মত লোকের জীবনে খেলাধূলার সুযোগ আসে বন্দী অবস্থাতেই। আগের বার (১৯২৪-২৮) ভিলেজ ইনটার্নমেন্টের সময় কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু তাস খেলা শিখিয়েছিলেন। সে হলো 'টুয়েন্টি-নাইন' এবং 'ব্রে'। 'ব্রে' খেলায় আমি প্রায়ই

সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে অন্যদের আনন্দ দিতাম।

এবার প্রেসিডেন্সি জেলে কীভাবে বীরেন দাশগুপ্তের 'কন্ট্রাক্ট-ব্রিজ' খেলা শিখেছিলাম, তা' পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। বক্সা গিয়ে এই খেলাটা বজায় ছিল। কম্পি-টিশনে খেলতাম, খাঁ-সাহেবের পার্টনার হয়ে। দেউলিতে তাস খেলায় যোগ দিতাম না। তবে কম্পিটিশনে দু'একবার যোগ দিয়েছি। সে-সময় হরিনারায়ণ চন্দ্র থাকতেন আমার পার্টনার। হরিবাবু বার্ম্মার জেলে কারাদণ্ড খেটে ১৯৩৫-৩৬-এ ডেটিনিউ হয়ে দেউলিতে এসেছিলেন।

* * * *

নৈসর্গিক ঘটনা

দেউলিতে দুইটী নৈসর্গিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, যা' এ পর্য্যন্ত আর কোথাও দেখবার সুযোগ হয়নি। একটি হলো আঁধি। সেদিন রোজকার মত বিকালে ডেটিনিউরা প্রায় সকলেই ফুটবল মাঠে সমবেত হয়েছেন। কেউ খেলায় ব্যস্ত; কেউ দর্শক। কেউ বা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুযায়ী পদচারণা করে মাঠ পরিক্রমায় রত আছেন। অন্য কেউ বন্ধু-বান্ধবসহ একসঙ্গে বসে গল্পগুজবে মত্ত। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে এলো। বোধ হয় সেন্ট্রিরাই চেঁচিয়ে বললো, "বাবু, আঁধি আসছে; শীগগীর ক্যাম্পে ফিরে যাও।"

বলতে না বলতেই প্রবল বাতাস বয়ে এলো তীক্ষ্ণ বালিকণার বর্ষণ নিয়ে। মুহূর্ত্তে চারদিক কেমন এক ধূসর বর্ণ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। বাতাসের বেগ এত প্রবল হলো যে, এক পা' এগোয় কার সাধ্য। চোখ খোলার উপায় নেই, বুলেটের ন্যায় বালিকণা গিয়ে বিঁধবে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছেন। অনেকেই পারেন নি। তাঁরা উপুড় হয়ে মাঠে পড়ে রইলেন। শরীরের উপর দিয়ে তীব্র বেগে বালির ঝড় বয়ে যেতে লাগলো।

আমি নিজে মাঠের গেট পার হয়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিলাম। আমাদের ব্যারাক আর মাত্র ২০/২৫ গজ দূরে। কিন্তু আর এগোন অসম্ভব মনে হলো। হাওয়ায় হয়ত উড়িয়ে নিয়ে কাঁটা তারের বেড়ায় ফেলে দেবে। হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলাম। শরীরের অনাবৃত স্থানগুলিতে সূঁচের মত বালিকণা বিঁধতে

লাগলো। দশ পনের মিনিট এম্‌নি কাটবার পর বাতাসের বেগ একটু কমেছে মনে হলো। ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত অবস্থায় কোন প্রকারে ঘরে গেলাম। আঁধি আসার শুরুতেই পরিচারকেরা দরজা, জানালা, স্কাই-লাইট সব বন্ধ করে দিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও টেবিল, চেয়ার, বিছানা, ঘরের মেঝে—সব কিছু প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু বালির আস্তরণে ঢেকে গিয়েছিল। ঝড় শেষ হওয়ার পর সব ঝেড়ে ঝুড়ে স্নানাদি সেরে পরিষ্কার হতে প্রায় ন'টা বেজে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটির কী নাম দিব জানি না। বিজ্ঞানীদের নিকট এর নিশ্চয়ই একটা নাম আছে। 'অরোরা বরোলিস্' কে (**Aurora Boreaulis**) বাংলায় 'মেরু জ্যোতি' বলা হয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সেই অনুযায়ী 'মরু জ্যোতি' বলতে পারি।

ডাইনিং হল থেকে খেয়ে দেয়ে ব্যারাকের দিকে ফিরছিলাম। রাত দশটার মত হবে। বোধ হয় পূর্ণিমা রাত্রি ছিল। বেশ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত। বিজলী বাতির আলোকে ক্যাম্প আলোকিত থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রালোকের সে-সৌন্দর্য্য চোখকে এড়ায় নি।

আমরা কয়েকজন একসঙ্গে গল্প-গুজব করতে করতে আসছিলাম। দুটো ব্যারা-কের মাঝখানে খোলা জায়গাটায় এসে পৌঁছেছি এমন সময় হঠাৎ একজন বলে উঠলেন, "দেখুন, দেখুন, আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।"

সকলের চোখ একসঙ্গে ঊর্দ্ধমুখী হলো। মরি, মরি! কী চমৎকার দৃশ্য। আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত আলোর তরঙ্গ নেচে চলেছে। একটি তরঙ্গের পিছনে আরেকটি—এমনি অসংখ্য তরঙ্গ লহরীতে আকাশ পরিব্যাপ্ত। রামধনুর মত রঙের ছটা নেই এই তরঙ্গ-রাজিতে। শুধু শুভ্র, স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতি। চোখ জুড়িয়ে গেল। যতক্ষণ সম্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পরে ব্যারাকের ভিতর ফিরতে হলো। গেটে তালা লাগাবার সময় হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কমই আছে। তবু এই নৈসর্গিক ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে আত্ম-তুষ্টির চেষ্টা করলাম। মরুভূমির বালুকণায় সেদিন আকাশের বায়ু-স্তর যে কোন কারণেই হোক, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী মাত্রায় পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল আলো সেই বালুকাস্তরে প্রতিফলিত হয়ে এই স্নিগ্ধ জ্যোতির মায়াময় রূপ সৃষ্টি করেছিল। সাড়ে পাঁচ বছরের দেউলি প্রবাসে এই জাতীয় নৈসর্গিক ঘটনা একবারই মাত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

* * * *

দেউলি ঃ কম্যুনিষ্ট কন্‌সোলিডেশন

দেউলি বন্দীনিবাসে একটিমাত্র ক্যাম্প যখন ছিল, তখন সংখ্যায় আমরা গুটি কয়েক কম্যুনিস্ট ছিলাম। ক্রমে অন্য চারটি ক্যাম্প খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। দুই নম্বর ক্যাম্পে এলেন নীরদ চক্রবর্ত্তী, কালী সেন, প্রমথ ভৌমিক, বিজয় মোদক। কালী সেন অবশ্য বেশীদিন দেউলিতে ছিলেন না। তাঁকে বাংলা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে ভিলেজ ইনটার্ণমেন্টে পাঠান হয়। মেছুয়া বাজার বোমার মামলার সাজা শেষ করে নিরঞ্জন সেন আসেন অনেক পরের দিকে দেউলিতে ডেটিনিউ হয়ে। তিনি এসে সরাসরি আমাদের দলে ভিড়ে যান। দুই নম্বর ক্যাম্পে মার্কসবাদে বিশ্বাসী আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের ভিতর প্রমথ চক্রবর্ত্তী ও কালিদাস বোসের কথা মনে পড়ছে।

ভবানী সেন ও পাঁচু ভাদুড়ী দেউলিতে এসেছিলেন নিরঞ্জন সেন আসার আগেই। তাঁরা স্থান পেয়েছিলেন তিন নম্বর ক্যাম্পে। আর নগেন সরকার এসে উঠলেন পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে। পূর্ব্ব থেকেই কম্যুনিষ্ট আদর্শাবলম্বী এঁদের ছাড়া ক্যাম্পের ভিতরও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন তাদের পূর্ব্বতন বিপ্লবী দলের বন্ধন কাটিয়ে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। রেবতী বর্মন, নেপাল নাগের কথা আগেই বলেছি। কালী ঘোষ থাকতেন দুই নম্বর ক্যাম্পে নীরদবাবুর সঙ্গে একই ঘরে। তিনি দেউলি এসে মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেন, অথবা পূর্ব্ব থেকেই এই মতাবলম্বী ছিলেন, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে তাকে বরাবরই আমাদের সঙ্গে পেয়েছি। চন্দননগরের তিনকড়ি মুখার্জির নাম-ও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কুঞ্জ বসু, মৃত্যুঞ্জয় সরকার, নলিনীপতি ব্যানার্জি, প্রমোদ দাশ-গুপ্ত, শচী গাঙ্গুলী, কুঞ্জ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়—এঁদের কথা মনে পড়ছে—যাঁরা কেহ আগে, কেহ পরে, বিভিন্ন সময়ে নিজেদের দলের সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্যাম্পের ভিতরই নিজেদিগকে কম্যুনিষ্ট বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। আর মনে পড়ছে বিনয় সেন (চট্টগ্রাম), কালু ব্যানার্জি (বরিশাল), সুনীতল রায়চৌধুরীর কথা। এঁরা হিজলি থেকে এসে সোজা আমাদের সঙ্গেই ভিড়ে পড়েন। এঁদের কেউ কেউ হিজলির কমরেডদের কাছ থেকে আমাদের কাছে পরিচয় পত্র-ও এনেছিলেন। হাওড়ার বীরেন ব্যানার্জি, জীবন মাইতি, গণেশ মিত্র এঁরাও আগাগোড়া আমাদের সহযোগী ছিলেন। বরিশালের রাখাল দাস ও তাঁর গ্রুপ এবং শৈলেন দাশগুপ্ত—বক্সা থেকেই আমাদের

সান্নিধ্যে ছিলেন। রাখালবাবুর গ্রুপের মহেন্দ্র দাসকে বিশেষ করে মনে পড়ে। তাঁর থাকবার 'সিট্' আমাদের ঘরে না হলেও পড়াশুনা ইত্যাদি উ লক্ষে অধিকাংশ সময়ই কাটাতেন আমাদের ঘরে এবং এইভাবে আমাদের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলে-ছিলেন। বেচারী একদিন হকি খেলায় মুখে আঘাত পেয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরিত হন চিকিৎসার জন্য। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপরে যাঁদের নাম করেছি, তারা ছাড়া আরো বেশ কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন, যাঁদের কথা আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে এ কথা সত্য যে, প্রথম চার বছরের ভিতর অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট কনসোলিডেশন গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই দেউলি ক্যাম্পে কম্যুনিষ্ট বলে পরিচিতদের সংখ্যা নেহাৎ নগন্য ছিল না।

দেউলিতে এই সময় বিভিন্ন বিপ্লবীদলের যুবকদের ভিতর মার্ক্সবাদ অধ্যয়নের এক হিড়িক পড়ে যায়। পুরাতন পদ্ধতির অসারতা উপলব্ধি করেই বোধ হয়, এই যুবকেরা নতুন পথের সন্ধান করছিলেন। এ দের সঙ্গে স্বভাবতঃই আমাদের সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হচ্ছিল। এঁদের ভিতর যাঁরা তাঁদের দলের বন্ধন ছিন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের আমরা নিজেদের ভিতর টেনে নিতাম। কিন্তু, আমাদের কিছু কিছু বন্ধু আমাদের এই কর্ম-পন্থার বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য বন্দীশালার ভিতর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে লোক সংগ্রহের অধিকার কারো নেই। এক সময়ে আমাদের ভিতরকার এই মতবিরোধ বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

যাই হোক, এ সমস্ত খবরই আমরা বাইরে গুপ্তভাবে পার্টির কাছে পাঠাতাম। বাইরে তখন নিষিদ্ধ কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলা শাখাকে যে-কয়জন জীইয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের নাম আজ আর বলতে পারবো না। তবে গোপন পথে তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সর্ব্বদাই রক্ষিত ছিল। সর্ব্ব-ভারতীয় পার্টির গোপন ইস্তাহারাদি-ও আমরা দেউলি ক্যাম্পে পেতাম।

বাইরের পার্টির নির্দেশানুসারেই শেষে 'কম্যুনিষ্ট কন্‌সোলিডেশন' নামে সংগঠন গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে এই সংগঠন গঠিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলগুলির ভিতর থেকে যাঁরা মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুধাবনে আগ্রহী, তাঁদের সকলকেই নিয়ে একটি অকঠোর (loose) প্রকাশ্য দল গঠনই ছিল এই 'কম্যুনিষ্ট কন্‌সোলিডেশন' স্থাপনের উদ্দেশ্য। এই সংগঠনের প্রধান কাজ নির্দ্ধারিত হলো—মার্ক্সীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা। মার্ক্সবাদের অনুশীলন ও প্রচারার্থে হাতে লেখা পত্রিকা বের করা। একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনার ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে বাইরে গিয়ে প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে

কাজ করার জন্য নিজেদিগকে প্রস্তুত করা।

এই সময়েই (১৯৩৬) ধরণী গোস্বামী মীরাট মামলার সাজা ভোগ করে রাজবন্দী-রূপে দেউলিতে আসেন। তাঁর আগমনে কন্‌সোলিডেশন খুব জোরদার হয়ে উঠ্‌লো। মীরাট মামলায় একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামী, এদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই যিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ছেড়ে ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর কাজে নেমেছিলেন—এমন একজন লোকের একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্ত্তি থাকা মার্ক্সবাদী পথে নবাগতদের নিকট খুবই স্বাভাবিক।

এক নম্বর ক্যাম্পে কুমিল্লার ললিত বর্মন যে ঘরে থাকতেন (এই ঘরেই পূর্ব্বে আমি, জ্ঞান চক্রবর্ত্তি ও হরিপদ বাগচী থাকতাম) সেই ঘরে একদিন এক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কম্যুনিষ্ট কনসোলিডেশনের পত্তন হলো। বিভিন্ন বিপ্লবীদলের অনেকেই ঐ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে মিশে যেতে যাঁদের দ্বিধা-ভাব ছিল, তাঁদের-ও অনেকে সভায় এসেছিলেন। নয় জনের একটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি নির্ব্বাচিত হলো এবং ধরণী গোস্বামী এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অন্য-দের ভিতর কমিটিতে ভবানী সেন, রেবতী বর্মন ও সুধাংশু অধিকারী ছিলেন।

'কন্‌সোলিডেশনের' কাজকর্ম বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পরিচালিত হতে লাগলো। হাতে লেখা একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী পত্রিকা বের হতো। বাংলা পত্রিকাটি ছিল মাসিক এবং নামটা যতদূর মনে হয়, দেওয়া হয়েছিল, 'সংহতি'। ইংরেজী পত্রিকাটির নাম ছিল 'The Communist'। ওটা বছরে দু'বার বের হতো বেশ বড় কলেবরে এবং সাজসজ্জা সহকারে। সংহতি'র পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছিল কুমিল্লার বীরেন ভটাচার্য্যের উপর আর রেবতী বর্ম্মনকে দেওয়া হয় 'The Communist'-এর দায়িত্ব। কুমিল্লার অখিল নন্দী কন্‌সোলিডেশনের একজন সক্রিয় কর্ম্মী ছিলেন। * বর্দ্ধমানের ফকির রায় যদিও কোন কোন বিষয়ে কন্‌সোলিডেশনের সমালোচক ছিলেন, তবুও মোটামুটি আমাদের সহযোগিতা করতেন। মোটের উপর বলা চলে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৭-এর শেষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ B.C.L.A. Act (1930)-এ বাংলার বন্দীরা যতদিন দেউলিতে আটক ছিলেন) দেউলি ক্যাম্পে 'কম্যুনিষ্ট কন্‌সোলিডেশন' একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিগণিত ছিল।

ঐ সময় দেউলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি

---

* রংপুরের মণিকৃষ্ণ সেন, দিনাজপুরের জ্যোতিষ সেন—এঁরাও কনসোলিডেশনের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং ছাড়া পাওয়ার পর উত্তরবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের সংগঠনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলেন।

গোপন পার্টি-সেল-ও বর্তমান ছিল। ওর সদস্য ছিলেন, ধরণী গোস্বামী, রেবতী বর্মন, ভবানী সেন ও সুধাংশু অধিকারী। আরেকজন ছিলেন কিনা ঠিক মনে হচ্ছে না।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নীরদ চক্রবর্তী কম্যুনিষ্ট কন্‌সোলিডেশন গঠিত হওয়ার আগেই দেউলি থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে কোন গ্রামে অন্তরীণ করা হয়েছিল।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, তিন নম্বর ক্যাম্পে ভবানী সেন ও পাঁচু ভাদুড়ীকে অনুশীলনের লোকেরা মারধোর করেছে। বিকেল বেলা যখন ভিন্ন ক্যাম্পে যাতায়াতের কোন বাধা ছিল না, তখন গিয়ে জানতে পারলাম, অনুশীলনের সুবোধ মুখার্জী তাঁদেরই দলের অন্য একজনের সহায়তায় ওদের দুজনকে ঘুষি ইত্যাদি মেরেছেন। কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ-বশতঃই যে এ কাজ করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ, মারধোর করার পর সুবোধবাবু নাকি তাঁর বন্ধু-বান্ধবের নিকট গর্বভরে বলেছিলেন, "আজ পেচোভস্কি ও ভবানিয়োভস্কিকে একহাত নেওয়া গেল।' আর মারবার সময়ও নাকি পাঁচুবাবু ও ভবানীবাবুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "তোরা এখানে কেন, হোমল্যাণ্ড রাশিয়াতে চলে যা।'

একটু অবাক হ'লাম এই ভেবে যে, অনুশীলন ত' দল হিসাবে কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষী নয়। বরং তাঁদের ধরণ-ধারণ দেখে আমাদের মনে হতো বাইরে গিয়ে কম্যুনিজমের আদর্শ নিয়েই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁরা কাজ করবেন। তাঁদের দলের অমূল্য অধিকারী, যশোদা চক্রবর্তী, দ্বিজেন নন্দী, ত্রিদিব চৌধুরী, মণি লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক উঠ্‌তি নেতাদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল এবং এঁদের সকলকেই কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বলে জানতাম। তবে এ কথাও ঠিক, ব্যক্তিগত হিসাবে দু'একজন যে ঐ দলে অন্ধ-কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষী ছিলেন না, তা' ও নয়।

পাঁচু ভাদুড়ীদের উপর আক্রমণের পিছনে ঐ ব্যক্তিগত কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষই কাজ করেছে বলে মনে করে নিলাম। এই নিয়ে আমরা আর কোন হৈ চৈ না করে নিজেরাও প্রস্তুত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম—ভবিষ্যতে যে-কোন তরফ থেকে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেলে আমরাও যথাযথ ভাবে তা' প্রতিরোধ করবো।

'কন্‌সোলিডেশন' গঠিত হবার পর থেকে প্রতি ক্যাম্পে নিয়মিতভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়নের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে আমরা দুপুর দু'টো আড়াইটে থেকে ক্লাস শুরু করতাম। ডাইনিং হল তখন খালি থাকতো বলে সকলে সেখানেই সমবেত হতাম। একসঙ্গে দশ পনর জন বসে পড়াশোনা এবং আলাপ আলোচনা করার পক্ষে ও'টাই উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল। মেন্ ব্যারাক থেকে একটু

দূরে অবস্থিত হওয়াতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ারও আশঙ্কা ছিল না।

প্রতি ক্যাম্পেই এইভাবে মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন করে যেসব একনিষ্ঠ কর্ম্মী সেখানে তৈরী হয়েছিলেন এবং বাইরে এসে প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়।

পরবর্ত্তীকালে বাংলার কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসারতার পিছনে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য্য।

— ১—

দেউলি : বন্দীশিবিরে পুস্তকাদি দেওয়া সম্বন্ধে সরকারী নীতি

১৯৩০ সালের বেঙ্গল ক্রিমিনেল ল' এমেণ্ডমেন্ট য়্যাক্ট (B. C. L. A. Act.) অনুযায়ী ধৃত রাজবন্দীদের বন্দীশালায় কী ধরণের পুস্তকাদি পড়তে দেওয়া যাবে এবং কোন্ জাতীয় পুস্তক নিষিদ্ধ করা হবে, এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নীতি প্রথম দিকে সরকারেব ছিল বলে মনে হয় না। এ কথা পূর্ব্বেও বলেছি। বাস্তবিক পক্ষে এই আইন তৈরী হয়েছিল প্রধানতঃ বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলগুলিকে দমন করতে। কম্যুনিষ্ট আন্দোলন তখন পর্য্যন্ত সরকারের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হযে উঠেনি। মীরাট মামলার পর মার্ক্সবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের ভিতব কী সম্পর্ক, এব যে একটা তত্ত্বগত দিকও আছে. এসব কথা সরকারের বোধগম্য হতে থাকে এবং সেই অনুযায়ী বন্দীশিবিরে মার্ক্সীয় গ্রন্থেব প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ শুরু করা হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমাব য়্যাবেষ্টেব সময় কয়েকখানা মার্ক্সীয় পুস্তক ধবা পড়ে। এর ভিতর তিনটিব নাম মনে আছে। **Socialism, Utopian & Scientific (Engels) ; Historical Materialism (Bukherin), Cmmunist Menifesto (K. Marx)।** এই বইগুলি কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আটক করেননি। প্রেসিডেন্সী জেল, বক্সা ক্যাম্প এবং বক্সা থেকে দেউলিতে কর্ত্তৃপক্ষেব নজরের ভিতর দিয়েই এগুলি নেওয়া হয়েছে। বক্সাতে আমরা মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল', স্তালিনের 'লেনিনিজ্‌ম্' ইত্যাদি বইও কিনতে পেরেছি। দেউলিতেও প্রথম দিকে অনেক ক্লাসিকেল মার্ক্সীয় সাহিত্য কেনা হয়েছে। লেনিনের **'Iskra Period' ; 'Revolution—1917'**-এর মত বইও আটক করা হয়নি।

কিন্তু, পরবর্ত্তীকালে শুধু মার্ক্সবাদী গ্রন্থই নয়, বামপন্থী রাজনীতির যে কোন পুস্তকের উপরই যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছিল। এই সময় ক্যাম্পে এই জাতীয় বই পড়বার হিড়িক পড়ে গেছে। অনুশীলন ত' বলা চলে, দল হিসাবেই নিজেদের মার্ক্সীয় তত্ত্বে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করছিলেন। যুগান্তরেরও বিভিন্ন গোষ্ঠী এই বিশ্বদর্শন অধ্যয়ন ও অনুধাবণে রত ছিলেন। মাত্র কিছু কিছু বর্ষীয়ান নেতা তাঁদের ঘনিষ্টদের নিয়ে এই হাওয়ার বাইরে ছিলেন।

১৯৩৬ সালে দেউলিতে বই-এর ব্যাপারে এই কড়াকড়ি সম্বন্ধে আমরা প্রথম অবহিত হই। ঐ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একখানা চিঠি দেই। চিঠিতে কী লিখেছিলাম, তা' মনে নেই। তবে চিঠির উত্তর থেকে তা' অনুমান করা যায়। উত্তরটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :

D/B Sudhangsu Adhikari. Camp 5.

Ref : Your chit dt 4 1-36 for purchasing some books.

1) Under order of Supdt. I am to inform you that all books by the authors mentioned in your list are unconditionally withheld, except when Para 2(a) may apply.

2 Books on Socialism, Bolshevism or Communism are allowed only—

(a) if they are prescribed in the syllabus of any recognised University-course and the detenu is a candidate for the exam. for which the book is prescribed

(b) if the author's name is a sufficient guarantee of a balanced treatmeut of the subject in question.

3. Books dealing with workers and the problems of the working class are judged each on their own merit on the principles mentioned in 2(a).

4 Philosophical and socio-authropological works are also dealt with on the lines mentioned above & there is usually no reason for withholding such literature. But the decision as to which is and which is not "innocent material" rests with the Supdt and is a matter solely at his discretion.

Following books are not allowed—others are subject to censor.

1 Condition of British working class.

2. Labour Research.

3. Anti-Duhring.

4. Poverty of Philosophy.

5. Dialectical Materialism

6. Russian Sociology.

(Sd Illegible.

22-1-36.

LIST OF BANNED AUTHORS :—

1 Carmel Haden Guest
2. Montagu Slater
3. T. H. Wintringham
4. Hugh Mc Diarmid.
5. Alec Brown
6. Ralph Fox
7. G. Allen Hutt
8. John Lehmann
9. Edgell Rickwood
10. A. P Rolley
11. Harold Heslop
12. John Strachy

আমার চিঠির উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আফিসেব বিভিন্ন বিভাগের ভিতর যে লেখালেখি হয়েছিল, তার একটা নকল আমার নিকট আজও কিভাবে রয়ে গেছে। পুরোপুরি তা' উদ্ধৃত করে দিলাম। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বন্দীশিবিরের আফিসের কাজের একটা মোটামুটি ধারণা পাঠক এর থেকে করতে পাববেন।

A. S. I. LAHIRI,

On the detenu's letter please make the following signs against the names of all books mentioned.

definitely disallowed.

allowed.

not yet censored and therefore subject to censor on receipt.

Sd, Illegible

10/1.

A. S.

Sir,

Query No. 3 (made by Det) items 'b' & 'c' definitely not allowed.

Query No. 4 (made by Det.) items 2, 3, 4 & 5 are definitely not

allowed to the Det.

Regarding others had not been in before But the books on Communism, Bolshevism & Socialism are not allowed to the Det.

Sd/- A Lahiri,

Dt 13/1/36 Reader "

তারপর আমাকে কী উত্তর দেওয়া হবে, তার একটা খসড়া করে Supdt-এর নিকট পাঠান হলো তাঁর অনুমোদন চেয়ে।

"Supdt.

Is the reply approved ?

Sd/- Illegible"

13/1

"yes.

Sd/- R. A C."

21/1

A A S.

C.O. Please inform the detenu.

Sd/- Illegible

21/1

Reader A. S. I

To keep a copy for future reference.

Sd/- Illegible

A. A S

21/1

সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর অনুমোদন চেয়ে আমাকে উত্তর দেবার যে খসড়াটি তাঁর নিকট পাঠান হয়েছিল, সেটা পূর্ব্বে উদ্ধৃত আমাকে প্রেরিত চিঠিরই অনুরূপ। শুধু একটু বেশী লেখা তাতে ছিল, যা' থেকে আমি কী কী বই-এর তালিকা দিয়েছিলাম, তা' জানা যায়। সেই অংশটুকুর উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

N B —The books with a cross against them are not allowed. The rest are subject to censor on arrival

LIST OF BOOKS :—

1. Soviet Communism—by Sidney Webb.
2. Russian Financial System by Mc Millan
3. Soviet Culture Review
4. Russian Poetry
5, Education in Soviet Russia
6. Conditions of the Working class in England in 1844 —Engels
×7. Condition of British Working Class
×8 Labour Research
9. International Labour Review
10 Marx on Religion
11 Industrial & Labour Information
×12 Anti Duhring—Engels
×13. Poverty of Philosophy Marx
×14. Dialectical Materialism—Levy
×15. Russian Sociology—J. Hecker
16 Marx on Trade Unionism

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, সিড্‌নী ওয়েবের Soviet Communism বইখানা ক্যাম্পে নিষিদ্ধ নয়। তবে বইখানা এলে তা' সেন্‌সর করে দেখা হবে। আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতায় জানা আছে যে, এখানে আফিসে 'সেন্‌সর' করে বই খুব আটকানো হয় না। হ'লেও সুপারিন্টেডেট-এর সঙ্গে দরবার করে তা' পাওয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে।

এই ভরসার উপর নির্ভর করে ২-৩-৩৬ তারিখে Soviet Communism বইখানা কেনবার জন্য আফিসের মাধ্যমে অর্ডার দিলাম। কয়েকদিন পরে আফিস থেকে নিম্নলিখিত উত্তর এলো—

To

Detenu Babu Sudhangsu Adhikari of Camp 5.

Ref: Your chit dt 2-3-36.

I am directed by the supdt to inform you that under order from

Calcutta the book Soviet Communism is not allowed to detenus.

Sd/- illigible

8 / 3 / 36

বোঝা যাচ্ছে, এই সময় কলকাতা থেকে সেন্ট্রাল আই, বি, সরাসরি বন্দী-নিবাসে বই দেওয়ার ব্যাপারে হাত দিচ্ছে। অবশ্য বন্দী-নিবাসে অনেক ব্যবস্থাই কলকাতার আই, বি-র নির্দ্দেশানুযায়ী হতো। কিন্তু, প্রথমদিকে ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। এক নম্বর ক্যাম্পে থাকতে আমরা তা' বুঝতে পেরেছি।

ইংলণ্ডের **Labour Research Department** থেকে **L R. D Monthly circular** নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতো। এ'তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের—সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক—শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা, শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধীয় নানা সমসাময়িক তথ্য পরিসংখ্যানসহ প্রকাশিত হতো। কোন বিদেশী পুস্তক ব্যবসায়ী এই **L R D circular**-এর প্রায় ৭/৮টি বাঁধান **Volume** আমার নামে পাঠিয়ে দেয়। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত **L. R D. circular** এই ভলুমগুলিতে স্থান পেয়েছিল। প্রেরক পুস্তক ব্যবসায়ী চিঠি দিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, বইগুলি পড়ে যদি আমার রাখতে ইচ্ছা হয় তবে যেন নির্দিষ্ট মূল্য পাঠিয়ে দেই; অন্যথায় ফেরৎ পাঠালে, ফেরৎ দেবার ব্যয় তাঁরাই বহন করবেন। বইগুলি আফিস থেকে প্রথমে **censor** না করেই আমাকে দেওয়া হয়, পড়ে দেখবার জন্য। কারণ, আমি যদি কিনতে না চাই, তবে **censor** করার প্রশ্ন উঠে না। আমি যখন বইগুলি কিনবো বলে আফিসকে জানালাম, তখন একখণ্ড আমার নিকট থেকে চেয়ে নেওয়া হলো **Supdt** পড়ে দেখবেন বলে। তিনি অনুমতি দিলেই বইগুলি আমাকে কিনতে দেওয়া হবে।

কয়েকদিন পর আমি এ সম্বন্ধে সুপারকে একখানা চিঠি দেই। ফিনে সাহেব তখন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এবং আমরা এক নম্বর ক্যাম্পে থাকি। চিঠিখানা এবং তৎসহ ফিনে সাহেবের মন্তব্য নিয়ে দেওয়া গেল।

Dear Mr. Finney,

I think you have gone through the book 'L. R. D. monthly circular' (I have received it back:)

Will you please now let me know whether you will allow it and whether I may place order for the same for the year 1932 ?

ফিনের উত্তর :—

"Yes, you may order, but it will be subject to censor here.

Sd,- E. G. F.

16/3

এই উত্তর পেয়ে L. R. D circular-এর যে ভল্যুমগুলি আমাকে পাঠান হয়েছিল, তার দাম পুস্তক প্রেরককে পাঠিয়ে দিলাম এবং ১৯৩২-এর ভল্যুমের জন্য যথারীতি অর্ডার দিলাম। বইখানা আসতে একটু দেরী হয়েছিল। ততদিনে আমরা পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে চলে গিয়েছি এবং ফিনে সাহেবও বদলি হয়ে গেছেন। বইটি আসার পর আটক করা হলো। এই নিয়ে তখন আর কিছু উচ্চবাচ্য করিনি। কারণ, ফিনের সম্মতিসূচক চিঠিখানি হারিয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পর সেটা পাওয়া যাওয়াতে তদানীন্তন সুপারিন্‌টেণ্ডেকে লিখলাম—

To

The Supdt.

Deoli Det. Jail

D/sir,

An interview solicited regarding a book of mine which has been withheld and kept in the office. I got permission for the book in question (L. R. D. for the year 1932) from a former Supdt. but as the document was lost, I could not move in the matter so long. Recently I have found back that written permission for the book and want to show that to you and request you to let me have the book.

Yours,

Sudhangsu Adhikari

Camp 5

2-3-36.

নিম্নোক্ত মন্তব্য নিয়ে চিঠিখানি ফেরৎ এলো—

"This Book 'Labour Research' was sent to the I.B. for disposal."

Sd-Illigble

4-3

এদিকে 'L R. D Monthly Circular' তখন নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায়

উঠে গেছে। যে বইগুলি আমার ছিল, সেগুলিকে 'Current History' নামক একটি আমেরিকান মাসিক পত্রের অঙ্কে ঠাঁই দিয়ে দিলাম।

আমরা যখন কোন বই কেনবার জন্য দেশী বা বিদেশী কোন পুস্তকালয়ে অর্ডার দিতাম, তখন আফিসে মোটামুটিভাবে দেখে দেওয়া হতো, এ'বই আমাদের দেওয়া যেতে পাবে কিনা। যদি নিষিদ্ধ তালিকাব বই হতো, তবে তখনই আমাদেব অর্ডার বাতিল কবে দিযে বিকুইজিশনটি ফিবিযে দেওযা হতো। তা' না হলে "Censored and Passed" এই সিল মেবে অর্ডাবটি যথাস্থানে পাঠিযে দেওয়া হতো। অবশ্য, বই এলে পব 'সেনসব' করে দেখা হবে, এ সর্ত্ত সব সময়ই বজায থাকতো। বলাবাহুল্য, 'Censored and Passed" এই সিলেব তলায় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এব স্বাক্ষর থাকতো।

এই ব্যবস্থা'টাব সুযোগ নিযে আমবা কিছু কিছু নিষিদ্ধ পুস্তকও কেনার ঝুঁকি নিতাম। Censored and Passed সিল দেওয়া কাগজে (এরূপ কাগজেব আমাদের অভাব ছিল না; কাবণ, খাতা, বাইটিং প্যাড, এক্সারসাইজ বুক—সব কিছুতেই ঐ সিল লাগিযে আমাদেব দেওয়া হতো।) লিখে কোন পুস্তকেব দোকানে বই-এব অর্ডার লিখে, চিঠিখানা Smuggle কবে পোষ্ট কবে দেওযা হতো। এ কাজে 'গীসা' নামে একজন সুইপার আমাদেব প্রধান সহায় ছিল। গীসা আমাদেব বহু চিঠি এইভাবে পোষ্ট করেছে এবং সেগুলি যে যথাস্থানে পৌঁছেছে, তা'-ও পবে জানতে পেরেছি।*

যাই হোক, বই এব দোকানে যখন আমাদেব অর্ডাব পৌঁছাত তাদের এমন সন্দেহ কবাব কোন অবকাশই থাকতো না যে, এই চিঠি যথাযথ ভাবে আফিসের মাধ্যমে আসেনি। ভি, পি'তে তাবা বই পাঠাতো। আফিস থেকে ভি,পি, রেখে বই যখন 'সেন্সর' কবা হতো, তখন কোনটা এমনিতেই পাব পেয়ে যেতো, কোনটা বা আটক হতো। এই আটক করা বই-এর জন্য সুপার-এর সঙ্গে দরবার করে কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যেতো।

---

* এই 'সেনসরড্ এণ্ড্ পাস্ড্' সিল দেওয়া কাগজের মাহাত্ম্যে একবার বাইরে থেকে কিছু টাকাও উঠান গিয়েছিল। ঘটনাটা এইরূপ: আমাদের ধীরেন রায় গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে কলকাতা কর্পোরেশনের একটি স্কুলে চাকরী করতেন। ঐ স্কুলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বাবদ তাঁর কিছু টাকা পাওনা ছিল। ধীরেন বাবুকে দিয়ে একখানা ঐ প্রকার সিল দেওয়া কাগজে একটি চিঠি লেখান হলো। চিঠিতে তিনি হেড্মাষ্টারকে অনুরোধ করেছেন তাঁর পাওনা টাকাটা যেন পত্রবাহক ....কে দিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিখানা আমরা গোপন পথে বাইরে পার্টির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। টাকাটা তুলতে পার্টির কোন অসুবিধা হয় নি—একথা পরে জেনেছিলাম।

ফিনে সাহেবের সঙ্গে এইরূপ একটি দরবারের কথা মনে আছে। এইরূপ স্মাগ্‌ল্ করে দেওয়া অর্ডারের কিছু বই আমার আটক হলো। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ফিনের সঙ্গে আফিসে দেখা করলাম। বললাম—'আমরা যখন কোন বই এর অর্ডার দেই, তখন তোমার আফিস থেকেই তা' পাশ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বই এলে পর, সেগুলি যদি আটক করা হয়, তবে আমাদের কতটা ক্ষতি ও অসুবিধা হয়, বুঝতে পার নাকি?"

"কেন, বই এলে 'সেন্সর' করে দোষযুক্ত মনে হলেই দেওয়া হবে, এ নিয়ম ত সবারই জানা"—ফিনের উত্তর।

'হ্যাঁ। নিয়ম সম্বন্ধে আমি কোন আপত্তি তুলছি না। আমাদের আর্থিক ক্ষতির কথাটাই তোমাকে বুঝাতে চাইছি। মাসিক এলাউয়েন্স আমরা এমন কিছু বেশী পাই না। তাই, এর বেশীর ভাগটাই, এমন কি, কোন কোন সময় সবটাই যদি এভাবে কাটা যায়, তবে আমাদের কতটা অসুবিধা হয়, তাই তোমাকে বুঝে দেখতে অনুরোধ করছি। যদি একেবারেই অসম্ভব না হয়, তবে আমার বইগুলি দিলে খুশী হবো।"

"অল রাইট, এ বারের মত দিয়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ ঘটলে, তার কোন কনসিডারেশন করা হবে না।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ।"

বই-গুলি পেয়ে গেলাম। কী কী বই তার নাম মনে করতে পারছি না। অনেক তথাকথিত নিষিদ্ধ বই-ই আমরা জোগাড় করেছিলাম।

ঘটনাটা বিবৃত করলাম এটাই দেখাতে যে, সে সময় ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করবার ক্ষমতা ছিল, যেটা পরে আর দেখতে পাইনি।

এইবার কোপ পড়লো মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল' এর উপর। একদিন শুনলাম কমনরুমের নোটিশ-বোর্ডে আফিস থেকে একটি নোটিশ টানিয়ে দিয়ে গেছে। নোটিশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের কাছে মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল' বই আছে, তাঁরা যেন আফিসে তা' জমা দিয়ে আসেন। নোটিশ-খানা দেখতে গেলাম। কিন্তু নোটিশ-বোর্ড শূন্য। কেউ সেটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আফিসে একখানা স্লিপ্ দিলাম।

To
The Supdt
D/Sir,

I understand that you issued a notice recently regarding the book

'Capital' by K Marx But on the Notice Board I could not find it and peruse it myself. As I am interested in the matter, I request you ro send a copy of the said Notice for my perusal and information

Yours

Camp 5

Sudhangsu Adhikary

20/9/37

অফিস থেকে তখন নোটিশের একটি কপি আমার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নিয়ে এর অনুলিপি দিলাম।

NOTICE NO.—97

Dated. the 17th September, 1937.

In continuation of Notice No. 60 dated 3rd July, 1937 (in which detenus in possession of copies of 'Capital' by Karl Marx and "The Economic Doctrines by K. Marx", were requested to return them to the office as they had been banned) and of Notice No, 63 dated 6th July, 1937 (by which Notice No 60 dated 3rd July, 1937 was held temporarily in abeyance pending receipt of further orders from Government) all detenus in possession of the above mentioned books are hereby informed that the Government of Bengal in response to petitions from detenus appealing against Notice No. 60 has issued orders banning these books forthwith All detenus in possession of these books will therefore return them to this office within 4 days Failure to comply with this order will entail the punishment of all detenus found in possession of these books.

The Government of Bengal has stated that all copies of these books withheld will be returned to the detenu concerned on their release

Sd/- R. J. Craster,

Major

Superintendent,

Deoli Detention Jail.

আমরা অবশ্য আমাদের কোন বই-ই জমা দেই নি এবং সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম।

উপরে উদ্ধৃত নোটিশটির ভাষা লক্ষ্যণীয়। ডেটিনিউরা যখন বাংলো গভর্ণমেন্টের নিকট বই দু'টি নিষিদ্ধ না করতে আবেদন জানালেন, তখন বাংলা গভর্ণমেন্ট সেই আবেদনে (appeal) সাড়া (response) দিলেন কীভাবে? না, তক্‌খুনি (forthwith) বই দু'টিকে নিষিদ্ধ করার আদেশ জারী করে।

'পাগল, নৌকা ডুবাস্ নে রে'—গল্পটা মনে করিয়ে দেয়।

বেশ কয়েকটি বিদেশী সাময়িক পত্রিকার আমরা গ্রাহক ছিলাম। তন্মধ্যে এই গুলির নাম মনে পড়ছে :—

১। মাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ান (ইংলণ্ড, সাপ্তাহিক)
২। কেনার ব্রক্‌ওয়ে সম্পাদিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'র মুখপত্র (নামটা খুব সম্ভবতঃ 'নিউ এজ্'—ইংলণ্ড, সাপ্তাহিক)
৩। লেবার মান্থলি—(ইংলণ্ড, মাসিক)
৪। 'নেশন'—(নিউইয়র্ক—সাপ্তাহিক)
৫। কারেন্ট হিস্ট্রি—(নিউইয়র্ক—মাসিক)
৬। প্যাসিফিক্ এফেয়ার্স (নিউইয়র্ক—মাসিক)
৭। New Statesman & Nation (ইং)
৮। The Transpacific—Japan.

ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং দূর প্রাচ্য থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলি নিয়মিত পড়াতে বিশ্বের সমসাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা খানিকটা ওয়াকেব-হাল থাকতাম। গ্রেট-ব্রিটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'লেবার মান্থলি' অবশ্য প্রায়ই বাজেয়াপ্ত হতো। একবার মনে আছে 'লেবার মান্থলি'-র একখানা প্রবন্ধ-ই শুধু কাঁচি দিয়ে কেটে ভিতরে পাঠান হয়েছিল। বাকী সমস্ত বইখানাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যে প্রবন্ধটি ভিতরে দেওয়া হয়েছিল, সেটা ক্লেমেন্স দত্ত (পাম দত্তের ভাই) লিখিত একখানা দার্শনিক প্রবন্ধ।

অন্য সাময়িক পত্রগুলিতে 'সেন্সর'-এর কাঁচি বড় পড়তো না। যদি-ও সেগুলিতে-ও কম্যুনিজম এবং সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি প্রায়ই বেরোত। নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক 'নেশন' পত্রিকায় লুই ফিশার নামক প্রসিদ্ধ লেখকের মস্কো থেকে প্রেরিত সংবাদ ও প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। কিরভের হত্যা এবং

আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনার উপর ফিশারের লেখা আমরা বেশ মনো-যোগ সহকারে পড়তাম।

'প্যাসিফিক্ এফেয়ার্স'-এ* একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। লেখক তদানীন্তন চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন উচ্চ-স্তরের নেতা। নামটা যতদূর মনে হয়, হো লুঙ। তিনি মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সংঘটিত চীনের কম্যুনিষ্টদের ঐতিহাসিক 'লং-মার্চ'-কে একটি adventurist action বলে আখ্যা দিয়েছেন।

উপরে লিখিত বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলি নিতাম আমরা পাঁচ নম্বরের কম্যুনিষ্টরা মিলিতভাবে। আর সর্ব্ব-সাধারণ ডেটিনিউদের জন্য কমনরুমে আসত কয়েকটি দেশী দৈনিক সংবাদপত্র আফিস থেকে 'সেনসর্‌ড্' হয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে। অনেক খবর কাঁচি দিয়ে কেটে আমাদের গোচর বহির্ভূত রাখা হতো।

---

* প্রবন্ধটি 'Pacific Affairs' এ পড়েছিলাম অথবা 'The Trans Pacific'-এ, এ বিষয়ে এখন একটু সন্দেহ জাগছে।

—৭—

দেউলি : অনশন ধর্ম্মঘট

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের শেষ ভাগে আন্দামান সেলুলর জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা কতকগুলি দাবীর ভিত্তিতে অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করেন। দাবীগুলির ভিতর প্রধান ছিল, 'রিপ্যাট্রিয়েশন'। অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দীদের নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়ে আনা। এই অনশনের খবর দেউলিতে আমরা প্রথমে জানতে পারিনি। কারণ, ক্যাম্পের ভিতর যে খবরের কাগজ আসত, সেগুলি 'সেন্সর' করে যে-সব খবর আমাদের গোচরে আনা অবাঞ্ছিত বলে কর্তৃপক্ষ মনে করতেন, সেগুলিকে কাঁচি দিয়ে কেটে রাখা হতো। আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে আমরা আন্দামান বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘটের খবর জানতে পারি। সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, দেউলির বন্দীরাও আন্দামানের বন্দীদের সমর্থনে অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন।

এই উপলক্ষে একটি আলাদা ক্যাম্প কমিটি গঠিত হলো এবং কালীপদ ব্যানার্জিকে (মাদারীপুর) তার সম্পাদক নিযুক্ত করে, তাঁর নামে বাংলা গভর্ণমেন্টের নিকট একটি তারবার্ত্তা পাঠান হলো। ঐ তারবার্ত্তায় জানানো হলো যে, দেউলির রাজবন্দীরা আন্দামান বন্দীদের সমর্থনে আগামী ১০ই আগষ্ট (১৯৩৭) থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশে তখন কৃষক প্রজা পার্টি ও মুশলিম লীগের কোয়েলিশন সরকার চলছে এবং স্যার নাজিমুদ্দীন স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে আসীন।

এদিকে দেউলি জেলের আফিসেও যথারীতি আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানানো হলো। পরদিনই প্রত্যেক ডেটিনিউকে একখানা করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হলো। ও'তে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখে ধর্ম্মঘট থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা হলো এবং শেষে এই বলে শাসানি-ও দেওয়া হলো যে, যদি এই সদুপদেশাবলী অগ্রাহ্য করে ডেটিনিউরা ধর্মঘটের পথই বেছে নেন, তা' হলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। [মূল নোটিশের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।]

কিন্তু ঐ নোটিশ পাওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ-ও ও'র মোকাবেলায় নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রথমতঃ এক নম্বর ক্যাম্পের অধিবাসীদের অন্যান্য ক্যাম্পে সরিয়ে নিয়ে ঐ ক্যাম্প

খালি করা হলো। যদি কোন ইমারজেন্সি দেখা দেয়, তা হলে কিছু কিছু ডেটিনিউকে যাতে ঐ ক্যাম্পে আলাদা করে সরিয়ে রাখা যায়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। ডেটিনিউরা তখন ঐ ক্যাম্পের নাম দিলেন—পানিশ্‌মেন্ট ক্যাম্প।

বাইরে থেকে প্রচুর ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার আনা হলো এবং সমস্ত ক্যাম্পগুলির দায়িত্ব ভার দেওয়া হলো একজন মিলিটারী ডাক্তার লেঃ কর্ণেল যশোবন্ত সিং-এর উপর। লেঃ কর্ণেল সিং দেউলি বন্দীশালার ভার পেয়ে এসে প্রথমেই সমস্ত ক্যাম্পগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং যেখানে যে-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন মনে করলেন, অবিলম্বে তা করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। দেউলিতে আসবার বেলায় বুঁদি শহরে তোরণ-প্রহরায় নিযুক্ত রাজপুত সিপাহিদের চেহারা দেখে মনে যে নিরাশভাবের উদয় হয়েছিল, পূর্ব্বে তার উল্লেখ করেছি। যশোবন্ত সিং-কে দেখে পূর্ব্বেকার সে-ধারণা বদল হলো। শুনেছিলাম, তিনিও রাজপুত। কী সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। রক্তাভ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ; উচ্চতায় ৬' ফুটের কম নয়। তেজোদ্দীপ্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল। ঔরংজেবের দরবারের যশোবন্ত সিং-এর কথা তাঁকে দেখলে মনে হয়।

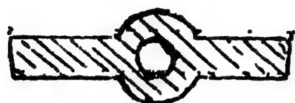
প্রত্যেক ক্যাম্পের কমনরুমকে দরমা দিয়ে পার্টিশান করে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠরিতে পরিণত করা হলো। মাঝখানে একটি করে লম্বা টেবিল পেতে ঐ কুঠরিগুলিকে ফোর্স ফিডিংরুমরূপে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হলো।

১০ই আগস্ট তারিখে (১৯৩৭) আমাদের অনশন শুরু হয়। প্রতিদিন ডাক্তাররা নিয়মিত এসে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যেতেন। পরিচারকেরা লেবু, গরম জল নুন দিয়ে যেত। দিনে ২/৩ বার লেবুর রস ও নুন মিশিয়ে এক কাপ মত গরম জল পান করা হতো। শরীরের স্বাভাবিক বিরেচন ক্রিয়া হঠাৎ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেইজন্য অনশনকারীদের পক্ষে এই লেবু গরম জল গ্রহণের প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

চতুর্থ কি পঞ্চম দিন থেকেই কর্ত্তৃপক্ষ বলপূর্ব্বক খাওয়ানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। সে এক এলাহি কাণ্ড। সকাল আটটা সাড়ে আটটায় দলে দলে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, সিপাই ক্যাম্পের ভিতর ঢুকতো। সঙ্গে অনেক সাজ সরঞ্জাম, বড় বড় ড্রাম ভর্‌তি তরলায়িত খাদ্য বয়ে নিয়ে আসতো কয়েকজন। আরও নানা আসবাবপত্র এবং বেশ কয়েকটি স্ট্রেচার এনে রাখা হতো ফোর্স-ফিডিং রুমে রূপান্তরিত, কমন-রুমে। তারপর শুরু হতো আসল কাজ।

সিপাইরা স্ট্রেচারে করে একসঙ্গে পাঁচ ছয়জন অনশনকারীকে নিয়ে এসে ভিন্ন ভিন্ন ফোর্স-ফিডিং রুমের টেবিলের উপর শুইয়ে দিত। ডাক্তাররা তাঁদের বুক ও নাড়ি পরীক্ষা করতেন। তারপর এক একজনের পিছনে একাধিক সিপাই নিযুক্ত হতো।

কেউ চেপে ধরতো হাত, কেউ পা এবং একজন মাঝখানে ছ্যাদা-ওয়ালা একটি লম্বা কাঠের টুকরো মুখে গুঁজে দিয়ে চেপে ধরে রাখতো। অনশনকারী যাতে মুখ বন্ধ করতে না পারে সেইজন্য এই শেষোক্ত ব্যবস্থা। একজন ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার তারপর সেই ছিদ্রপথে একটি রাবারের নল ঢুকিয়ে দিতেন। নলটি মুখের ভিতর দিয়ে পাকস্থলী পর্যান্ত প্রবেশ করতো। নলের অন্যপ্রান্তে একটি ফানেল লাগানো থাকতো, সেই ফানেল দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে অনশনকারীর উদরে প্রবেশ করান হতো। তারপর নল বের করে নিয়ে তাঁকে আবার ষ্ট্রেচারে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হতো।



এইরূপ কাঠের টুকরো ফোর্স ফিডিং-এর সময় ব্যবহৃত হতো।

যে-তরল পদার্থটি এইভাবে খাওয়ানো হতো, সেটি কী দিয়ে তৈরী, তা' পরে জেনেছিলাম। চা'ল ও ডাল একত্রে সিদ্ধ করে একেবারে তরলায়িত করে ফেলা হতো। পরে তার সঙ্গে ডিমের হলদে অংশ ভালভাবে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে 'রাম' জাতীয় মদ্য মেশান হতো। এই পাঁচন জাতীয় পদার্থের উৎকট গন্ধেই অনেকের বমির ভাবের উদ্রেক হতো। এবং কেউ কেউ মুখ থেকে নল বের করার সঙ্গে সঙ্গেই গিলিত পদার্থ উদ্‌গীরণ করে দিতেন। ফোর্স-ফিডিং এর সময় কেউ কেউ ধ্বস্তাধ্বস্তি-ও করতেন। তাঁদের মুখের কাঠের টুকরোটি ঢোকাতে অসমর্থ হলে, সিপাইরা তাঁকে চেপে ধরতো এবং ডা'ক্তার নাকের ভিতর দিয়ে নল পূরে খাবার খাওয়াতেন। এতে সময় সময় কেউ কেউ অল্প-বিস্তর আহত-ও হতেন।

যদি কেউ টেবিলের উপর ঐ সময় জ্ঞান হারাতেন, বা ডাক্তার যদি পরীক্ষা দ্বারা কারো নাড়ী বা হৃৎ স্পন্দনের গতি সুবিধা'জনক নয় মনে করতেন, তাহলে তাঁকে সেইখান থেকেই ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। হাসপাতালে তাঁর যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

ফোর্স-ফিডিং-এর চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে অর্থাৎ অনশন শুরু হবার আট দশ দিন পর আমা'কে ঐ ভাবে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ক্যাম্প কমিটির পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাসপাতালে গিয়েও খাদ্য গ্রহণে অসম্মত হওয়ায়, পরদিনই আমাকে পানিশ্‌মেন্ট ক্যাম্প অর্থাৎ এক নম্বর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আমার পূর্ব্বে-ও কয়েকজন সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। প্রত্যেককেই আলাদা-ভাবে বেশ দূরে দূরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে পরস্পর মেলামেশা না করা যায়।

আমার স্থান হলো ক্যাম্পের উত্তর প্রান্তে এমন একটি ছোট্ট ঘরে যার ছাদ প্রায় মাথায় ঠেকে। প্রায় গোলাকৃতি এই ঘরটিতে একটি ঘুলঘুলি ভিন্ন কোন্ জানালা ছিল না। দরজায় কপাট ছিল না, তবে তার সামনেই একটি প্রাচীর তুলে দরজাটাকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন কোন স্থানে বম্বিং শেল্টার (Bombing Shelter) হিসাবে কিছু ঘর তৈরী হ'তে দেখেছিলাম। এই ঘরটি ছিল অনেকটা সেই ধরণের। বোধহয়, এখানে যখন ব্রিটিশ সৈন্যেরা থাকতো, সে-সময় গোলা-বারুদ রাখার ঘর হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা হতো।

এক নম্বর ক্যাম্পে ফোর্স-ফিডিং-রুম ছিল গোটা দুই। একদিন আমাকে যখন একটা রুমে খাওয়ানো হচ্ছিল, তখন পাশের ঘর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এলো। জলে ডুবন্ত কোন লোক যদি হঠাৎ এক ঢোক শ্বাস নেবার সুযোগ পায়, তখন তার মুখ থেকে যে একটা শব্দ বেরোয়, অনেকটা সেই রকম। পরে জেনেছিলাম শচী গাঙ্গুলীকে ঐ ঘরে নাকে নল পুরে ফোর্স-ফিডিং করান হচ্ছিল।

একদিন লেঃ কর্ণেল যশোবন্ত সিং অন্যান্য ডাক্তার ও সঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দেখতে এলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন আছেন ?"

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম—'এই 'ডান্‌জানে' (Dungeon) আমাকে রাখা হয়েছে, কেমন আছি, এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন আছে কি ?

"ডান্‌জান ?"—একটু অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়ে কর্ণেল সিং কথাটা উচ্চারণ করলেন।

"আলো বাতাসহীন, পর্ব্বত গুহা সদৃশ এই ঘরটাকে 'ডান্‌জান' বলবো না ত' কী বলবো ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশোবন্ত সিং আবার বললেন—"আর কিছু বলবেন ?"

বললাম—"আজ কয়দিন থেকেই ক্যাম্পের ডাক্তারকে বলছি, আমার জন্ত একটা 'কমোডের' ব্যবস্থা করতে। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় পায়ের উপর সমস্ত দেহের ভার রেখে বসা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু ডাক্তার কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

ডাঃ জগন্নাথ সঙ্গেই ছিলেন। লেঃ কর্ণেল সিং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। জগন্নাথ কিছু বলবার জন্য মুখ খুললেন। কিন্তু, কেবল 'স্যার' শব্দটি বের হওয়া মাত্রই নির্দ্দেশাত্মক ভঙ্গীতে লেঃ কর্ণেল সিং তাঁকে বললেন—'শোন ডাক্তার, আমি আর মিনিট কুড়ি এই ক্যাম্পের ভিতর আছি। ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি জেনে যেতে চাই যে, কমোড্ সাপ্লাই করা হয়েছে।' —বলেই নিজের হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে দলবলসহ প্রস্থান করলেন।

পাঁচ সাত মিনিট পরেই দেখি একজন সুইপার কাঁধে করে একটি 'কমোড' এনে পাশেই ল্যাট্রিনের জন্য নির্দ্ধারিত ঘেরা জায়গায় রেখে দিয়ে গেল।

বেলা সাড়ে দশটা কি এগারটার সময় একজন বাঙ্গালী পরিচারক তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিত। পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে কী সুন্দরভাবে তেল মাখাতো। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৃদুভাবে আঙ্গুল বা হাত চালিয়ে এমন সুন্দর তেল মালিশ করে দিত যে, আরামে চোখ বুজে আসতো। প্রায় আধঘণ্টা এমনি তেল মাখিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করান'র পর ঘরে এনে শুইয়ে দিত। এর ফলেই হয়ত, অনেকক্ষণ যাবৎ বেশ ঘুম হতো। শরীরের গ্লানি-ও অনেক কম অনুভব করতাম।

একদিন এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন সুন্দর তেল মালিশ করা কোথায় শিখলে ?

সে বললো— বাবু, আমি কলকাতার লোক। জগন্নাথ ঘাটে তেল মালিশ করেই পয়সা রোজগার করি। তেল মালিশের ও নানা পদ্ধতি আছে। আপনাদের এখন শরীরের যা অবস্থা, তা'তে অতি মোলায়েমভাবে তেল মালিশ করতে হয়। তা-ই করছি। কিন্তু জগন্নাথ ঘাটে গেলে দেখবেন, কোনও ভুঁড়িওয়ালা লোকের পেটে চেপে বা কারো পিঠে হাটু গেড়ে বসে আসুরিকভাবে তেল মাখান হচ্ছে।

তার পারিবারিক কথা কিছু জানতে চাইলাম। কিন্তু, সে এড়িয়ে গেল। বললো—"বাবু আমাদের কোন কিছু টান নেই। যখন যে-অবস্থায় পড়ি, তার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিই।'

জানতে পারলাম, আগে ও দু'একবার জেলে এসেছে। এবারের সাজা সাত বছরের। কেন সাজা হলো, তা' জানতে চেয়ে তাকে আর বিব্রত করলাম না।

দিন কাটতে লাগলো রুটিন-মাফিক। সকালে একবার ডাক্তারের আগমন ও দেহ যন্ত্র পরীক্ষা। সাড়ে আটটা নাগাদ ফোর্স-ফিডিং। দশটা এগারোটায় তৈল মর্দ্দন ও স্নান। তারপর শয্যা-গ্রহণ। দিনের বেলা ঘুমটা ভাল হতো। রাত্রে সেরূপ

হতো না। পড়বার জন্য দু'একখানা বই সঙ্গে ছিল। কিন্তু পড়ার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না।

অবশেষে একদিন আফিস থেকে জানানো হলো যে, আন্দামানের বন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেছেন, অতএব দেউলির ডেটিনিউরা-ও অবিলম্বে অনশন ত্যাগ করবেন, আশা করা যায়।

ক্যাম্প কমিটির পক্ষ থেকে বলা হলো—'তোমাদের কথার সত্যতার বিশ্বাস কি? খবরটা সত্য বলে প্রমাণ পেলে আমরা-ও অবশ্যই অনশন ভঙ্গ করবো।'

পরদিন সকালবেলা আফিস থেকে প্রত্যেক ক্যাম্পে বেশ কয়েক কপি করে খবরের কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কাগজ খুলেই দেখা গেল—প্রথমেই বড় বড় টাইপে এই মর্ম্মে লেখা রয়েছে—আন্দামানের অনশন ধর্মঘটিরা অনশন ভঙ্গ করেছেন। সরকার তাঁদের রিপেট্রিয়েশন' দাবীসহ অনেক দাবীই মেনে নিয়েছেন।

খবর পড়ে ক্যাম্প কমিটি অনশন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিল এবং আফিসে তা' জানিয়ে দেওয়া হলো।

এক গ্লাস করে কমলালেবুর রস পান করে সকলে অনশন ভঙ্গ করলেন। কর্তৃপক্ষ সব কিছুরই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে রেখেছিলেন।

আমি-ও যথাসময়ে লেবুর রস পান করে এক নম্বরের 'দানজান' ছেড়ে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে স্ব স্থানে ফিরে এলাম—অবশ্যই স্ট্রেচার-বাহিত হয়ে। অনশন-ভঙ্গের তারিখটা ঠিক মনে নেই। তবে তিন সপ্তাহকালের মত অনশন ধর্মঘট চলেছিল বলে মনে হচ্ছে।

00—

দেউলি ঃ শেষের পালা

এবার আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম যে, দেউলির জীবন আমাদের ফুরিয়ে এসেছে। সরকার যখন রাজনৈতিক বন্দীদের রিপেট্রিয়েশন দাবী মেনে নিয়েছেন, তখন দু'দিন আগে হোক, পরে হোক, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন আমাদের অবধারিত। হয়ত, আমাদের মুক্তির পূর্ব্ব-ধাপ-ও এই রিপেট্রিয়েশন। স্বভাবতঃই সকলের মন একটা আনন্দের ছোঁয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

কিন্তু, অর্দ্ধ-দশকের-ও বেশী কাল এক নাগাড়ে যেখানে কেটেছে, সেখানকার জলবায়ু ও মাটির সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। সেখানকার পশুপাখী ও গাছপালার সঙ্গে-ও একটা নিবিড় আকর্ষণ গড়ে উঠেছে। সেখানে যারা এতকাল নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সেবা করে এসেছে, তাদের সঙ্গে একটা হৃদয়ের বন্ধন গ্রথিত হয়েছে।

ছোটে সিং, সন্তু, আরো কতজন যাদের নাম আজ স্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে, তারাও আমাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হবে এবং পরে একদিন মুক্তি পেয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। তাদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এরা সকলেই আমাদের বারবার অনুরোধ করেছে— 'বাবু, ছাড়া পেলে আমাদের অঞ্চলে একবার বেড়াতে যেয়ো।' সকলেই তাদের নিজ নিজ ঠিকানা দিয়েছে। সব আজ ভুলে গেছি। কিন্তু সন্তু-র ঠিকানাটা কেমন করে জানি, মনে রয়ে গেছে। বুদায়ুন শহরে বড়বাজারে গিয়ে শান্তি স্বরূপ হাজমের নাম করলে যে-কেউ তার ডেরা দেখিয়ে দেবে।

ছোটে সিংকে একদিন বীরেনবাবু (ভট্টাচার্য্য) ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, "ছোটে সিং, তুম্হারা নাম 'ছোটে সিং' কিস্নে রাখা হ্যায় ? তুম্ তো 'বড়ে সিং' হো।"

ছোটে সিং হেসে জবাব দিয়েছিল—"নেহি বাবুজী, হম্ বহুৎ ছোটা হ্যায়, ম্যাঁয় তো কিসান হুঁ।"

"কিসান হোনেসে কোই ছোটা নেই হো জাতা, আওর আমীর হোনে সে ভি বড়া নেহি হোতা। জিস্‌কা দিল বড়া, ওহি বড়া হ্যায়। তুম্হারা দিল বহুৎ বড়া হ্যায়,

ছোটে সিং।”

ছোটে সিং খুশী হয়েছিল। বলেছিল—‘আপ্‌ কা মেহেরবানী হ্যায, বাবুজী।”

খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঘরের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় বসে আড্ডা দিতাম। এটা আমাদের একপ্রকার প্রাত্যহিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন এমনিভাবে আমরা বসে গল্প গুজব করছি, সন্তু এসে একটু কুণ্ঠা-মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—‘বাবু, হমলোগোঁকা খানা, রুটি আউর সব্জী লানেসে আপ খায়েঙ্গে ?”

নেপাল নাগ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—‘জরুর খায়েঙ্গে। তোম্ লাও। বহুৎ খুশীসে হাম খায়েঙ্গে।’

হৃষ্টমনে সন্তু চলে গেল। তার কুণ্ঠার কারণ বুঝতে পারলাম। একে জাত-পাতের প্রশ্নে তাদের রান্না বা ছোঁওয়া আমরা খাব কিনা, তার সংশয় ছিল। তারপর আমরা ভাল ভাল খাবার খাই, তাদের কয়েদীদের খাবার আমাদের পছন্দ হবে কি ? তাই, নেপালবাবুর কথা শুনে সে বাস্তবিকই খুশী হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরেই কয়েকখানা রুটি ও কিছু তরকারী নিয়ে সন্তু ফিরে এলো। আমরা সকলে মিলে তা' ভাগ করে খেলাম। ভালই লাগলো। মোটা গরম গরম রুটি একটু ঝাল ঝাল আলুর তরকারী। এদের রুটির সঙ্গে একটাই তরকারী হয়। কোন-দিন আলু দিয়ে, কোনদিন লৌকি (লাউ) দিয়ে কোনদিন বা ভেণ্ডি দিয়ে।

এরপর থেকে সন্তু রোজ ঐ সময় আমাদের জন্য রুটি তরকারী এনে হাজির করতো। একদিন রাগ করে তাকে বলা হলো, “দেখ সন্তু, তুমি যদি রোজ রোজ এমনি করে আমাদের জন্য খাবার আন, তা'হলে আমরা আর খাবো না। এমনিতেই গভর্ণমেন্ট তোমাদের জন্য যথেষ্ট খাবার বরাদ্দ করেনি ; তার উপর তোমাদের ভাগ থেকে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এলে আমরা এবার থেকে রাগ করবো।’

সন্তু বললো, “না, বাবুজী কখনো না ; আমাদের ভাগ থেকে দিচ্ছি না। কিছু খাবার আমাদের উদ্বৃত্ত হয় ; সেগুলি পরদিন ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের রুটি তোমরা খেলে আমরা কত খুশী হই।”

সন্তুকে কথা দিয়েছিলাম, মুক্তি পেলে বুধায়ুনে গিয়ে একবার তার সঙ্গে দেখা করবো। সে-কথা রক্ষা করা হয়নি।

'গীসা' ছিল সামান্য একজন 'সুইপার' (ভাঙ্গি)। আমাদের কত চিঠি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে পোষ্ট করেছে। তার ত কোনই স্বার্থ ছিল না। আমরা তাকে কোন প্রকার পারিশ্রমিকই দিতে পারিনি।

আরেকজনের কথা। নামটা তার ভুলে গেছি। সে ছিল আমাদের ঘরের খাস পরিচারক। 'বেড্‌টি', সকাল বিকালের জল খাবার প্রত্যেকের সিটে এনে দিত। কুজোতে পানীয় জল ভরে রাখা প্রভৃতি ঘরের অন্যান্য কাজ এবং আমাদের ফাইফরমাস খাটা—সে-ই করতো। বয়স কুড়ি পার হয়নি। তবে লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। শীতকালে প্রচণ্ড শীতের ভোরে আমরা লেপ-মুড়ি দিয়ে সুখ-নিদ্রায় শায়িত; 'বেড্‌টি' নিয়ে এসে সে প্রত্যেককে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। বলতো, 'গরম গরম চা পিয়ো, জাড়া চলা যায়েগা।' কেউ লেপের তলা থেকে মুখ বের করতে গরিমসি করলে সে রসিকতা করে বলতো—'তুমহারা এতনা জাড়া লাগা হায় তো, উঁহাসেই হাঁ করো মঁয় তুমহারা মুঁহ্‌-মে কেতলি-সে চা' ঢাল দেতা হুঁ।"

আমাদের সঙ্গে সে আপনজনের মতই ঠাট্টা, ইয়ার্কি, রসিকতা করতো, আমরা উপভোগ করতাম।

এদের কারো সঙ্গেই তো আর দেখা হবে না। এদের সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের কথা মনে উঠে আমাদের আসন্ন স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দানুভূতিতে একটুও কি গ্লানিমার ছায়া পড়েনি?

এবার সকলেই বিদায়ের প্রস্তুতি-পর্ব্বে লেগে গেলেন। এই সাড়ে পাঁচ বছরে অনেকেরই কিছু কিছু কায়েমী সম্পত্তি গড়ে উঠেছিল। আমার মত যাঁরা পুষ্পোদ্যান রচনা করে বসেছিলেন, তাঁদের পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না। আমাদের মালঞ্চে রোপিত পুষ্প-বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদি দেউলি-দেবীর চরণ-প্রান্তেই অক্ষত অবস্থায় নিবেদন করে দিবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিত্যক্ত প্রান্তরে, রুক্ষ আবহাওয়া সহ্য করে যদি এদের দু'একটা বেঁচে থাকে, তবে সময়মত বর্ষার জল পেয়ে আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং যথাসময়ে মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়ে অতিথি বাঙ্গালী বন্দীদের স্মৃতি দেউলি-সুন্দরীর বুকে জাগিয়ে তুলবে।

কিন্তু যাঁরা নানা প্রকার জীবজন্তুর মালিক হয়ে বসেছিলেন, তাঁরা একটু ভাবনায় পড়লেন। তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেরী হলো না। এই অবোলা প্রাণীদের অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে আসা প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেওয়ারই সামিল হবে। তার চেয়ে নিজেরাই এদের শমন-সদনে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। টিয়া পাখীদের অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হবে, তারা উড়ে যেতে পারবে। কিন্তু, ঠিক হলো যে, হাঁস, মুরগী বা টার্কির ত কথাই

নেই, ময়ূর, খরগোশ, হরিণ—এদের-ও 'শমন দেবায়' উৎসর্গ করে, তার প্রসাদ গ্রহণ করা হবে।

এরপর মাসখানেক ধরে প্রায়ই কোন না কোন ক্যাম্পে 'প্রাইভেট ফিস্ট' লেগেই থাকতো। অন্নদার হরিণ গেল, হাঁস, ময়ূর, মুরগী, খরগোশ—যার যা' ছিল একে একে পোষা প্রাণী সব খতম হয়ে গেল। ক্যাম্পে ক্যাম্পে মাংসের নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেকের অরুচি ধরে গেল। মাংসে অরুচির প্রশ্ন আমার বেলায় অবশ্য আসে না। এক নম্বর ক্যাম্পে থাকতে আমার বহুদিনকার (ক্রনিক) পেটের গোলমাল সারাবার চিকিৎসা হয়েছিল, 'মেডিক্যাল ডায়েট' হিসাবে দুবেলা মাংস খাবার ব্যবস্থা করে। প্রায় ছ মাস ধরে এই ব্যবস্থার অধীনে ছিলাম। অসুখ অবশ্য আশ্চর্য্যভাবে সেরে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে একরকম 'মাংসাশী' করে তুলেছিল। একেবারে অভক্ষ্য না হলে কোন জন্তু-জানোয়ারের মাংসেই আমার অরুচি হতো না।

একদিন চার নম্বর ক্যাম্প থেকে খবর এলো, কয়েকজন বন্ধু চিলের মাংস রান্না করেছেন। কেউ খেতে চাইলে নাম পাঠাতে পারেন। ভোজনার্থীর তালিকায় নাম দিলাম। অনেকেই বলে উঠলেন, "সে কি মশায়, চিলের মাংস খাবেন? এ' খেলে যে পাগল হয়ে যায়।"

বললাম, 'এ'টাই পরীক্ষা করবার জন্য যে খাচ্ছি।'

যথা সময়ে এক প্লেট মাংস এলো। চিলের মাংস এত সুস্বাদ। পরে জানা গেল এটা মোটেই চিলের মাংস নয়, পায়রার। চিলের মাংস বলে রটিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছিল, কয়জন সংস্কারের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। আমাদের ক্যাম্পের আমি ও নেপাল নাগ খেয়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।

অবশেষে সেই প্রত্যাশিত দিন এলো। ডিসেম্বরের (১৯৩৭) প্রথম দিক থেকেই দেউলি বন্দীশালা খালি হতে শুরু হলো। দু'দিন, তিন দিন অন্তর অন্তরই এক এক ব্যাচ করে ডেটিনিউরা বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হতে লাগলেন।

ক্রমে বন্দীনিবাস ভাঙ্গা হাটের আকৃতি ধারণ করলো। যে খেলার মাঠ এতদিন শত শত লোকের সমাগমে রম রম করতো এখন সেখানে অনা কুড়ি-ও বেড়াতে যায় কিনা সন্দেহ। এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে শেষের দিনগুলি আমাদের কেটেছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যে ব্যাচ দেউলি থেকে বাংলায় প্রেরিত হলো, আমি-ও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে-সময় আর এক ব্যাচ কি দু'ব্যাচের মত ডেটিনিউ বাংলা-দেশে ফিরে যাবার অপেক্ষায় রয়ে গেলেন।

এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার রাস্তা যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম, সে-পথ দিয়ে নয়। এবারের রাস্তা আজমীর হয়ে। নির্দ্দিষ্ট দিনে রক্ষী-পরিবৃত হয়ে আমাদের দল-ও চললো দেউলিকে বিদায় জানিয়ে। হয়ত, আর কোনদিন আসা হবে না, কিন্তু দেউলীর নাম আমাদের স্মৃতিতে চিরকাল গাঁথা হয়ে থাকবে—

Fare thee well ! O pretty maid,
Loving nurse for half decade
Th' cares and woes of a wretched lot
Thy soothing hands did mitigate.

Thou yielded from thy barren womb
Fruits and flowers that sprightly bloom
Desert's daughter O sweet Deoli
Thou chased away our faces' gloom

Never, never shall I forget
Thy beasts and birds that are so pet
That sweet and charming 'Mitthu' mine
O, where shall one ever get ?

In my memory's soft membrane
For e'er shall thy rame remain
In prison cells or working field
Or when the power we shall gain.

For native soil we now depart.
With Freedom's rosy hope in heart.
Still for th' nurse in reedy time
From our eyes a drop does part.

---

* দেউলি বন্দী-শিবির তখন খালি হ'তে শুরু হয়েছে। কয়েকদিন অন্তর অন্তর ডেটিনিউদের এক একটি ব্যাচ বাংলাদেশে পাঠান হচ্ছে। সেই সময় এই কবিতাটি লিখিত হয়। তারিখটা ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

—00—

স্মৃতি-মন্থন ঃ—

দেউলির পরে

দেউলি থেকে আমাদের বদলির আদেশ হয়েছিল বাংলাদেশের বহরমপুর জেলে। রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আজমীঢ় ষ্টেশনে ট্রেনে উঠ্‌লাম। আমাদের জন্য বিশেষ 'বগি' নির্দ্ধারিত ছিল। 'বগি'-গুলি কোন দ্রুতগামী ট্রেনের বা মালগাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। রাস্তায় ওর 'ষ্টপেজ' বড় একটা ছিল না। রাত্রে কী প্রচণ্ড শীত। আমরা ত' তবু 'হোল্ড্‌-অল্‌' খুলে বেঞ্চিতে পেতে লেপ-কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কষ্ট হলো আমাদের প্রহরী বেচারার দুর্দশা দেখে। বগি-গুলি ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত ছিল। এইরূপ একটি কামরার দু'টি বেঞ্চ ও দু'টি বাঙ্ক্‌ দখল করে আমরা চারজন শুয়ে পড়েছিলাম। কামরায় পুলিশ রক্ষী ছিলেন একজন ইউনিফর্ম পরিহিত সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টর। বেচারী এক কোনে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছিলেন। ভদ্রলোককে বল্‌লাম, "মশায়, এই চলন্ত ট্রেন থেকে আমরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবো না। আপনার কোন ওপর-ওয়ালার-ও এখন দেখতে আসবার সম্ভাবনা নেই। একখানা কম্বল দিচ্ছি, আপনি মেঝেতে শুয়ে পড়ুন।"

দ্বিতীয়বার বলবার দরকার হলো না। ভদ্রলোক কম্বলখানা লুফে নিয়ে সবুট ইউনিফর্ম-পরিহিত অবস্থায়ই দুই বেঞ্চির মাঝখানের জায়গাটায় আপাদমস্তক কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন! অল্পক্ষণ পরেই তাঁর নাসিকাগর্জ্জন শোনা গেল।

তৃতীয় দিন সকাল দশটা নাগাদ বহরমপুরে পৌঁছলাম। ইতিপূর্ব্বে দেউলিতে থাকতে বহরমপুর জেলের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম। সেখান থেকে দেউলিতে বদলি হয়ে আসা কয়েকজন বন্ধুর মুখে এসব কথা শোনা। সেখানে জেলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নাকি একটি পাঠান রেজিমেন্টের হাতে ন্যস্ত। সিপাইরা অত্যন্ত উগ্র মেজাজের। ডেটিনিউদের সঙ্গে খেঁচাখেঁচি লেগেই আছে। যে-কোন দিন হিজলীর ঘটনার পুনরভিনয় হতে পারে বলে তাঁরা সর্ব্বদাই আশঙ্কা করে থাকেন। আফিসে কোন খবর পাঠাবার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে গেটে পাহারা-রত সেন্ট্রির কাছে যাবার উপায় নেই। সঙ্গীন উঁচিয়ে সে বলে—"দশ কদম দূর সে বাত বলো।" গেট থেকে বেশ কিছু দূরে একটা সাদা দাগ দেওয়া আছে। ওটা নাকি দশ কদমের চিহ্ন।

তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, যাতায়াতে ডেটিনিউদের ওখানে উলঙ্গ করে 'সার্চ' করা হয়।

যাই হোক, সব রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়েই আমরা জেল-আফিসের বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের লাগেজ-পত্র-ও সেখানে জড় করা ছিল। সরকারের চোখে আপত্তিকর কিছু কিছু কাগজপত্র আমাদের সঙ্গে ছিল। এর কিছু ছিল বই-ভরতি আমার প্রকাণ্ড দু'টি ট্রাঙ্কের ভিতর লুকানো; আর দু'একটা ছিল সঙ্গেই। শীতকাল বলে ওভারকোট সমেত অন্ততঃপক্ষে চারপ্রস্থ জামা গায়ে ছিল। তার ভিতর থেকে তল্লাসী করে এক টুকরো কাগজ বের করা খুব সহজ হবে না ভেবেই, কাছে রেখেছিলাম। আর ঝুঁকি আমাদের কিছু নিতে ত' হয়ই। উলঙ্গ করে 'সার্চ'-টা নিশ্চয়ই প্রকাশ্য স্থানে হবে না মনে করে, ঘরের ভিতর কখন কার ডাক আসে সেই প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

কিন্তু, ঘরের ভিতর কারো ডাক এলো না। পরিবর্ত্তে, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন কয়েকজন মিলিটারী অফিসার। চেহারা, পোষাক এবং কথাবার্ত্তায় বুঝলাম এঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক। আমাদের সামনে এসে প্রত্যেককে দাঁড়াতে বললেন। তারপর আমাদের জামার পকেটের উপর একবার হাত চাপড়ে দেখে, প্রত্যেকের লাগেজ দেখিয়ে দিতে বললেন। লাগেজ দেখিয়ে চাবির গোছা দিতে গেলাম। কিন্তু তা' না নিয়ে আমাদের বাক্স আমাদের নিজেদেরই খুলতে বললেন। খোলা হলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তল্লাসীর কাজ শেষ করে দিলেন। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভিতরে ঢুকলাম।

ভেবে একটু আশ্চর্য্য হ'লাম, কোথায় উলঙ্গ করে 'সার্চ', আর কোথায় মামুলি ধরণের নাম কা ওয়াস্তে 'সার্চ'। মনে হলো, বাংলার বাইরে থেকে আমাদের এই নিয়ে আসাটা মুক্তি দেওয়ারই পূর্ব্ব লক্ষণ। তাই, ছেড়ে দেওয়ার আগে 'সার্চের' কড়াকড়ির নীতিটা বোধ হয় সরকার পরিত্যাগ করেছেন।

এ'র আরেকটা সম্ভাব্য কারণও ভিতরে এসে জানলাম। আমাদের আগেও ডেটিনিউদের দু'একটি ব্যাচ দেউলি থেকে বহরমপুর জেলে এসেছেন। তাঁদের ব্যবহারে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ করে সিপাইরা নাকি খুব খুশী। এঁরা সিপাইদের 'সিপাই-জী' বলে সম্বোধন করেছেন, 'আপ্' বলে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছেন, ভাল হিন্দুস্তানীতে 'বাত্‌চিত্' করেছেন। এই কারণে, দেউলির ডেটিনিউ মাত্রের উপরই এদের একটা ভাল ধারণা জন্মে গেছে। এ পর্য্যন্ত বহরমপুরের ডেটিনিউদের কাছে এরা নাকি 'এই সিপাই' এবং 'তোম্' শব্দের প্রয়োগই সর্ব্বদা শুনে এসেছে এবং ফলে একটা সুপ্ত আক্রোশ

খানকার ডেটিনিউদের বিরুদ্ধে পোষণ করে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে হিজলীর কথাও মনে পড়ে। হিজলী বন্দীশালায় রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে বর্বর আক্রমণ হয়েছিল, তার নিন্দা করার ভাষা নেই। কিন্তু, আত্ম-সমীক্ষার চোখ নিয়ে ঐ ঘটনার দিকে যদি একটু তাকানো যায়, তবে অপর পক্ষ-কেই কি একেবারে নির্দোষ বলা যাবে? প্রত্যক্ষদর্শী ওখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মুখে শুনেছি সিপাইরা বহুদিন থেকেই ডেটিনিউদের বিরুদ্ধে এক রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল। ঐ নারকীয় অভিযানের নেতা হাবিলদার যমুনা সিং "হুকুম মিল গিয়া"—এই কথা চেঁচাতে চেঁচাতে নাকি ক্যাম্পে ঢুকেছিল। অর্থাৎ, এতদিন 'হুকুম' না পাওয়াতে তারা ডেটিনিউদের শায়েস্তা করতে পারছিল না; আজ কর্তৃপক্ষের হুকুম মিলেছে, তাই এবার তাদের শায়েস্তা করা যাক্।

বন্দীদের উপর সিপাইদের এইরূপ আক্রোশের কী কারণ থাকতে পারে? কারণ একই। সিপাইদের প্রতি বন্দীদের একটি অংশের অসদাচারণ। হয়ত, এই অংশটি খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু, ক্ষুদ্র একটি অংশের আচরণের-ই প্রতিফলন ঘটেছে সকলের উপর।

অবশ্য, অন্যভাবে দেখতে গেলে, কি হিজলী', কি বহরমপুরের—এই ক্ষুদ্র অংশ রাজবন্দীদের-ও খুব দোষ দেওয়া চলে না। ১৯৩০ এর দশকের শুরু থেকে প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লবীদের অসম-সাহসিক কার্য্যকলাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে সরকার বে-পরোয়া ধরপাকড় শুরু করলেন। অধিকাংশকেই বিনা বিচারে বন্দী করে জেলখানা ও বন্দীশালাগুলি ভরতি করা হতে লাগলো। এই বন্দীদের অনেকেই ছিল বয়সে তরুণ, পল্লী অঞ্চলের ছাত্র, নিজেদের অঞ্চলের গণ্ডী পেরিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের কোন সুযোগ পায় নি। বাংলা ছাড়া হিন্দী বা হিন্দুস্তানি—কোন ভাষার জ্ঞান-ও তাদের ছিল না। তাই, নিজেদের অজ্ঞাতেই বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন ভাষা প্রয়োগ করেছে বা এমন আচরণ করে বসেছে, যার ফলে অবাঙ্গালী সিপাইরা নিজেদের অপমানিত মনে করে মনে মনে একটা আক্রোশ পোষণ করে এসেছে।

* * * *

একমাস বা দেড়মাস কাল বহরমপুর জেলে ছিলাম। বেশ কিছু অল্পবয়স্ক বন্দীর সঙ্গে সেখানে পরিচয় হলো—যারা মার্ক্সবাদের নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে খুবই উৎসাহিত। এদের অনেকেই চট্টগ্রামের ছেলে—স্কুল বা কলেজে পড়তো। ভিলেজ ইন্টার্নমেন্টের আদেশ পেয়ে ক্রমেক্রমে এরা প্রায় সকলেই জেল থেকে চলে গেল। যাবার বেলায় এদের কয়েকজনকে মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য দু'একখানা বই

উপহার দিলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে (১৯৩৮) আমার-ও ডাক এলো। ত্রিপুরা জেলার বুড়িচঙ্‌ নামক গ্রামে অন্তরীণ। কত দীর্ঘদিন পর গ্রাম বাংলার স্নেহ-শীতল স্পর্শ পাবো! ভেবে মনটা একটু পুলকিত হলো।

* * * *

জেলার সদর শহর কুমিল্লা থেকে ডি, আই, বি পুলিশের পাহারায় শেষ রাত্রের দিকে ট্রেনে করে রোয়ানা হলাম। গন্তব্য ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন-ও দিনের আলো ফুটে ওঠেনি। সেখান থেকে পদব্রজে মাইল খানেক পথ যেতে হবে। রাত্রি-শেষের মলিন চন্দ্রালোকে গ্রাম্য পথে সে পদযাত্রা এক মনোরম অনুভূতির সঞ্চার করেছিল। পল্লীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কয়েকজন যাত্রী কারো বাড়ীর উঠান দিয়ে, কারো বা গোয়াল ঘরের পিছনে ঘেঁষে পায়ে হাঁটা সরু রাস্তায় চলেছি। কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে সুখ-নিদ্রায় শায়িত সারমেয় দল পুলিশের বুটের শব্দে উত্যক্ত হয়ে সরবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। কোন কোন গ্রামবাসীর গৃহ-প্রাঙ্গণ-স্থিত খড়ের পালুই বা ধানের মাড়াই থেকে নিঃসৃত এক বিশিষ্ট সুঘ্রান প্রাণে এক মদিরার আবেশ সৃষ্টি করছিল। ভুলে যাওয়া বাল্যকালকে আবার যেন মনের কোণে ফিরে পাচ্ছিলাম।

থানায় যখন পৌঁছলাম, তখন ভোর হয়ে গেছে। সিপাই, কনেষ্টবলরা থানার সম্মুখস্থ একটি পুকুরের পাড়ে বসে দন্ত-ধাবনাদি প্রাতঃকালীন কার্য্যে রত। অফিসে-ও একজন অফিসার মোতায়েন আছেন। সেখানকার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম সারা হলে, আমাকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। পুকুরেরই এক পাড়ে উলুখড়ে ছাওয়া ও দরমার বেড়া দেওয়া তিনটি কুড়ে ঘর। তার ভিতর একটিই মাত্র মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দু'টি ঘাড় বাঁকিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আশ্রয় নিবার জন্য উন্মুখ। তাদের সে ইচ্ছায় বাদ সেধেছে চারটি করে বাঁশের খুঁটি। এই ঘর তিনটি তিনজন রাজবন্দীর বাসগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে।

যে ঘরটি মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ইতিমধ্যেই একজন রাজবন্দী বাস করছেন। নাম, নরেশ ভট্টাচার্য্য; অনুশীলন সমিতির লোক। বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়। আঙিনায় লোক সমাগম হয়েছে বুঝতে পেরে নরেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, অপর দু'টি ঘরের কোনটিই বাসগৃহ রূপে নিরাপদ নয়। সামান্য ঝড়েই ওদের ভূমিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর ঘরে আরেকজনের স্থান সঙ্কুলান হবে; আমি তাঁর ঘরেই থাকতে পারি।

থানার লোকেরা কোন আপত্তি করলেন না। দু'জনে তাই, একই ঘরে বাস করতে লাগলাম।

কয়েক'দিন পর তৃতীয় আরেকজন রাজবন্দীর আগমন হ'লো। মণি রায়। এর বাড়ীও ময়মনসিংহ জেলায়। যুগান্তর গোষ্ঠীর সুরেন ঘোষের দলের লোক। মণিবাবুকে বাধ্য হয়েই ঘাডকাত-কর্‌ একটি ঘরে আশ্রয় নিতে হলো। কারণ, নরেশ-বাবুর ঘরে তিনজনের থাকার মত স্থান ছিল না।

এইভাবে পল্লীবাংলার কোলে অর্দ্ধ-মুক্ত অবস্থায় তিনজন বন্দী একসঙ্গে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু, খুব শান্তিতে নয়।

বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন একজন ফোঁটা-তিলকধারী বৈষ্ণব। কী এক অজ্ঞাত কারণে মণি রায়ের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হচ্ছিল না। দারোগাদের হাতে কতকগুলি ক্ষমতা থাকে, যেগুলি প্রয়োগ করলে তাঁরা তাঁদের হেফাজতে রাখা রাজবন্দীদের হয়রান করতে পারেন। কিন্তু, সাধারণতঃ কোন দারোগাই তা' করেন না। বন্দী স্থান-ত্যাগ করে পালিয়ে না যায়, এটুকু লক্ষ্য রেখেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু, বুড়িচং থানার বড় দারোগা প্রথম দিন-ই নাকি মণিবাবুর সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। মণিবাবু এসেই খুব দুঃখিতভাবে এ কথা আমা-দের জানিয়েছিলেন। এরপর থানা থেকে এসে (রোজই একবার করে আমাদের থানায় হাজিরা দিতে হতো) মণিবাবু প্রায়ই বলতেন, তাঁর সঙ্গে কোন না কোন অজুহাতে দারোগা কেমন অপমানজনক ব্যবহার করেছেন। ব্যাপারটার একটা কিনারা হওয়া দরকার ভেবে একদিন আমি থানা আফিসে গিয়ে দারোগাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। কথা কাটাকাটিতে একসময় আমি উত্তেজিত হয়ে দারোগাকে চরম অপমান করলাম। গ্রামের দু'একজন লোক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ করে দারোগা বললেন, "আপনারা দেখছেন ইনি যদি আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করেন, তা'হলে আমি এঁকে য়্যারেষ্ট করে চালান দিতে বাধ্য হবো।"

ব্যাপারটা অবশ্য অতদূর গড়ালো না। থানা থেকে আমি ফিরে আসার বেলায় সিপাই কনষ্টেবলেরা তাদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নীরবে স্মিত অভিনন্দন জানালো। বুঝলাম, কনেষ্টবলদের সঙ্গেও দারোগাবাবুর বনি-বনাও নেই।

দারোগার সঙ্গে আমার এই সংঘর্ষের ফলে মণিবাবুর প্রতি তাঁর ব্যবহারের কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হলো না। বরং উল্টোটাই হলো, বলা চলে। মণিবাবু প্রায় প্রতিদিনই দারোগার বিরুদ্ধে নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার আমাদের জানাতে লাগলেন।

শেষে একদিন তিনজনে মিলে স্থির করলাম, এখানে আর থাকা নয়। আমি ও মণিবাবু একদিন স্থান ত্যাগ করে কুমিল্লা শহরে গিয়ে উপস্থিত হবো এবং ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হয়ে দারোগার বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ জানাবো। তা'তে অন্তরীণ-আইন ভঙ্গ করার দরুন যে-সাজা' হবে, তা গ্রহণ করবো। নরেশবাবু-ও আইন ভঙ্গ করবেন, তবে আমাদের সঙ্গে নয়। পরদিন থানাকে জানিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করবেন। তিনজন একই সঙ্গে চলে গেলে পুলিশ নিজেদের খুশীমত মামলা সাজাবার সুযোগ পাবে এবং আমাদের জিনিসপত্রও আত্মসাৎ করতে পারবে। আমার মূল্যবান বইগুলির জন্য আমার মায়া ছিল।

পরামর্শ মতই কাজ হলো। একদিন রাত প্রায় তিনটের সময় মণিবাবু ও আমি কুমিল্লা অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করলাম। সকাল সাতটা নাগাদ ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় পৌঁছে লিখিতভাবে তাঁর নিকট বুড়িচং থানার 'ও, সি'-র বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলাম। ছোট ছোট ঘটনাগুলির একটি ফিরিস্তি দিয়ে জানালাম যে, এই প্রকার পরিস্থিতিতে উক্তস্থানে আমাদের থাকা সম্ভব নয়। ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নামটা ছিল, যতদূর মনে হয়, —মিঃ স্মিথ।

আরদালি মারফৎ আমাদের দরখাস্ত পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এলেন। আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে বসিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে ফোন করলেন।

ঘরের ভিতর বেশ গরম এবং অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। সাহেবকে বললাম, "আমরা তোমার ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতে পারি কি?"

"কেন, এখানে কী হয়েছে?"

"এখানে বড্ড গরম লাগছে।"

"গরম? কই, আমি ত বসে বসে কতক্ষণ ধরে কাজ করছি। আমার ত' গরম লাগছে না।"

"হতে পারে। আমরা পায়ে হেঁটে বহুদূর থেকে এসেছি কিনা, তাই হয়ত গরম অনুভব করছি।"

"কিন্তু, বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসবে, সেখান থেকে পালাবে না ত'?"

"পালাবার ইচ্ছে থাকলে এতদূর হেঁটে এখানে না এসে পালিয়েই ত' যেতে পারতাম।"

"ঠিক আছে; সেখানে গিয়েই বস।"

বারান্দায় একটি বেঞ্চ পাতা ছিল। সেখানে বসে প্রায় আধঘণ্টা দুজনে নানা আলোচনায় মগ্ন আছি, এমন সময় একখানা মোটর গাড়ী এসে থামলো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। বুঝতে পারলাম, ইনিই পুলিশসুপার, এ'র নামটা ভুলে গেছি। পরে শুনেছিলাম, এই শ্বেতাঙ্গ প্রবরটির অত্যাচারে ত্রিপুরার শুধু রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন লোকেরাই নহেন, সাধারণ মানুষ-ও সে-সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের কর্ত্তা ব্যক্তিটি আমাদের গাড়ীতে উঠতে ইশারা করলেন। আমরা উঠে বসবার পর নিজেই গাড়ী চালিয়ে কতোয়ালী থানায় হাজির হলেন। থানার প্রশস্ত বারান্দায় একজন অফিসার ডিউটিতে ছিলেন। সেই অফিসারের জিম্মায় আমাদের দিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। মনে হয়, আমাদের সম্বন্ধে 'ও, সি'-কে কিছু পরামর্শ দিবার জন্য।

বাবান্দায় আমাদের বিশদভাবে গাত্র-তল্লাসী করা হলো। গায়ের জামা, পায়ের জুতো সব খুলে ফেলতে হলো। আমাদের নাম ধাম এবং অন্যান্য নানা প্রকার জেরার উত্তর একটি খাতায় লিখে রাখার পর অফিসারটি আমাদের ঐ ভাবেই অর্থাৎ নগ্ন দেহ ও পায়ে মেঝেতে বসে থাকতে আদেশ দিলেন। অপমানে গা' জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই করাব ছিল না। এমন সময় পুলিশ-সুপার ভিতর থেকে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে একটু অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে গাড়ী চালিয়ে চলে গেলেন।

গাডীটা থানার হাতা পার হওয়া মাত্রই আমাদের জিম্মাদার অফিসারটি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "আপনারা উঠে বসুন। কিছু মনে করবেন না, এই সাহেব ব্যাটা যদি দেখত, আমি আপনাদের প্রতি একটু ভদ্র ব্যবহার করেছি, তা'হলে আমার চাকরী নিয়ে টান দিত।"

অফিসারটি ছিলেন একজন এ, এস্, আই, মুসলমান। আমরা আবার জামা, জুতা পরলাম। তাঁর টেবিলের অপর পাশে দু'টি চেয়ারে বসিয়ে ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে অনেক কথাবার্ত্তা বললেন।

বেলা দশটা নাগাদ আমাদের কোর্টে পাঠান হলো। পায়ে হেঁটে, কোমরে দড়ি বাঁধা ও হাতে 'হ্যাণ্ড্-কাফ্' লাগান অবস্থায় পুলিশ প্রহরায় সেখানে গেলাম। এবার-ও এই অপমানের জ্বালা নীরবেই হজম করতে হলো। অন্তরীণ-আইন লঙ্ঘনের অপরাধে আমরা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হ'লাম। বিচারালয়ে একটা দিন নির্দিষ্ট করে হাকিম আমাদের জেল-হাজতে থাকার নির্দ্দেশ দিলেন।

জেলে আসার কিছুক্ষণ পরেই দেখি, নরেশ ভট্টাচার্য্য-ও সেখানে এসে হাজির। সকালবেলা থানার পুলিশ অন্তরীণ-আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থ পাঠিয়েছে। নরেশবাবু অবশ্য একদিন বা দু'দিন পরই জেল থেকে খালাস পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালান হলো না। কারণ, নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যাওয়ার আগেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল।

বিচারে আমাদের তিনমাস কারাদণ্ড হলো। হাজতবাস সমেত বোধহয় মাস চারি কুমিল্লা জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। এই সময়ের ভিতর আরো দু'জন ডেটিনিউ একই অপরাধে (অন্তরীণ-আইন লঙ্ঘন) কুমিল্লা জেলে এসেছিলেন। একজন অনুশীলনের অক্ষয় সাহা, অপরজন যুগান্তর পার্টির ব্যোমকেশ মজুমদার। উভয়েই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। ব্যোমকেশবাবুর দাদা জগদীশ মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি-ও ময়মনসিংহের যুগান্তর পার্টির লোক এবং দেউলি বন্দী-নিবাসে আটক ছিলেন। আমাদের কারাদণ্ড ভোগ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁরা জেলে এসেছিলেন। কাজেই, তাঁদের বিচার-পর্ব্ব আমরা দেখে যেতে পারিনি।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কুমিল্লাতে বক্তৃতা দিতে এসে '১২৪ ক' ধারা অনুযায়ী (রাজ-দ্রোহ-মূলক বক্তৃতা) ঐ সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে প্রেরিত হন। একদিন-ই তিনি কুমিল্লা জেলে ছিলেন। পরে তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় অথবা জামিনে খালাস দেওয়া হয়। দূর থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা ও অভিবাদন বিনিময় হয়েছিল।

জেলে কিশোরগঞ্জ কৃষক অভ্যুত্থানের (১৯৩০) দু'জন আসামীর দেখা পেয়েছিলাম। তারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। টি, বি-রোগে আক্রান্ত হয়েছিল বলে সাধারণ ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে দু'টি ছোট কুড়ে ঘরে তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ঘর দু'টি ছিল আমাদের ওয়াডের পাশে। একটি নীচু বাঁশের বেড়া জেলখানার অন্য অংশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সে-সময় টি, বি-রোগ বোধহয় নিরাময়ের বাইরের রোগ বলে গণ্য হতো। তাই, মৃত্যুর অপেক্ষা করার জন্যই ঐভাবে তাদের পর্ণ-কুটিরে নির্বাসনে রাখা হয়েছিল। একজন ডাক্তার অবশ্য মামুলিভাবে দৈনিক একবার তাদের দেখা দিয়ে যেতেন।

কিশোরগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহের লোক জেনে ওদের প্রতি একটা আত্মীয়তার টান অনুভব করলাম। বেড়ার এপাশ ওপাশ থেকে রোজই আমাদের কথাবার্তা হতো। কিন্তু, কী-ই বা তাদের সাহায্য করতে পারি ? আমাদের সাবানগুলি ওদের দিয়ে দিতাম ; সাবানের ওদের প্রয়োজন ছিল। ওদের বাড়ী ঘরের খবর কয়েক বছর ধরে ওরা পায়না। অনেক দুঃখ জানালো। ওদের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ

করলো, মুক্তি পেয়ে যেন ওদের পরিবারের একটু খোঁজ খবর করি। আশ্বাস দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারলাম কই?

যে ডাক্তার ওদের দেখতেন, তিনিই আবার আমাদের কাছে-ও আসতেন। তাঁকে অনুরোধ জানাতাম একটু ভালভাবে ওদের চিকিৎসা করতে। নিতান্ত অবজ্ঞার স্বরে ডাক্তার উত্তর দিতেন, "ওদের কথা বলছেন? ও দুটোর একটা ত' মাসখানেকের ভিতরই সরবে। আরেকটার আয়ু-ও ছ'মাসের বেশী নয়।"

একজন ডাক্তারেব মুখে মৃত্যু-পথ-যাত্রী রোগী সম্বন্ধে এরূপ হৃদয়-হীন উক্তি শুনে রাগে গা' জলে যেত। একদিন সকালবেলা এই ডাক্তার এসে হেসে হেসে জানালেন, 'কাল রাতে একটা শেষ হয়ে গেছে। তবে তার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করে দিয়েছি '

ইচ্ছা হচ্ছিল, ডাক্তাবের দাঁত-বের-করা মুখে একটা থাপ্পর বসিয়ে দিই। ক্রোধ দমন করে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "শেষ ইচ্ছাটা কী ছিল?"

"রসগোল্লা খেতে চেয়েছিল। একটা রসগোল্লা খাইয়ে দিয়েছি"—বলে এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তাঁর মত উদার লোক দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায়।

এই ডাক্তারটি ছিলেন অতি ধুরন্ধর লোক। আমরা ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী। খাবার-ভাতা সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে বেশী এবং এই ভাতা দিয়ে ভাল আহার্য্যের-ই ব্যবস্থা করা চলে। কিন্তু, আমরা যা' খাবার খেতাম, তা' অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। বাজারের যত কম দামের ছোট মাছ, বাজে শাক সব্জী ও নিকৃষ্ট মানের ডাল ছিল আহার্য্যের উপাদান। তৈলাদি কোন স্নেহ-পদার্থের সংযোগ ব্যতিরেকেই মনে হয়, এগুলি রান্না হতো। মাছের আঁসটে গন্ধ পর্য্যন্ত দূর হতো না। আমাদের খাবারের ব্যবস্থাকারী ছিলেন এই ডাক্তার। সকালবেলা ব্রেক্-ফাষ্ট দেওয়া হতো দুধ-লেশ-হীন আধমগ 'চা' নামক লালচে রঙের একটি তরল পদার্থ, সঙ্গে এক টুকরো শুকনো বাসি পাউরুটি।

মনি রায়ত রেগেই আগুন। তিনি ডাক্তারকে এর জন্য এক হাত নেবেন বলে স্থির করলেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, 'নিজেদের খাবার নিয়ে ঝগড়া করা কি আমাদের শোভা পায়? মনে করুন, আমরা সাধারণ কয়েদীদের শ্রেণীভুক্তই রয়েছি। কয়টা দিন এভাবেই কোনরূপে কেটে যাবে।'

একদিন 'জেলার' এলেন। বললেন, "দেখুন, আপনাদের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আপনাদের দিয়ে কী কাজ করান হচ্ছে, এ সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট আমাকে দিতে হবে। একটা কাজ করুন না! কিছু বেতের কাজ শিখুন। চেয়ারের

ছাউনি, কেট্‌লি বা মগেব হাতলের আচ্ছাদান দেওয়া—এই জাতীয় কাজ আর কি। রাজী থাকেন ত, একজন কারিগরকে কাল থেকে সকালে পাঠিয়ে দেব। একঘন্টা, আধঘন্টা, শুধু নিয়মরক্ষার জন্য একটু কাজ।"

রাজী হলাম, বেশ কিছুক্ষণ জেলারের সঙ্গে সৌহার্দ-পূর্ণভাবে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হলো। প্রসঙ্গে ক্রমে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদেব এত নিকৃষ্ট ধবণেব খাবাব দেওয়া হয় কেন?"

জেলার এর কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না।

শুধু বললেন, এ বিষয়ে তিনি খোঁজ নেবেন। তবে তার কথায় বোঝা গেল, হাসপাতাল থেকেও তিনি অনুরূপ অভিযোগ পেয়েছেন। হাসপাতালেব রুগীদেব খাবারের ব্যবস্থা-ও কবে থাকেন এই ডাক্তারই।

আমরা ইতিমধ্যেই সকালবেলার খাবাব সাধাবণ কয়েদীদের কিচেন থেকে আনাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। চালের খুদেব সঙ্গে দাল মিশিয়ে রান্না কবা, খিচুরী জাতীয় একটি সামগ্রী; লপ্‌সি নামে পবিচিত। সপ্তাহে ছয়দিন এই খুদ ও দালের লপ্‌সি আর একদিন খুদের সঙ্গে গুড মিশিয়ে মিষ্টি লপ্‌সি। খেতে মন্দ লাগতো না। পেট-ও ভবতো এবং বাসি পাউরুটি চিবানোব ভোগান্তি থেকে বেহাই পাওয়া যেত।

*　　　　*　　　　*　　　　*

শেষ পর্য্যন্ত মনিবাবুকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। যে কয়েদীটি আমাদের খাবার নিয়ে আসে, সেদিন সে খাবার সামগ্রীগুলি মাত্র নামিয়ে রেখেছে। মনিবাবু ঢাকনাটা খুলেই আবার চাপা দিয়ে লোকটিকে বললেন, ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বল. বাবুরা ডেকে পাঠিয়েছে। এখনই যদি না আসেন, তবে জেলে আজ হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে যাবে।"

অল্পক্ষণের ভিতরই ডাক্তার ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন। ঘরে পা দিতে না দিতেই মনিবাবু তেড়ে গেলেন—"কি মশায়, কয়েদীদের খাবারের টাকা থেকে কত পার্সেন্ট মারেন? এদিকে আসুন। এগুলি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর খাদ্য? অখাদ্য চ্যাং মাছ জলে সিদ্ধ করে মাছের ঝোল রাঁধা হয়েছে। বাজারে কি রুই কাতলা বা অন্য কোন বড় মাছ উঠে না? রোজই ল্যাটা, চ্যাং এইসব মাছ খাওয়াচ্ছেন। আর এই পরিমাণ খাদ্যে একজন প্রাপ্ত বয়স্কের পেট ভরে কি? ভেবেছেন কি? কাদের ল্যাজে পা' দিচ্ছেন, একবার ভেবে দেখেছেন? ডাক্তারী চাকরী আপনার ঘুচিয়ে দেব……"

স্পষ্টই দেখা গেল, ডাক্তার ঘাবড়ে গেছেন। ভয়ে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে

গেছে। আমতা আমতা করে যে দু'চারটি কথা বললেন, তা' ভাল করে বোঝা-ও গেল না। বাজারে জিনিসপত্তর মাগ্‌গি আর আমরা মাত্র দু'জন বলে খরচটা বেশী পড়ে যাচ্ছে, এই জাতীয় দু'একটা অজুহাতের দোহাই দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালালেন।

পরের দিন থেকে খাবারের মান একেবারে বদলে গেল। যে-লোকটি খাবার দিয়ে গেল, সে বললো, "বাবু, আজ থেকে আপনাদের জন্য আলাদা রান্না হচ্ছে। এতদিন হাসপাতালের রুগীদের খাবার থেকে বাঁচিয়ে আপনাদের খেতে দেওয়া হচ্ছিল।"

মনিবাবু হেসে বললেন, "দেখলেন ত' ডাইরেক্ট একশানের ফল। এইসব ঘৃণ্য জীবের সঙ্গে যত ভাল ব্যবহার করবেন, ততই ওরা পেয়ে বসবে।"

* * * *

দু'এক সপ্তাহ বেতের কাজ নিয়মিতভাবে চলেছিল। পরে তাতে ঢিলেমি এলো, এবং অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল। জেলারও আর কোন গরজ দেখালেন না। মনিবাবু তখন ছবি এঁকে সময় কাটাতেন আর আমি খবরের কাগজ পড়ে।' এই খবরের কাগজের একটু ইতিহাস আছে।

জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বয়েদীরা খবরের কাগজ পড়বার অধিকারী। কিন্তু, জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের তা' দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তাই, আই, বি পুলিশের নিকট লিখে তা' জানালাম। কয়েকদিন পর বেশ বড় একতাড়া কাগজ জেল কর্তৃপক্ষ আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কাগজের নামটা মনে নেই। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত কমিনটার্ণ-বিরোধী একটি সংবাদপত্র। সাপ্তাহিক বলেই মনে হচ্ছে। দু'একটা সখ্যায় পুলিশ সুপারের নাম লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, উনিই এই কাগজের গ্রাহক। বহু পুরানো সংখ্যাসহ তাঁর পড়া-হয়ে যাওয়া সমসাময়িক সংখ্যাগুলিও পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ার কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার ও বিষোদ্গারই কাগজটির উদ্দেশ্য। খবরের কাগজ পড়ার অধিকারী আমরা, কিন্তু কি কাগজ তা' ঠিক করার দায়িত্ব পুলিশের—এইরূপ যুক্তির আশ্রয় নিয়েই বোধ হয়, পুলিশের কর্তা—লোকটি উক্ত কাগজ আমাদের পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই কাগজটা পড়ে' আন্তর্জাতিক জগতের—সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক, অনেক রাজনৈতিক খবরই জানা যেত। বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকলেও, সমসাময়িক জগতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না।

* * * *

মনি রায় সম্বন্ধে এখানে একটু লিখে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, মণি রায় ছিলেন যুগান্তর দলের লোক। ময়মনসিংহের যুগান্তর পার্টির বিশিষ্ট নেতা নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী তাঁকে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাড়ী ছিল কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বনগ্রাম নামক গ্রামে। কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়তেন। কিন্তু, পড়া শেষ করতে পারেন নি। ছবি আঁকতেন বেশ ভাল।

কিভাবে এবং কবে যে কম্যুনিজমের দিকে আকৃষ্ট হলেন, জানি না। বুড়িচঙ্ থানায় অন্তরীণ থাকাকালীন আমার কাছ থেকে সাম্যবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু বই নিয়ে পড়েছেন ; কিন্তু, সেখানে বা জেলখানায় কোথাও কোন দিন বুঝতে দেন নি যে, এই ভাবধারা তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে।

বন্দীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে (১৯৩৮) তিনি সরাসরি নিজেকে সর্বক্ষণের জন্য কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে ভিড়িয়ে দেন। মনে হয়, পার্টির শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে তাঁব আঁকা ছবিগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। তাঁর আঁকা ছবির একবার একটি একক প্রদর্শনীও হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে ময়মনসিংহের নেত্রকোনা শহরে নিখিল ভাবত কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। মনিবাবুর আঁকা বহু ছবি ও অলংকরণ সেই সম্মেলনেব মণ্ডপ ও মঞ্চের শোভা বর্দ্ধন কবেছিল।

১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়াব পর মনি রায় নবদ্বীপে কোথাও আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুনেছি, সেখানেই অশেষ দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার ভিতব দিয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিল।

*   *   *   *

অবশেষে জেল খাটার দিনগুলি আমাদের শেষ হয়ে এলো। খুলনা জেলাব দুটি গ্রামে দু'জন অন্তরীনের আদেশ পেলাম। মনে পড়ে ষ্টীমারে চড়ে' কোন এক নদীর বুকের উপর দিয়ে দু'জনে অনেকটা পথ একসঙ্গে গিয়েছিলাম। একস্থানে মনিবাবুকে নিয়ে পুলিশের একটা দল নেমে গেল। আমার গন্তব্য স্থান আরো দূরে।

এই ষ্টীমার যাত্রাকালে একটা দৃশ্য দেখেছিলাম, চোখে না দেখলে যা' বিশ্বাস করা যেত না। তখন ভরা বর্ষাকাল। অসংখ্য জেলে ডিঙি নদীর বুকে ভাসছে। প্রতিটি ডিঙি-তে একজন করে মাঝি জাল ফেলে মাছ ধরছে। কী করে শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ তারা একসঙ্গে কর্মরত রাখছে, তা বিস্ময়-দৃষ্টিতে দেখবার বিষয়। পিছনের গলুই-এ বসে দু'পা দিয়ে বৈঠা ধবে ডিঙিটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে। একই সঙ্গে দুহাত দিয়ে

জাল টেনে তুলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হুঁকা থেকে ধূমপান করছে। এই ধূমপানের দৃশ্যটা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। মাথার একপাশে কাঁধের উপর কল্কে সমেত হুঁকাটিকে রেখে, বাহুর উপরের অংশ এবং গাল দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে ঘাড়টিকে একটু কাৎ করে হুঁকোর ফুটোয় মুখ লাগিয়ে অনর্গল ধূম টেনে নির্গত করছে। ষ্টীমার যাত্রীরা প্রায় সকলেই উৎসুক নেত্রে এই দৃশ্য দেখছিলেন।

আমার অন্তরীন স্থান ছিল বৈঠাঘাটা নামক গ্রামে। সে-দিনটা আমাকে খুলনা শহরে 'ডি, আই, বি'-র তত্ত্বাবধানে রাখা হলো। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আবার ষ্টীমার যাত্রা। কূল ছাপিয়ে ভরা নদীর বুক চিড়ে একঘন্টা মত সময় চলে' ষ্টীমার দু'জন রক্ষীসহ আমাকে নামিয়ে দিল জন-বসতি শূন্য ছোট্ট একটি দ্বীপে। কোন-ও জেটি নেই, ষ্টীমার থেকে তক্তা লাগিয়ে দেওয়া হলো ঢেউ আছড়ে পড়া নদীর কূলের সঙ্গে। আমরা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রী সেখানে নামবার মত ছিল না, লট-বহর সমেত আমাকে নিয়ে রক্ষীরা নামলো। ট্রাঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি ভিজে ঘাসে ছাওয়া মাটির উপর রেখে সিপাইরা আমাকে সেখানে বসিয়ে এই দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করার দিকে মন দিল। সেখানে যেতে হলে খেয়া পার হতে হয়। কিন্তু খেয়া নৌকা তখন এপারে ছিল না। ওপার থেকে শীগগীর আসবার কোন লক্ষণ না দেখে সিপাইরা মাঝির উদ্দেশ্যে হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। বাক্স-বেডিং-এর উপর বসে আমি উদাস নয়নে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। কিছু ঝোপ-ঝাড় ও কয়েকটা খেজুর গাছ নিয়ে ছোট্ট স্থানটি কোনরকমে জলের উপর মাথা জাগিয়ে পড়ে রয়েছে। চারদিকে থৈ থৈ করছে জল; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কবিগুরুর 'সোনার তরী' কবিতাটি মনে জেগে উঠলো—

"একখানি ছোট ক্ষেত, আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।"

অবশেষে মূল ভূখণ্ডে আসা গেল। রক্ষীরা আমাকে থানার লোকের জিম্মায় দিয়ে বিদায় নিল।

বৈঠাঘাটা! নামটাই জানিয়ে দিচ্ছে যে এটা একটা জলময় দেশ। চারদিক জলে জলাকার। বর্ষাকাল বলেই কিনা জানিনা, উলুখড়ে ছাওয়া, দরমার বেড়া দেওয়া আমার কুড়েঘরের দাওয়ার নীচেই জল। সেই জলের উপর দিয়ে দাওয়া থেকে পায়খানা পর্য্যন্ত বাঁশ দিয়ে একটা সাঁকো মতন তৈরী করা হয়েছে। যাতে জল না ভেঙে পায়খানায় যাওয়া যায়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। পুকুর, ডোবা, খাল, নালা সব কাদাগোলা জলে ভরতি। অনেক স্থলে সবগুলি মিশে একাকার হয়ে গেছে। থানার সামনে একটা পুকুর আছে, তার জল-ও ঘোলা, সাদাটে বর্ণ। এরই জল শুধু রান্না বান্না কাজের জন্য

নয়, পানীয় হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। মাটির কলসিতে রেখে একটু ফটকিরি বুলিয়ে নিলে ময়লাটা নীচে পড়ে যায়, উপরের জলটা পান করা হয়।

আমার পাচক-ভৃত্য বিহারী তার কাজকর্ম সেরে রাত প্র য আটটায় বাড়ী ফিরত। বাড়ী তার মাইল দুই দূরে। এই গোটা রাস্তাটা তাকে জ :ভেঙে যেতে হতো। বললাম, "রোজ দু'বেলা তোমাকে এতটা পথ জল ভেঙে যাতা।া৷ করতে হয়, সাপ-খোপের ভয় করে না?"

"নিয়তি থাকলে বাবু, সাপে কাটবে। তবে, এটা তো আমাদের প্রতি বছর-কার ব্যাপার। বর্ষাকালে পথঘাট সব জলের তলায়ই থাকে। সাপের কামড়ে কতলোক মারা-ও যায়।"

পূর্ব্ববঙ্গের 'ভাটি'—অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে বর্ষাকালে মাঠ, ঘাট, পথ, গাছপালা—সবই জলে একাকার হয়ে ত যায় ই, এমনকি অনেকের বাড়ীর উঠানে এবং ঘরের ভিতর-ও বেশ কিছুদিন জল দাঁড়িয়ে থাকে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলে জল ভেঙে যেতে হয়। ঘরের মেঝেতে বাঁশের উঁচু মাচা তৈরী করে তাতে রাত কাটাতে হয়। হাট বাজার বা গ্রামান্তরের ত কথাই নেই, এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যেতে হলে ও নৌকা বা ভেলার প্রয়োজন হয় (আমি ৬০/৭০ বৎসর আগেকার কথা বলছি)। কিন্তু বর্ষার অবসানে শীত সমাগমে ঐসব অঞ্চল আবার যুগম হয়ে উঠে। দিগন্ত-বিস্তৃত জলারাশি যেখানে থৈ থৈ করত, সে-স্থান আবার নয়ন-মনোহর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত হয়।

বর্ষার পর এখানকার অবস্থা কী হয়, তা' দেখবার আর সুযোগ হয়নি। এই জলের দেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল পেতে দেরী হলোনা। কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাশায়ী হ'লাম। মনে মনে ঠিক করলাম, এখানে আর থাকা নয়, বরং অন্তরীণ-আইন ভঙ্গ করে আবার জেলে যাবো।

আমার সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি দিলাম। এত তাড়াতাড়ি সরকার ব্যবস্থা নিবেন, আশা করিনি। তৃতীয় দিনেই খুলনা থেকে পুলিশ প্রহরীসহ একখানা নৌকা এসে হাজির। থানার উপর নির্দ্দেশ ডেটিনিউকে অবিলম্বে এই নৌকায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

খুলনা সদর হাসপাতালে ভর্তি হলাম। হাসপাতাল চত্বরেই পৃথক একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পালা করে একজন পুলিশ প্রহরী বারান্দায় মোতায়েন থাকতো। সিভিল সার্জন রোজ এসে দেখে যেতেন। যথারীতি চিকিৎসা-ও শুরু

হলো। নিরাময় হতেও বেশী দেরী হলো না।

সিভিল সার্জন একদিন এসে বললেন, "আপনার অসুখ ত' সেরে গেছে, এইবার অন্তরীন স্থানে ফিরে যান।"

আমি আমার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। বললাম, "আপনার তত্ত্বাবধানেই থেকে যাবো। এখানে স্থান না হয়, ঐ পাঁচিলের অন্তরালে—" বলে হাসপাতালের সন্নিকটস্থ জেলখানার উচ্চ প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলাম। সিভিল সার্জনই ছিলেন জেলের-ও সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট। ইঙ্গিতটা বুঝে একটু গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, "কেন, আপনার ওখানে যেতে আপত্তি কি?"

"ওখানে গেলেই আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব। ওই কাদাগোলা জল হজম করতে ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত, অভ্যস্ত। কিন্তু, নবাগত আমার পক্ষে তা' সম্ভব নয়।"

"কাদা-গোলা জল কেন? থানার সামনের পুকুরে ত' জল পরিস্রুত করার জন্য মেসিন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"সেই পুকুরে কতকগুলি পাইপ ০ কীসব লাগানো আছে, দেখেছি। কিন্তু সে-সব ত' অকেজো হয়ে পড়ে আছে।"

"তাই নাকি? অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি।"

সিভিল সার্জন চলে গেলেন। আর আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নি।

* * * *

বেশ অলস আরামে দিন কাটতে লাগলো। আমার বইগুলি সঙ্গে ছিল। বই পড়ার বেশ সুযোগ পেলাম। আই, বি'-র একজন লোক, বোধহয় 'ওয়াচার', রোজ-ই আমাকে দেখে শুনে যেত। অল্প বয়স্ক। মনে হয়, কুড়ি-ও পার হয়নি। সকালবেলা এসে একবার দেখা দিয়ে যেত, বিকালে বেড়াতে নিয়ে যেত। কোন কিছু কেনা কাটা বা অন্য ফাই ফর্মাস কিছু থাকলে তা' করে দিত। তখন ফুটবল খেলার মরশুম। অধিকাংশ দিনই খেলার মাঠে খেলা দেখতাম। ছেলেটি নিজে-ও একজন ফুটবল-খেলোয়াড়। কোন একটি ক্লাবের মেম্বার। একদিন একটু সকাল সকাল এসে বললো, "আজ আমাদের ক্লাবের খেলা; আমি খেলবো। চলুন, আজকে আমার খেলা দেখবেন।"

মাঠের ধারে একটা বিশেষ স্থানে একটি বেঞ্চিতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে গেল।

সেখানে আরো কিছু লোক বসেছিলেন। বোধ হয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সব। ছেলেটি আমায় বলে গেল—"খেলা শেষ হয়ে গেলে উঠে যাবেন না; আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।"

এই নিশ্চিন্ত আলস্যের দিন-গুলি-ও একদিন শেষ হলো। দেউলি হ'তে বাংলা-দেশে আসবার সময় থেকে যে দিনটিকে আসন্ন বলে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম, সেই বহু প্রত্যাশিত মুক্তির দিনটি অবশেষে দেখা দিল। হাসপাতালে এসে একদিন 'আই, বি' র এক বড় কর্তা আমার উপর এক সরকারী আদেশ জারি করে গেলেন—

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Whereas the Governor-in-Council by an order, dated the 14th May, 1931 under sub-section (I) of Section 2 of the Bengal Criminal Amendment Act 1930, directed to commitment of Babu Sudhangsu Kumar Adhikari to custody in the Presidency Jail which order was ammended by orders passed under sub-section (I) of section 2 of the Bengal Criminal Ammendment Act 1930, on the 6th June, 1938 is still in force.

And whereas the Government of Bengal consider it expedient that the said order should be cancelled.

O R D E R

The Government of Bengal in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 10 of the said Act are pleased to direct the aforesaid order passed against the said Babu Sudhangsu Kumar Adhikeri son of Babu Kamini Kumar Adhikari under sub-section (I) of section 2 of the said Act, be cancelled with effect from the date of service on him of this present order.

By order of the Governor
B. C. Kar
18 / 7 / 38
Asst. Secretary to the Government of Bengal

Calcutta,
The 16th July, 1938.

আদেশটি জারি হয়েছিল জুলাই মাসের শেষ ভাগে কিংবা আগষ্টের প্রথমে। এইভাবে সাত বৎসর চারমাস কাল দ্বিতীয় দফায় বিনা বিচারে আটক থাকার পর বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন, ১৯৩০-এর রাহু গ্রাস থেকে মুক্তি পেলাম।

পরিশিষ্ট—১ (পৃঃ ১৪৩)

লোম্যান ও টেগার্ট—কলকাতা পুলিশের এই অধিকর্তা-যুগল এক সময় বাংলার বিপ্লবী বন্দীদের উপর অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে কিংবদন্তী পুরুষরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। লোম্যান ছিলেন আই, বি-পুলিশের ডি-আই-জি আর টেগার্ট ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

ধৃত বিপ্লবীদের নিকট থেকে গুপ্ত তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তখন কী ধরণের অত্যাচার করা হতো, তা' বর্তমান যুগের পাঠক কল্পনায়-ও আনতে পারবেন না। পানমত্ত অফিসারদের নিত্য-নূতন উদ্ভাবিত শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়নের কথা ছেড়ে দিলাম। যোগেশ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিপ্লবীকে কী বীভৎস উপায়ে নির্যাতন করা হয়েছিল, একটি বই থেকে নিয়ে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'......বিকেলবেলা মনোজ পাল (জনৈক গোয়েন্দা অফিসার) কয়েকজন মেথরকে ডাকিয়ে এক কমোড ভর্তি প্রস্রাব ও মল তুলে রাখল। তারপর তারই আদেশে মেথরেরা যোগেশকে ধরে তার মাথা ও মুখ সেই কমোডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় পুনরায় টেনে তোলা হ'ল। একজন তার নাক টিপে ধরে রাখল, যাতে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়। এমনি অবস্থায় সেই কমোডের মলমূত্র যোগেশের মাথায় মুখে ঢেলে দিয়ে, সে অবস্থাতেই একটা সেলে বন্ধ করে রেখে দিল।"

'বিপ্লবীর জীবন দর্শন'—প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী পৃঃ ২১৬।

কোন সভ্য সমাজে এরূপ নির্যাতনের নজির আছে কি?

পরিশিষ্ট—২ (পৃঃ ১৫৭)

দেউলি ক্যাম্পে থাকতেই রেবতী বর্মন একটি মার্ক্সীয় সাহিত্য-প্রকাশনা-সংস্থা স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা অনেক সময়ই আলোচনা করতাম। ১৯৩৮ সালে মুক্ত হয়ে যখন কলকাতায় আবার আমরা মিলিত হলাম, তখন জানতে পারলাম যে, রেবতীবাবু তাঁর ঐ পরিকল্পনা কার্যাকরী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। বিভিন্ন বন্ধুকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বই লিখে তাঁর নিকট জমা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে আমিও একখানি বই লিখে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর হাতে দিলাম। 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' নামে এই শেষোক্ত বই এর একটি কপি আমার নিকট থাকায় নিম্নোক্ত তথ্যগুলি পরিবেশন করা গেল।

প্রকাশনা-সংস্থাটি কলকাতাতেই স্থাপন করা যদি-ও রেবতীবাবুর ইচ্ছা ছিল, তথাপি কোন অসুবিধা বশতঃ সে-সময়ে তাহা করা সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁর পরিকল্পনার প্রথম রূপায়ণ ঘটে ঢাকা থেকে, 'গণ-সাহিত্য-চক্র' নামে। মোট ছয়খানা বই 'গণ-সাহিত্য-চক্র' থেকে প্রকাশিত হয়। সে-গুলির নাম :

১। মার্কস-প্রবেশিকা—রেবতী বর্মণ

২। সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি—রেবতী বর্মণ

৩। ভারতে ইংরেজ শাসন—কার্লমার্কস্ (অনুবাদ—হীরেন মুখার্জী)

৪। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সুধাংশু অধিকারী

৫। কৃষক ও জমিদার—রেবতী বর্মণ

৬। কৃষকের দাবী—ভবানী সেন

সংস্থাটির পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন চারজন। (১) রেবতী বর্মণ। ২) জ্ঞান চক্রবর্তী। ৩) গোপাল বসাক। (৪) নেপাল নাগ। ৫৩,২. দক্ষিণ মৈশণ্ডী, ঢাকা ছিল এই প্রকাশনা-সংস্থার আফিস।

কিছুদিন পর রেবতীবাবুর কর্মক্ষেত্র কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় ঢাকার গণ-সাহিত্য-চক্র উঠে যায়। কলকাতায় এসে তিনি গোপাল ঘোষ, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় 'ন্যাশনেল বুক এজেন্সি'-র ভিত পত্তন করেন। কালক্রমে এই 'ন্যাশনেল বুক এজেন্সি' মার্ক্সীয় সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক বিশাল সংস্থায় পরিণত হয়ে রেবতী বর্মণের স্বপ্নকে সফল করে তুলেছে।

—00—


সমাজতান্ত্রিক
রাষ্ট্র
গণ-সাহিত্য
চক্র
সুধাংশু অধিকারী

STATEMENT OF YOUR ACCOUNT TO DATE (29/9/36).

	£	s.	d.		£	s.	d.
To balance due at last account				By credit balance at last account			
" Invoice No. DR/1568	2.	5.	–	" remittance as above	2	8	
" Akhil Nanda			4.				
" balance now to your credit		2.	8.	" balance now due....			
	£2.	8.	–		£2.	8.	

STATEMENT OF YOUR ACCOUNT TO DATE (4th Sept. 1937....)

	£.	s.	d.		£.	s.	d.
To balance due at last account.........				By credit balance at last account..........		11	2
" Invoice No. PR2817...		2	9	" remittance...........			
....				....			
....				....			
" balance now to your credit..........		8.	6.	" balance now due.......			
		11	2			11	2

S K. Adhikari, Esq

The Literary Guild of America
INCORPORATED
244 Madison Avenue
New York

January 11, 1937

Mr. Sudhanshu Adhikari
Deoli Detention Jail
Camp 5
RAJPUTANA INDIA

Dear Mr. Adhikari:

According to instructions from Mr. Dhirendra Kumar Roy, we have credited your account with $2.00. We have sent you the foll wing books GREAT MODERN SHORT STORIES 95¢; MAN OR STATE $1.25, CASTAWAY, CL PITTY 50¢; BODY OUT AND SOCIETY 50¢, AMERICAN MASTERS OF SOCIAL SCIENCE $1.50 Total, $4.70. S... there was a previous balance of 66¢, there is now a total due of $ .36.

We are pleased to inform you that we are forwarding a copy of our January bonus book to you. We hope that you will enjoy it.

We wish to thank you for your patronage and trust that we may serve your book needs in the future.

Very truly yours,

THE LITERARY GUILD OF AMERICA

Ruth ...

Membership Secretary

RS,MD
PS 3404-36

YOKOHAMA OFFICE
91 B Yamashita cho
Tel. (2) 1649

KOBE OFFICE
Kaigan Bldg.
10 Kaigan-dori
Tel Sannomiya 3607

THE TRANS-PACIFIC

No

Dhiren Roy, Esq.,
Deoli Camp Jail
Camp-5, Rajputana
India.

TOKYO, Dec. 24, 1936.

Dr to The Japan Advertiser Co., Ltd.

Telephones ...
Furikae No 39013 Tokyo

No 1 Uchiyamashita-cho, Itchome, Kojimachi-ku
Cable Address: Advertiser Tokyo

P O Box 104 & 305, Tokyo Central

Subscription to The Trans-Pacific

Six months from Dec. 31, 1936 to June 30, 1937 ¥ 10.00

YEN TEN ONLY:

DEC 24

THE ...

For ...

The Literary Guild of America
INCORPORATED
244 Madison Avenue
New York

[illegible] KRUTCH • JULIA PETERKIN • BURTON RASCOE

July 15, 1936

Mr S K Adhikari
Deoli Detention Jail
Camp #5
DEOLI RAJPUTANA INDIA

Dear Mr Adhikari:

We are extremely sorry [illegible] in and difficulty which we have experienced in working on three of the books [illegible] ordered when you joined the Guild has caused some [illegible] delay in our reporting to you as to why they were [illegible] which [illegible] reached you by this time. We hope that the [illegible] has not caused you any serious inconvenience.

We have been unable to locate in our catalogues of books in print at the present time, in any [illegible], any trace of Rappaport's LOOKING FORWARD. If you [illegible] additional information about this title, [illegible] publisher, and the date of its publication, we shall be glad to make further search, and either send a copy to you at once, or report to you should it not be available at the present time.

We regret that we were unable [illegible] for you, at the reduced prices which you quoted in your order, copies of Briffault's MOTHERS or Kisch's CHANGING ASIA. The Worker's Bookshop returned our order for them with a notation that they no [illegible] them in stock. We could secure the two books for you at their established retail prices, if you would like us to do so. THE MOTHERS sells regularly for [illegible], and CHANGING ASIA for $3.00.

Ordinarily books from the [illegible] of the World [illegible] books are sold only through their own organization, [illegible] orders must be sent to them direct. However, we made special arrangement for them to send you the copies of HANDLE WITH THE ROSE ([illegible]); [illegible] KAISER [illegible] ([illegible]); [illegible] copies of THE PHILOSOPHY OF HISTORY ($1.00 each). [illegible] we were billed for these books, we found that a postage charge of $3.17 had been added, and this [illegible] charge against your account, which [illegible] shows a credit balance of [illegible]

[illegible] separate [illegible] we [illegible] such catalogues of the type of [illegible] which you are in[illegible] have [illegible]. Unfortunately, [illegible] not the facilities [illegible] for you [illegible] of [illegible] of [illegible]. [illegible] for these [illegible] be sent [illegible] to their publishers. If you will write them, we are sure that they will be glad to forward specimen issues to you.

We appreciate the opportunity of serving your book wants, and shall be glad to fill your orders for books whenever we can, or supply you with any literary information which may be available to us.

Yours very truly

LITERARY GUILD OF AMERICA

Carl West

Carl West
Book Service Department

CW:ME

I [illegible]

[illegible] 7-16-36

পরিশিষ্ট—৪ (পৃঃ ১৭০)

শৈলেশ চ্যাটার্জির মৃত্যুর অন্যরকম বিবরণ তাঁর মাসতুতো দাদা স্বনাম খ্যাত বিপ্লবী ৺যোগেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা "স্বাধীনতার সন্ধানে" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে শৈলেশবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী ডঃ খান। প্রবল জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় (১০৪ ডিগ্রি) শৈলেশবাবুকে ডঃ খান কুইনিন ইন্‌জেকশান দিয়েছিলেন। এর ফলেই শৈলেশবাবুর মৃত্যু ঘটেছিল। এই কাহিনী নাকি তিনি শুনেছেন, শৈলেশবাবুর মৃত্যুর প্রায় ষাট বছর পর (১৯৪১ সালে) উত্তর প্রদেশের কোন এক জেলে আটক থাকাকালীন দেউলির একজন প্রাক্তন কম্পাউণ্ডারের মুখে। ঐ কম্পাউণ্ডার নাকি প্রবল আপত্তি করেছিলেন, তৎসত্ত্বে-ও ডাঃ খান ঐ ইন্‌জেক্‌শান দেন।

ঐ সময় (১৯৪১ সালে) দেউলির বহু রাজবন্দী, শৈলেশবাবুর বন্ধু-বান্ধব এবং যোগেশবাবুর ও পরিচিত লোক ও বর্তমান ছিলেন। যোগেশবাবু এ বিষয়ে তাদের কারো কাছে কিছু জানতে না চেয়ে একজন অজ্ঞাত কুলশীল কম্পাউণ্ডারের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন কী করে ?

অবশ্য, শৈলেশ চ্যাটার্জির মৃত্যু ডঃ গ্যারডের (Garrod) হাতেই হউক বা ডঃ খানের হাতেই হউক, তাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না। বন্দী অবস্থায় একটি অমূল্য প্রাণ যে কীভাবে সরকারী অবহেলার শিকার হতে পারে, এটা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু, ইতিহাসের খাতিরে পরিবেশিত তথ্য যথাসম্ভব সঠিক হওয়া কাম্য। বিশেষ করে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেওয়া তথ্যে যদি ভুল থাকে, তবে পরবর্তীকালে এই ভুল তথ্যই সত্যের মর্যাদা পেয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বাংলার বিপ্লবান্দোলন সংক্রান্ত পুস্তকাদির অন্যতম লেখক তারাপদ লাহিড়ী তাঁর বই-এ শৈলেশ চটোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বিবরণ যোগেশবাবুর বিবরণকে-ই অনুসরণ করে লিখেছেন।

পরিশিষ্ট ৫ (পৃঃ ২১৪)

NOTICE

Dated the 10th August, 1937

Detenu Babu Sudhangshu Adhikary of C/5.

The Superintendent regrets to learn of your dicision to embark on a hunger strike in sympathy with the prisoners in the Andamans. It is a false belief that Government can be compelled to grant demands of prisoners under threat of or by embarking on a hunger strike. The following is an extract of Government's reply in the Assembly with regard to the hunger strike in the Andamans :—

"Calcutta, August 4th, 1937, Explaining the position of the Government with regard to the adjournment notice moved to-day by Mr. T. C. Goswami Deputy Leader of the Congress Party in the Assembly to consider the situation arising out of the hunger-strike in the Andamans, Khhwaja, Sir Nazimuddin, Home Minister said that so far as the present stage was concerned the question of the merits of the demands of the hunger-strikers could not be considered at all.

Government, the Minister added, was viewing the whole matter as a question of principle. Any Government worth the name would crumble to picees if it were to show weakness by surrendering to demands put forward at the print of the bayonet.

The Home Minister suggested that a grave calamity could yet be averted if instead of indirectly encouraging the hunger strikers the

people would sympathize with them but at the same time make it clear that such an unreasonable attitude on the part of political prisoners would receive no countenance from them "

From the above it will be seen that the Government's Policy is very clear and therefore your going on hunger strike will in no way force the Government to change their policy nor will it help prisoners in the Andamans to have their alleged grievances redressed.

With regard to the telegram—As the representative system is not recognised in this Jail, your faliure to append your signature to the telegram is an indication that you did not associate yourself with it. For you to now embark on hunger strike is tantamount to your going on hunger strike without warning. However, for the purpose of argument, supposing it is maintained that Babu Kalipada Banerjee is authorised to represent you and speak on your behalf, it must be admitted that even if the Government of Bengal were to accede to your request to redress the grievances of the prisoners in the Andamans, you could not possibly expect a reply by 10th August, 1937. Your telegram was only received in the Superintendent's offiee on the 9th morning. The usual office procedure must be followed before the telegram leaves Deoli. The telegram could not be sent from Deoli before the afternoon of the 9th instant which means that it could not have reached Bengal before the 9th evening at the earliest. It is not likely that the Government of Bengal would come to a decision on your telegram before holding a discursion on the subject. This would not be possible before the morning of the 10th August, 1937 at the earliest. It will be seen from this argument that the earliest you could expect a reply to your telegram would be by the 11th August, 1937. As stated in your telegram, your decision to embark on a hunger strike is conditional on the Government of Bengal's redressing the grievances of the prisoners in the Andamans. For you to give the Government such short notice especially after making your

decision conditional on the Government of Bengal's reply, is in itself a contradiction of the text of your telegrm and for you to have embarked on a hunger strike before receiving the Government of Bengal's reply is not consistant with the conditions expressed in the telegram.

You are also reminded that one of the reasons why the prisoners in the Andamans have gone on hunger strike is because political prisoners/detenus are kept in prisons and Detention Camps outside their native province. The Hon'ble Home member. Government of Bengal has already expressed the Government of Bengal's policy regarding the repatriation of all Bengal Detenus. To embark and remain on hunger strike you only hamper the policy of the Government of Bengal in this respect, and thus make it more difficult for the prisoners in the Andamans to have their demands granted The Government of Bengal is not likely to repatriate any Detenu who is resorting to hunger strike.

The Superintendent realises that a number of Detenus have started this hunger strike out of respect for the decisions of their party Committees The Superintendent requests you to reconsider your decision after carefully going into the reasons for which you embarked on the strike. The Superintendent feels certain that if you were to reconsider the case in all its aspects you would realise the futility of embarking on a hunger strike.

It must be remembered that for you to remain on hunger strike, you compell the superintendent to withdraw what ever. jail privilages you and your friends now enjoy. Moreover, the Consequences of embarking on a hunger strike are many which you may later have cause to regret. I do not intend to threaten you but in your own interests I inform you that Government orders regarding hunger strike are very strict, and I shall enforce them rigidly if necessery. If you decide to cease hunger striking you are requested to communicate your decision to the office by 10 A M. on 11th August, 1937.

Sd-R. F. Crastor
Major,
Superintendent,
Detention Jail, Deoli

নির্ঘণ্ট